বাগদা

বরেন গঙ্গোপাধ্যায়

স্ট্যাণ্ডার্ড পাবলিসার্স
এম-টি ২৫/২৬, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট
কলিকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ :
আষাঢ় ১৩৭১

প্রকাশক :
উৎপলকান্তি ভট্টাচার্য
পুরোগামী গ্রন্থনা
৩৫, চিত্তরঞ্জন এভেনিউ
কলিকাতা-১২

মুদ্রাকর :
বীরেশ্বর চক্রবর্তী
স্ট্যাণ্ডার্ড আর্ট প্রিণ্টার্স
১১৫-এ, রাজা রামমোহন সরণি
কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদ শিল্পী :
অরুণ গুপ্ত

দিব্যেন্দু পালিত

প্রিয়বরেষু

এই লেখকের অন্যান্য বই

বস্ত্রহরণ

অসতী

বনবিবি উপাখ্যান

বহুপতির দেশে

সাহেবকুঠি

শ্রেষ্ঠ গল্প

বাগদা

লাল বিন্দু বিন্দু অসংখ্য আলোর কণা। এমনিতে অবশ্য দেখার উপায় নেই, কিন্তু টংয়ের উপর থেকে টর্চের আলো ফোকাস করলেই কণাগুলি চাকভাঙ্গা মৌমাছির মতো ছুটোছুটি শুরু করে দেয়। আর তখন ভারি মজা পায় বিনোদ, চোখ ফেরাতে পারে না, ভগবানের কি অপূর্ব সৃষ্টি !

আলোর কণা দেখে এখন আর চিনতে অসুবিধা হয় না, ওগুলি বাগদা চিংড়ির চোখ। অক্ষয়বাবুদের এই জলকর বা মাছের ঘেরিতে মাস দেড়েক হল ও কাজে লেগেছে। এই দেড় মাসের মধ্যেই ও চিংড়ি সম্পর্কে অনেক সড়গড় হয়ে উঠেছে। রাতে টংয়ে পাহারা দিতে এলে টর্চের আলো ফেলে মাছগুলির সঙ্গে ও বেশ কিছুক্ষণ ধরে খেলা করে। টংয়ের ওপর থেকে ভেড়ির জলে লম্বভাবে আলো ফেললেই আর কথা নেই, চিংড়ির চোখগুলো কিলবিল করে ওঠে। আবার টর্চের আলোটাকে যদি সমান্তরালভাবে জলের ওপর পেতে ধরা যায়, তাহলে আর এক মজা। আলোর গতিপথ ধরে ঝরঝর করে বৃষ্টির ফোঁটার মতো মাছগুলি লাফিয়ে ওঠে। এই সময় বোঝা যায়, শান্ত এই জলরাশিতে কত মাছ। ধু ধু একশ একর জমির এই জলকরে অফুরন্ত মাছ। আকাশের তারার মতো গুনে কোনদিন শেষ করা যাবে না।

বিনোদকে সপ্তাহে তিন চার দিন টংয়ে বসে পাহারা দিতে হয়। আজও রাতে আলাঘর থেকে ভরপেট ভাত খেয়ে বেরিয়ে পড়তে হয়েছিল। কেবল ও একাই নয়, সঙ্গে ছিল নন্দ, বলাই, শিবু আর বিষ্টু। জলকরের চারপাশ ঘিরে গোটা কয়েক টং। এর মধ্যে চার পাঁচটাতে পাহারা দিলেই চলে।

তিন নম্বরে পাহারা দেয় বিনোদ। আজও টর্চ হাতে তিন নম্বরেই উঠে বসেছিল। টংয়ের ভেতরে লাঠিসোটা আছে। ও সব কোনদিন

ব্যবহার করতে হবে বলে মনে হয় না। জলকরে যারা মাছ চুরি করতে আসে তারা নেহাতই ছিঁচকে চোর। গলা ভারি করে একটা হুমকি দিলেই হল, পাছার কাপড় সামলাতে সময় পাবে না।

বিনোদ এই পাহারা দেওয়ার ব্যাপারটা খুব হালকা ভাবেই নেয়। টংয়ে বসে রাত কাটানো মানে লোককে শুধু দেখানো, সাবধান হে, আমরা সবাই জেগে আছি। জলে একবার হাত ডুবিয়েছ কি হাত কেটে মাছকে খাওয়াবো। সাবধান! ফলে টংয়ে উঠে জলে ফোকাস মেরে মাছের সঙ্গে খেলা করে সময় কাটায় ও। মাছের খেলা দেখে আর আশ মেটে না। পরে এক সময় ফালতু ব্যাটারি খরচ হচ্ছে ভেবে টর্চের ফোকাস মারাও বন্ধ করে। চাঁদের আলোয় ভেসে যাওয়া ধু ধু জলরাশির দিকে তাকিয়ে বুঁদ হয়ে বসে থাকে।

ভারি অবাক লাগে ওর। জলকর তো নয় সোনার খনি। সোনার টুকরোর মতো এই ক্ষুদে ক্ষুদে মাছগুলিই একদিন গায়ে গতরে বড় হয়ে উঠবে। তখন ওদের কত দাম! হেসেখেলে নব্বই একশ' টাকা কেজি তো বটেই। বাজার চড়া হলে আরো বেশি। আর এই দামের জন্যই অত তোয়াজ করতে হয় মাছগুলিকে। চিংড়ির অবশ্য শত্রুর শেষ নাই। ভেটকি, ট্যাংরা, বেলে, তেড়ে, গুরজালি, আরো কত! জল থেকে ওগুলোকে ধরে ধরে আলাদা করে রাখতে হয়, কিংবা বাজারে নিয়ে গিয়ে ঝেপে আসতে হয়। নরমদেহী চিংড়িগুলোকে মাপ অনুযায়ী রাখতে হয় আলাদা আলাদা ঘেরে। কত যত্ন, কত কসরৎ।

বিনোদের এই টংয়ের কাছে রয়েছে আঙুল মাপের সব চিংড়ি। এই কড়ে আঙুলের সাইজই মাস তিনেকের মধ্যে প্রমাণ সাইজ হয়ে উঠবে। প্রমাণ সাইজ অর্থাৎ চার পাঁচটাতেই তখন এক কেজি অর্থাৎ কম করেও নব্বই একশ টাকা। অর্থাৎ মানুষের চেয়েও দামী এই চিংড়িগুলো। কারা কেনে অত টাকা দিয়ে, কারা খায়! বিনোদের মতো লোকের পেটে ভাত জোটে না অথচ বাগদা খাওয়ার লোকেরও অভাব নেই এই সংসারে। কি অদ্ভুত এই সংসার!

টংয়ের বাইরে একবার এপাশ ওপাশ তাকায় বিনোদ। ডান দিকে প্রায় শ'দুই হাত তফাতে শিবুর টং! অবশ্য এখনো ও টংয়ে উঠছে কিনা কে জানে। অনেক রাত অবধি ও এদিকওদিক ঘুরে বেড়ায়। কোথায় যায়, কি যে করে ঠিক বোঝা যায় না। কিছু জিজ্ঞেস করলে কেবল হাসে, কেমন বোকাবোকা মনে হয় তখন।

কিন্তু আদৌ বোকা নয় শিবু। বিনোদ বোঝে, জলকরের ম্যানেজার প্রসন্নবাবুর সঙ্গে ওর একটা সাঁট আছে। মুহুরি অর্থাৎ ভাইদাও তাই ওকে বড় একটা ঘাঁটায় না। ফলে, সব ব্যাপারেই কেমন যেন সাত খুন মাপ হয়ে যায় ওর।

বিনোদের মনে পড়ল, দিন দশেক আগে টং পাহারা দেওয়ার নাম করে কোথায় যেন কাটিয়ে এসেছিল ও। একটা বিড়ির প্রয়োজন পড়ায় শিবুর টংয়ে ফোকাস মেরেছিল বিনোদ। একবার নয় বার কয়েক ফোকাস মেরেও যখন সাড়া পেল না, তখন ভাবল, হয়তো ঘুমিয়েই পড়েছে। ঘুমিয়ে পড়াটা অসম্ভব নয়, সারা রাত কে কাঁহাতক জেগে থাকতে পারে!

নিজের টং থেকে ধীরেধীরে নেমে এসেছিল বিনোদ। ভেবেছিল চুপিচুপি ওর টংয়ে গিয়ে একটু মজা করবে। সেইভাবে শিবুর টংয়ের কাছাকাছি এসে ঠাট্টাচ্ছলে হাঁক পেড়েছিল, চোর চোর!

কিন্তু সাড়া নেই শিবুর, আশ্চর্য!

ধীরে ধীরে বাঁশের মইয়ে ভর রেখে শিবুর টংয়ে উঠে এসেছিল ও। না, টং ফাঁকা। কেউ নেই। আশ্চর্য, কোথায় যেতে পারে শিবু!

রাত তখন প্রায় শেষ প্রহরের দিকে। আর কিছুক্ষণ পরেই আলাঘরের মুরগীগুলোর চেঁচিয়ে ওঠার কথা। মুরগী ডাকা মানেই আলার জেলে-জিমনিরা বিছানা ছেড়ে লাফিয়ে উঠবে। হুড়োহুড়ি পড়ে যাবে আলায়। জাল দিয়ে ঘিরে জিইয়ে রাখা বাগদা তোলার কাজ শুরু হয়ে যাবে। চাঙারি বোঝাই করে বাজারের দিকে ছুটতে হবে তখন। বাজার মানে কাঁটাদারদের চৌকি। রাত তিনটে থেকে যে বাজারের শুরু, ভোর হতে না হতেই তা শেষ। ভোর হওয়ার

আগেই বাগদা বেচাকেনাও শেষ। ভোরের আগেই লরি বোঝাই বরফচাপা বাগদা ছুটতে শুরু করবে কলকাতার দিকে, কারখানায়।

বিনোদ হতাশ হয়ে টং থেকে নেমে এসেছিল, ফিরে এসেছিল নিজের টংয়ে। একবার ভেবেছিল নন্দ বা বলাইয়ের টংয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করে। কিন্তু না, শিবু টংয়ে নেই, কথাটা জানাজানি হওয়া ভাল নয়। চেপে গিয়েছিল ও।

পরের দিন অবশ্য বেশ একটু বেলায় শিবুকে একা পেয়ে ও জিজ্ঞেস করেছিল, কী গো শিবুদা, রাতে কোথায় কাটালে? টংয়ে ছিলে না, আলাঘরেও তো ছিলে না?

শিবু গম্ভীরগলায় বলেছিল, ছিলাম এক জায়গায়। থাকলেই হল।

এক জায়গায় মানে কোথায় গো?

সে কথাও বলতে হবে নাকি? নাই বা শুনলে!

বিনোদের কেমন কৌতূহল বাড়ে। বলা যায় না এমন কি কথা! বলল, মুহুরিবাবু জানতে পারলে কিন্তু তোমার মাথা কাটবে।

কাটলে কাটবে, কি আর করা যাবে। ভাবখানা এরকম, যেন কোন পরোয়া নেই। মুহুরিবাবু জানলেও কিছু যায় আসে না ওর।

বিনোদ ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থেকেছিল। অক্ষয়বাবুদের জলকরে ও নতুন। ভাইদার জন্যই ওর এখানে এই চাকরি। টং ছেড়ে অন্য কোথাও কাটিয়ে আসার কথা ও ভাবতেই পারে না। তা ছাড়া শিবুরা স্থানীয় লোক। হরিণচকের এই জলকরে প্রায় সবাই-ই হরিণচকের লোক, কেবলমাত্র ওরা দু' তিনজনই বাইরের লোক। বাইরের লোকের পক্ষে বেশি বাড়াবাড়ি মানায় না।

আবার এক দিন শিবুকে একা পেয়ে ও জিজ্ঞেস করেছিল, হ্যাঁ গো শিবুদা, হরিণচকেই তো তোমার বাড়ি! মাঝে মাঝে বুঝি বাড়ি চলে যাও?

শিবু অদ্ভুতভাবে তাকিয়ে ছিল, যেন এ সব কথা ওর পছন্দ নয়।

বিনোদ বলেছিল, রাগ করলে? আমি কিন্তু খারাপ ভেবে কিছু বলি নি।

আমি কখনো বাড়ি যাই না। মরলেও ওখানে আর যাব না।

কেন, কেন?

কেন যাই না, তুমি বুঝবে না। সবাই সব জিনিস বোঝে না।

ফ্যালফ্যাল করে আবার তাকিয়ে থেকেছিল বিনোদ।

একটু পরেই শিবু আবার প্রসঙ্গটা টানল, আসলে বাড়ি আমার থেকেও নেই। আমার দাদা বৌদিরা বাড়িটা দখল করে নিয়েছে। আমার ভাগের অংশটা ঠকিয়ে নিয়ে খাচ্ছে।

ঠকিয়ে নিয়েছে মানে?

মানে ঠকিয়ে নিয়েছে। ও তোমার মাথায় ঢুকবে না। আমাদের সংসারের ব্যাপারটাই ওরকম।

সত্যি সত্যি মাথায় ঢোকেনি বিনোদের। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে জিজ্ঞেস করেছিল, বিয়ে করেছ?

তা একটা করেছিলাম, কিন্তু ভগবান সেখানেও আমাকে ফাঁকি দিয়েছে।

আবার বোকার মতো তাকায় বিনোদ।

গত বছর বউটাকে যে কামটে খেল শোন নি? খানিকটা বিরক্তি মিশিয়ে জিজ্ঞেস করেছিল শিবু। নদীতে নেমেছিল চারা মাছ তুলতে, শালার কামটেও রেহাই দেয় নি।

আশ্চর্য এ ব্যাপারে ও কিছুই জানে না। কেমন কৌতূহল বাড়ে বিনোদের।

অথচ তুমিই বলো বিনোদভাই, কত মেয়ে বউ তো আজকাল নদীতে নেমে চারা তোলে, কাকে খায়? আমার কপালে ছিল, তাই খেয়েছে।

কামটে টেনে নিয়ে যাওয়ার একটা কল্পিত দৃশ্য চোখের ওপর ভেসে ওঠে বিনোদের। শিবুকে সান্ত্বনা দেওয়া ভাষা খুঁজে পায় না। তবে এও এক মজা, পয়সার লোভে আজকাল মানুষ আকছার নদীতে নেমে মাছ ধরে। সুন্দরবনের এ সব নদীতে কুমির-কামটে খেতে পারে জেনেও।

আর কথা বাড়াতে চায় নি বিনোদ। প্রত্যেক মানুষেরই কোথাও না কোথাও কিছু নরম জায়গা থাকে, সেখানে স্পর্শ করা ভাল নয়। শিবুর ওপর কেমন একটা সহানুভূতিই জাগতে থাকে ওর।

টর্চটাকে এক পাশে সরিয়ে রাখে বিনোদ। বেশ চাঁদের আলো উঠেছে। এখন চৈত্রের প্রায় শেষ। সারাদিন এলোমেলো বাতাসের টান ছিল, এখন তা ঝিমোন। তবু এই হালকা বাতাসে সারা জলকর জুড়ে অল্পঅল্প শিরশির করা ঢেউ। চাঁদের আলো সেই ঢেউয়ের ওপর আছড়ে পড়ে ভেঙে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যাচ্ছে। ম্যাজিকের মতো।

অনেকক্ষণ ধরে চাঁদের আলোর খেলা দেখল বিনোদ। টংয়ে একা একা বসে এই দৃশ্য দেখতে দেখতে ওর মনে হল, বিশাল একটা সমুদ্রে যেন সামান্য একটা ভেলায় চড়ে ও ভেসে বেড়াচ্ছে। ভাসতে ভাসতে একদিন হয়তো ও হারিয়েই যাবে। আর তখন ওর সংসারের কি হবে! বউটাকে কে দেখাশোনা করবে! একটা ছেলে-মেয়েও যদি থাকত! ছেলেমেয়ে না হওয়ার আক্ষেপটা কেমন যেন আচ্ছন্ন করে দিতে থাকে ওকে।

আর কিছুই গুছিয়ে ভাবতে পারে না ও। বুঁদ হয়ে চোখ বুজে বসে থাকে। চোখ বুজে বসা মানেই ঘুমকে প্রশ্রয় দেওয়া। না, ঠিক হচ্ছে না। ঘুমের ভাবটা কাটাবার জন্য আবার পা গুটিয়ে উঠে বসে ও।

শরীরের ঝাঁকুনিতে মাচাটা একটু দুলে ওঠে। চারটে মাত্র বাঁশের খুঁটির ওপর টংয়ের মাচা। ওপরে নৌকোর ছইয়ের মতো খড়ের ছাউনি। এ-পাশ ও-পাশ দেখার জন্য সেই ছাউনিতে কয়েকটা ফোকর রাখা হয়েছে। মাচায় পুরু করে খড় বিছোন। খড়ের ওপর একটা ছেঁড়া বস্তা পাতা। ফলে একটা বালিশ পাওয়া গেলে এখানেই চমৎকার ঘুমোন যেত। কিন্তু পাহারা দিতে এসে বালিশের কথা ভাবাই যায় না।

পা ছড়িয়ে দেয় আবার। আরাম করে বেড়ায় পিঠ এলিয়ে দেয়। মাথাটা একটু ঘোরাতেই একেবারে ঠিক উল্টো দিকে ভেড়ির গায়ে

উঁচু ভিতের ওপর আলাঘরটা চোখে পড়ে। অনেক রাত অবধি আলো জ্বলে ওই আলায়। ভাইদা সহ এখনো ছ'সাত জন লোক ওখানে। ছ'সাত জনের মধ্যে একজন রান্নাবান্নার কাজ করে। দু'জন জিমনি। জিমনি অর্থাৎ আঁটল, ধোসনা, পাটা, জালফাল নিয়ে যারা মাথা ঘামায়। ম্যানেজারবাবু মজা করে ওদের বলেন, ইঞ্জিনিয়ার। জলকরের ইঞ্জিনিয়ার। ভাইদা বলে, ইঞ্জিনিয়ার না ইঞ্জিন। এক একটা স্টিম ইঞ্জিন।

জিমনি ছাড়া আর যারা থাকে তারা সবাই বিনোদের মতো মজুর কাম জেলে। কখনো মাটি কাটতে হয়, কখনো মাছ ধরতে হয়। কখনো আবার টংয়ে বসে রাত জেগে পাহারা দিতে হয়। যখন যেমন ডিউটি।

তবে টংয়ে যেদিন থাকতে হয় সেদিন অন্য কাজ থেকে রেহাই মেলে। যারা আলায় ঘুমোয় তাদেরই রাত ভোর হওয়ার আগে মাছ তুলে নিয়ে কাঁটাদারদের কাছে ছুটতে হয়। 'বাজার সেরে চা ফুলুরি খেয়ে একটু বেলায় ফিরেও তাদের রেহাই নেই, কাজের কি আর শেষ আছে জলকরে।

আলাঘরটাকে কেমন যেন ভূতে পাওয়া রহস্যময় দেখাচ্ছে। খড়ের ছাউনির ওপর চাঁদের আলো বিছিয়ে পড়ায় রহস্যময়তা যেন আরো বেড়ে গেছে। চোখ ফেরাতে পারছিল না বিনোদ।

বেশ কিছুক্ষণ ওইভাবে বুঁদ হয়ে কাটাবার পর হঠাৎ এক সময় ও চমকে ওঠে, কে ? কে ওখানে ?

নিজের চোখকেই যেন বিশ্বাস করা যায় না, ওর টংয়ের কাছেই একটা ছায়া মূর্তি। কে যেন চুপি চুপি এসে থমকে দাঁড়িয়েছে। আশ্চর্য, ওর টংয়ের দিকেই হাঁ করে তাকিয়ে আছে যে।

চাঁদের আলো আছে বলেই ছায়া মূর্তিটাকে দেখতে পেয়েছে বিনোদ। অন্ধকার রাত হলে হয়তো চেনাই যেত না।

কে ওখানে ? কে ? ঝট করে টর্চটা হাতে তুলে নেয় বিনোদ। না, শিবু নয়। নন্দ, বলাই বা বিষ্টুও নয়। কে তবে। শাড়ি পরা

নাকি! অদ্ভুত তো! আর অপেক্ষা করা নয়, টর্চের ফোকাস মারে বিনোদ।

হ্যাঁ, জলজ্যান্ত একটা মেয়েই। কিন্তু ওভাবে দাঁড়িয়ে আছে কেন! কি চায়? তবে কি মাছ চুরি করার উদ্দেশ্য!

বিনোদ আবার গলা তুলে হাঁকল, কে গো? কে তুমি?

মেয়েটা যে ভয় পেয়ে পালাবে, তেমনও নয়। বরং একটু যেন এগিয়েই এল, শিবুর টংয়ের দিকে আঙুল তুলে দেখাল।

কেমন কৌতুক লাগে বিনোদের। শিবুর কথাই জানতে চাইছে মেয়েটা।

কেন, কি হবে ওকে দিয়ে?

কোথায় বল না? দরকার আছে।

টং থেকে এখন মাত্র হাত পনের দূরে মেয়েটা। আবছা আলোয় এখনো ঠিক চেহারাটা ধরা যাচ্ছে না। বিনোদ ঝুঁকে বাঁশে ভর দিয়ে ভেড়ির ওপর লাফিয়ে নামল, কী দরকার শুনি?

টর্চ জ্বালিয়ে এবার এক ঝলক মেয়েটার গায়ে আলো ফেলে বিনোদ। আর ক্ষণিকের সেই আলোতেই মেয়েটার চোখমুখ ও দেখে নেয়।

বয়স বেশি নয়। সবে হয়তো শাড়ি ধরেছে। শাড়ি জড়ান গায়ে কেমন এক আড়ষ্টতা। চোখেমুখে কেমন যেন ত্রাসের ছাপ! না, এ মেয়ে মাছ চুরি করতে এখানে আসবে মনে হয় না।

বলো না কোথায়? খুব দরকার।

টংয়ে নেই? দেখেছ? পাল্টা প্রশ্ন করে বিনোদ।

থাকলে কি আর এখানে এসে তোমায় ডাকি?

টংয়ে না থাকলে আলায় থাকতে পারে। আলাঘরে গিয়ে খোঁজ করে দেখ। কিন্তু কী দরকার বলবে তো?

মেয়েটা নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়েই থাকে। তারপর কেমন যেন ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করে, আলায় মুহুরিবাবু নেই?

থাক না, তোমার কি! তুমি তো শিবুকে খুঁজছ।

মেয়েটা আবার এপাশওপাশ তাকায়।

শিবু তোমার কে হয়? আবার প্রশ্ন করে বিনোদ। আবার আলো ফেলে ওর গায়ে।

মেয়েটা যেন খানিকটা চমকে ওঠে, কে আবার হবে? কেউ না। কেউ হলে এভাবে আমাকে আসতে হয়!

খুলেই বল না? মেয়েটার দিকে আরো দু'পা এগিয়ে আসে বিনোদ।

মেয়েটাও দু'পা পিছিয়ে যায়, আমি হাসি এসেছিলাম বললেই ও বুঝতে পারবে।

হাসি! তোমার নাম হাসি?

মেয়েটা আর দাঁড়ায় না। ভেড়ি থেকে ঝট করে ওপারের ঢালে নেমে পড়ে।

প্রথমটায় কেমন যেন বোকা হয়ে যায় বিনোদ। ঘটনাটা এত দ্রুত ঘটবে ও আশা করে নি। টর্চ জ্বালিয়ে বিনোদও খানিকটা এগোয়।

ভেড়ির নিচেই কিছু বাবলা গাছের ঝোপ। তারই পাশ দিয়ে পায়ের দাগ অলা একটা রাস্তা সাপের মতো বাঁক খেয়ে গাঁয়ের দিকে ঢুকে গেছে। ওটাই হরিণচক। চার-পাঁচশ হাত দূরে গাঁটাকে কেমন স্তব্ধ দেখাচ্ছে। ভূতে পাওয়া গাছগুলো যেন গ্রাস করে রেখেছে গাঁয়ের বাড়িগুলো। দু'একটা কুকুরও চেঁচাতে শুরু করেছে টের পেল বিনোদ।

মেয়েটা কি হরিণচকেই থাকে, না অন্য কোথাও! যেখানেই থাক, এই রাতে একা একা বাড়ি থেকে বেরোয় কি করে! নিজের বিপদের কথা নাহয় ছেড়েই দেওয়া হল, পাড়া, সমাজ এ সবও তো আছে। কেমন ওর বাপ মা কে জানে!

আবার টর্চ জ্বেলে গাঁয়ের রাস্তার দিকে ফোকাস মারে বিনোদ। কিন্তু না, মেয়েটা ততক্ষণে দৃষ্টির বাইরে কোথায় যেন একেবারেই হারিয়ে গেছে!

দুই

একদিকে ধনুকের ছিলার মতো বাঁক খাওয়া নদী, চন্দ্রমুখী। অন্যদিকে অক্ষয়বাবুদের জলকর। মাঝখান দিয়ে আট দশ ফুট উঁচু ইরিগেশনের বাঁধ। সরকারি বাঁধ বলেই রক্ষে, এ বাঁধ মেরামতের কাজ যদি জলকরের টাকায় করতে হত, তাহলে ঢাকের দায়ে মনসা বিকোত।

বাঁধের প্রায় মাঝামাঝি জায়গায় হাত পঞ্চাশেক জমির ওপর মাটি ফেলে একটা উঁচু ভিত মতো করে নেওয়া হয়েছে। ওখানে গোটা তিনেক ঘর, ওটাই আলাঘর। অর্থাৎ জলকরের জিমনি-জেলেদের আস্তানা।

আলার কাছাকাছি নদীর বাঁধে দুটো স্লুইস গেট বসানো আছে। একটা দিয়ে জলকরের বাড়তি জল নদীতে বার করে দেওয়া যায়, আবার আর একটায় নদীর নোনা জল ইচ্ছে মতো ভেতরে ঢুকিয়েও নেওয়া যায়।

জল বার করে দেওয়ার গেটটা আলার প্রায় গায়ে গায়ে। গেট থেকে জলকরের ভেতরে হাত পঞ্চাশেকের মতো একটা খাল কেটে রাখা হয়েছে। খালটাকে মূল জলাশয় থেকে আলাদা করে রাখা হয়েছে বাঁশের পইনা দিয়ে মুখ আটকিয়ে। অর্থাৎ এই খালটাই যেন আলাদা একটা ঘের। জলকরের মাছ স্রোতের টানে অনায়াসে এই ঘেরে ঢুকতে পারে কিন্তু বেরুতে পারে না। জল যখন ছাড়া হয়, মাছ তখন এই পইনার কাছে এসে ভিড় করে। তখন প্রয়োজন মতো তাদের তোলা হয়।

আলাঘরের কাছাকাছি আর একটা গেট রয়েছে শ'খানেক হাত তফাতে। এই গেটের কাছেই মাকাল ঠাকুরের মন্দির। মাকাল না মহাকাল কেউ সঠিক করে বলতে পারে না। আর নামেই মন্দির। আসলে একটা ঝুপড়ি ঘর। ভেতরে উঁকি মারলে দেখা যায় মাটির তৈরি একটা মূর্তি, তার গা থেকে রং মাটি খসে খসে পড়েছে।

মাঘী পূর্ণিমায় ঘটা করে এই মাকাল ঠাকুরের পুজো দিয়ে মাছের

চারা ছাড়া শুরু হয়েছিল জলকরে। এখন সেই চারাই ফলন দিতে শুরু করেছে। এ বছর রেকর্ড ফলন দিতে পারে। এজন্য পুরো বাহাদুরিটা জলকরের মুহুরি ভাইদাকেই দেওয়া উচিত। লোকটা দিন রাত এই জলকরেই পড়ে থাকে। এখানকার জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ সবই করতে হয় ওকে। অক্ষয়বাবুদের কপাল ভালো, এ রকম একজন বিশ্বস্ত কাজের লোক পেয়েছেন ওরা। ভাইদার ওপর ভরসা করেই এখন ওরা কলকাতায় বসে কাটাতে পারছেন।

জলকরের জন্য একজন ম্যানেজারও আছেন। প্রসন্নবাবু, প্রসন্নকুমার বেরা। নামকা ওয়াস্তে ম্যানেজার। থাকেন বাজারের প্রায় কাছাকাছি নিজের বাড়িতে। উনি পঞ্চায়েতেরও সদস্য। জীবনটাকে একদিকে যেমন রাজনীতির আদর্শে জড়িয়ে রেখেছেন। তেমনি আবার বিষয়-আশয় না দেখলেও চলে না। বিষয় সম্পত্তি বলতে দোতলা একটা বাড়ি, বাড়ির চারপাশে কয়েক বিঘা জমির ওপর বাগান, পুকুর। বাপকেলে কিছু ধানী জমিও রয়েছে। সব মিলিয়ে অবস্থা বেশ স্বচ্ছলই বলা চলে। সংবৎসরের ধান চাল বা শাকশব্জীর অভাব হয় না, মাছেরও না। ফলে জলকরের ম্যানেজারিটা ওর বাড়তি ব্যাপার। আসলে নামেই ম্যানেজারি, রাজনীতির পাণ্ডা প্রভাবশালী একটা লোককে কেবল হাতে রাখা। তেমন বড় রকমের কোন ঝামেলা ঝামেলা হলে ম্যানেজারবাবুকেই এগিয়ে দেওয়া যেতে পারে, এই যা।

ভাইদার কাছে ব্যাপারটা খুব পরিষ্কার। অক্ষয়বাবুদের এটা একটা চাল। পঞ্চায়েতের সদস্যকে হাতে রাখা মানে অনেক দিক থেকেই সুবিধা। তবে যেমন সুবিধা তেমনি অসুবিধারও শেষ নেই। আর সেই অসুবিধার কথাটা কিছুতেই অক্ষয়বাবুদের বোঝানো যাবে না।

অনেকবার বোঝাবার চেষ্টা করেছে ভাইদা, কিন্তু সবই অরণ্যে রোদন। কে শোনে!

ম্যানেজারবাবুর ধান্দা অক্ষয়বাবুদের বোঝার সাধ্য নেই। ম্যানেজারবাবুর নজর হচ্ছে, জলকরটাকে কিভাবে পার্টির সেবায় লাগান

যায়। কিভাবে ওর পার্টির দুটো-একটা চেলা চামুণ্ডাকে জলকর থেকে দু'চারটে পয়সা পাইয়ে দেওয়া যায়।

ভাইদা খুব ভালোই বোঝে, জলকরের লাগোয়া এখনো বেশ কিছু জমি পড়ে আছে, যে জমি ইচ্ছে করলেই জলকরের মধ্যে ঢুকিয়ে নেওয়া যেত। তাতে জলকরেরই মঙ্গল হত। কিন্তু ম্যানেজারবাবুর জন্যই তা সম্ভব হচ্ছে না। যেমন সাবির আলির জমিটার কথা প্রায়ই মনে পড়ে। সাবির আলির বিঘা চারেক জমি একেবারে জলকরেরই গায় গায় লাগান, আর তার ফলে সে জমিতে ফলনও গেছে কমে। এ অবস্থায় সামান্য কিছু লোভ দেখালেই জমিটা জলকরে লিজ নেওয়া যেত, কিন্তু ভাইদা ভালই বোঝে, সাবির ম্যানেজারবাবুর ভোটের সময় গাধার মতো খেটেছিল. ফলে ও জমিতে হাত দেওয়া চলবে না। আবার ভরত হালদারের যে জমিটা গ্রাস করে রাখা হয়েছে, সেটার জন্য ভরতের পাওনা টাকা মিটিয়ে না দিয়ে একটা উত্তেজনাই সারাক্ষণ জিইয়ে রাখার চেষ্টা চলছে। এ রকম আরো অনেক প্রসঙ্গ তোলা যায় ম্যানেজারের নামে। তাছাড়া যেটা সবচেয়ে বড় কথা তা হল, পার্টির চাঁদার নাম করে, জনহিতকর নানা প্রতিষ্ঠানের বিষয় দেখিয়ে জলকরের টাকা নিয়মিত হাপিস হয়ে যাচ্ছে এখান থেকে। টাকাটা যে ম্যানেজারবাবুরই পকেটে ঢুকছে তাতে সন্দেহ নেই। লোক চিনতে ভাইদার এক মুহূর্তও সময় লাগে না।

তবে এসব নিয়ে হৈ চৈ বাধিয়ে এখনই ম্যানেজারের বিষ নজরে পড়তে চায় না ও। যার ঘা সেই বুঝুক, ওর কি!

বলে বটে কিন্তু টাকা পয়সার হিসেব ওকেই রাখতে হয়, তাই মাঝেমাঝে কলকাতা গিয়ে পরামর্শ না করেও ওর উপায় থাকে না।

গত মাসেই একবার কলকাতা ঘুরে এসেছে ভাইদা। কলকাতায় সার্কুলার রোডের ওপর অক্ষয়বাবুদের বিরাট বাড়ি। বাড়ির লাগোয়া সামনের দিকের মাঠে আগে কিছু ফল-পাকুড়ের গাছ ছিল, এখন সেখানে টিনের শেডঅলা একটা গ্যারেজ। ভাঙাচোরা কয়েকটা গাড়িতে সারাক্ষণই মিস্ত্রিরা কাজ করে।

ভাইদা কলকাতা এলে দু'চার দিন যা থাকে, এখানেই থাকে। ঘরের ওপাশের দরজাটা খুললেই কল, পায়খানা। বাড়ির চাকর-বাকররাই সাধারণত ওটা ব্যবহার করে। তাতে কিছু যায় আসে না ভাইদার। নিজের ব্যাগে গামছা-লুঙ্গি থাকে, ফলে স্বাধীন মতোই ও চানটান সেরে নিতে পারে। অবশ্য চান-খাওয়া যাহোক একটা হলেই হল। আসলে যে জন্যে আসা সেটা সারাই হচ্ছে ওর বড় কথা।

গ্যারেজের পাশ দিয়ে বাড়িতে ঢোকার রাস্তা। সদর দরজা থেকেই একটা সিঁড়ি দোতলায় উঠে গেছে। ইচ্ছে করলে দোতলায় উঠে পড়া যায়, বাঁ পাশের বৈঠকখানা ঘরে গিয়েও বসা যায়। ভাইদা অবশ্য অনেক দিন এ বাড়িতে এসেছে, কিন্তু কখনো দোতলায় ওঠে নি। প্রতিবারই বৈঠকখানা ঘরে বসে কাটিয়েছে। তবে সবার আগে ও কলিং বেল বাজিয়ে জানিয়ে দেয়, ও এসেছে।

বাইরের লোকের জন্যই এই বৈঠকখানা ঘর। ঘরে ঢুকলেই বাড়িটার বনেদীআনা বোঝা যায়। বিশাল ঘরটার তিন ভাগ জোড়া বিরাট একটা খাট। খাটে পুরু গদি, তাকিয়া। ধবধবে একটা চাদর বিছোন। দেয়ালে বড় বড় কয়েকটা মান্ধাতার আমলের অয়েল পেন্টিং। আগে হয়তো সিলিং থেকে ঝাড় লণ্ঠন ঝুলত, এখনো তার চিহ্ন রয়ে গেছে। অক্ষয়বাবুদের এখন পড়তি অবস্থা। তাহলেও এককালে যে ওরা বাঘে-গরুতে জল খাওয়াতেন তাতে সন্দেহ নেই।

অক্ষয়বাবুর চেহারায়, কথায়বার্তায় সেই দাপটের রেশ এখনো মুছে যায় নি। ভাইদা এসেছে জানতে পারলেই সব কাজ ফেলে উনি নিচে নেমে আসেন।

কী ব্যাপার মুহুরিবাবু? নতুন আবার কী সমাচার নিয়ে এলে শুনি?

জলকর থেকে কলকাতায় আসার সময় প্রতিবারই ভাইদা কিছু না কিছু মাছ নিয়ে আসে। সেবারও আলাদা একটা থলিতে মাছ নিয়ে গিয়েছিল, অক্ষয়বাবুর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম সেরে মাছের থলিটা এগিয়ে ধরেছিল, কিছু বাগদা নিয়ে এসেছি হুজুর।

কই দেখি দেখি! থলিটার দিকে ঝুঁকে পড়েছিলেন অক্ষয়বাবু, বাহ্ চমৎকার চেহারা তো! কিন্তু অত এনেছ কেন? অত কে খাবে? এ যে যজ্ঞিবাড়ির ব্যাপার।

বেশি কোথায়! পাঁচ ছ' কেজির বেশি নয়। ফ্রিজে রেখে দিয়ে খেতে পারবেন। এ সব মাছ তো এদিকে পাওয়ার কথা নয়, তাই নিয়ে এলাম।

তা অবশ্য ঠিক! বাঙালীরা তো বাগদা খাওয়ার কথা ভুলেই গেল। বাগদারা এখন জাহাজে চড়ে বিলেত যায়। তোমাদের জলকর নিয়ে যত খাটাখাটি সবই তো ওই লালমুখোদের জন্য। তাই না? হাসেন অক্ষয়বাবু!

বাড়ির চাকর রাইচরণ এসে মাছগুলো নিয়ে যায়।

ভাইদা খাটে না বসে দেয়ালের পাশে রাখা লম্বা একটা বেঞ্চের একপাশে বসে পড়ে।

মাছের ফলন এবার বেশ ভাল অক্ষয়বাবু। শেষরক্ষা যদি করা যায়, তাহলে এবার কিছু পয়সার মুখ দেখা যাবে।

অক্ষয়বাবু আয়েশ করে খাটে তাকিয়া টেনে বসে পড়েন। ফলন ভাল হওয়া আর পয়সা পাওয়া কি এক কথা। ফলন ভাল তো ক'বছর ধরেই শুনতে পাচ্ছি। তবু ঋণের বোঝা কমে কই।

এবার হুজুর বাজারটাও ভাল। গতকালই কাঁটাদারদের কাছে একশ' পাঁচে ছেড়েছি।

গতবার তো একশ' পনের অবধি উঠেছিল।

এবার হুজুর কুড়ি তো উঠবেই, তিরিশও উঠতে পারে।

বলছ তো, দেখ শেষপর্যন্ত কি হয়।

হুজুর আপনাদের উচিত মাঝেমাঝে গিয়ে ঘুরে আসা। সবটাই কি লোকের ওপর ছেড়ে দেওয়া চলে। কতকাল আপনি ওদিকে যান নি, ভাবুন তো!

একটুক্ষণ গম্ভীর থেকে অক্ষয়বাবু বলেন, যাবার তো ইচ্ছে, কিন্তু সামনের এই গ্যারেজটা নিয়েই পাগল হয়ে আছি। ঠিক আছে, দেখি

এত করে যখন বলছ যেতেই হবে এবার। তা ম্যানেজারবাবু আবার নতুন কি ঝামেলা করলেন ?

ভাইদা এপাশ ওপাশ তাকিয়ে নেয়। গত বছর ভরত হালদারের জমিটা নিয়ে একটা কথা হল, সেই মতো ম্যানেজারবাবুকে দু'হাজার টাকাও দেওয়া হল ভরতকে দেওয়ার জন্য, কিন্তু আজ পর্যন্ত ভরতকে সেই টাকা দেওয়া হয় নি।

কিসের টাকা ?

ভরতের কাছ থেকে বিঘে চারেক জমি লিজ নেওয়া হয়েছিল। বিঘে প্রতি ও ছ'শ করে চেয়েছিল, শেষটায় পাঁচশতে রফা হয়। বছরে পাঁচশ টাকা এমন কিছু বেশিও নয় হুজুর, ওর কমে কেউ দেবে না। কিন্তু গত বছরের টাকাটা তো ও পেলই না, এবার আবার পাওনা হয়ে গেল।

ম্যানেজারবাবু কি বলছেন ? টাকাটা উনি দিয়েছেন কিনা জিজ্ঞেস করেছ ?

দেন নি হুজুর। আমি জানি, দেন নি। আসলে ভরতের সঙ্গে ওর বনিবনা নেই, ভরত অন্য পার্টির লোক। আর সেটাই ওর দোষ।

ম্যানেজারবাবুকে জিজ্ঞেস করে নিতে দোষ কি ! একটু বিরক্তি প্রকাশ করেন অক্ষয়বাবু।

ভাইদা দমে না, ভরতই বলে গেছে হুজুর, ও টাকা পায় নি। একদিন এসে চোটপাটও করে গেছে আমাদের ওপর। ম্যানেজারবাবুকে তখন সবই জানানো হয়েছিল। উনি বললেন, ও ব্যাপারটা উনি একাই বুঝবেন, আমাদের নাকি মাথা না ঘামালেও চলবে। ভরতের কাছে নাকি ম্যানেজারবাবুই টাকা পাবেন।

খানিকক্ষণ গম্ভীর হয়ে থাকেন অক্ষয়বাবু, ঠিক আছে, যাবার সময় আমার কাছ থেকে একটা চিঠি নিয়ে যেও। আর ওকে বলো, ভরতের ব্যাপারটা নিয়ে আমাকে যেন একটা চিঠি লেখে।

এ ছাড়া উনি ওদের পার্টির দু-একটা ছোকরাকে জলকরের কাজে

ঢোকাতে চান! এমনিতেই আমাদের লোকের অভাব নেই, তার উপর আবার লোক বাড়ানো মানেই খরচ বাড়ানো।

কিছুদিন আগেই তো একজনকে নিলে। কি নাম যেন?

ভাইদা বলল, বিনোদ। বিনোদ জানা। খুব কাজের লোক হুজুর। ওকে নেওয়াতে ভালই হয়েছে। জলকরে এখন সব মিলিয়ে চোদ্দ জন লোক। এদের মধ্যে দু'একজনই যা একটু বেয়াড়া ধরনের, তাছাড়া আর সব চলে যায়।

বেয়াড়া কি রকম?

আপনার সেই শিবুকে মনে আছে হুজুর? শিবু হালদার? মানে ভরত হালদারেব ভাই?

অক্ষয়বাবু তাকিয়ে থাকেন।

সেই যে যার বউকে কামটে খাওয়ার পর ভীষণ গোলমাল শুরু হয়েছিল জলকরে।

হ্যাঁ হ্যাঁ, শিবু। কেমন আছে এখন?

ভালই আছে, বউয়ের শোক ভুলে গেছে। তবে ওকে ল্যাঙবোট করে ফেলেছেন ম্যানেজারবাবু। শিবু তো সারাদিন ওর বাড়িতেই পড়ে থাকে। ওর বাগানের কাজ করে। জলকর থেকে ও মাইনে নেয় অথচ কাজ করে ম্যানেজারের।

তাই বুঝি! গম্ভীর মুখে আবার কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকেন অক্ষয়-বাবু। আচ্ছা ওই শিবুরও তো কিছুটা জমি ছিল না?

ওর ঠিক নয়। আসলে ও হচ্ছে ভরত হালদারের ভাই। ভরতের সঙ্গে ওর বনিবনা নেই। ওর অংশ নাকি ও ভরতের কাছে বিক্রি করে দিয়েছে।

কে বললে?

ভরতের মুখেই শুনেছি। শিবুকেও জিজ্ঞেস করেছিলাম, শিবু মুখ খুলতে চায় না। কেমন একটু পাগলাটে-পাগলাটে হয়ে গেছে শিবু। যা করে নিজের খেয়াল ছাড়া করে না।

অক্ষয়বাবু আবার স্থির চোখে তাকিয়ে থাকেন।

ততক্ষণে রাইচরণ ভাইদার জলখাবারের জন্য রুটি তরকারি আর কাচের গেলাসে এক গ্লাস চা নিয়ে এসেছিল, থালাটা এগিয়ে ধরল, মুহুরিবাবু চা ঠাণ্ডা হয়ে যাবে, খেয়ে নিন আগে।

অক্ষয়বাবুও এবার গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়ান, হ্যাঁ হ্যাঁ, তুমি আগে হাতমুখ ধুয়ে খেয়ে নাও দেখি, আজ থাকছ তো ?

ভাইদা মাথা নাড়ে, থাকবে। তবে কাল খুব ভোরে উঠেই চলে যেতে হবে। বিকেলে কিছু কেনাকাটা আছে, নইলে আজই চলে যেতাম।

ঠিক আছে, তুমি তাহলে এখন একটু বিশ্রাম কর, পরে আবার কথা হবে।

অক্ষয়বাবু ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে যান, সিঁড়ি দিয়ে আবার দোতলায় উঠে পড়েন।

ভাইদা তবু কিছুক্ষণ ঠায় বসে তাকিয়ে থাকে সিঁড়ির দিকে। এ লোকটাকে জলকরের এত সমস্যার কথা বলা হয় কিন্তু কি কাজ হয় তাতে। কিছুই হয় না, জলকরের যা ঝামেলা সবই ওর কাঁধে। বকলমে যেন ওকেই মালিক বানিয়ে রাখা হয়েছে জলকরের! মুকুটহীন রাজার মত আর কি !

আসলে অক্ষয়বাবু যদি নিজে জলকরের ধারেকাছে মাস-কয়েক থাকতেন তাহলে বুঝতে পারতেন কত ধানে কত চাল। কলকাতায় বসে ওখানকার সমস্যা বোঝা অসম্ভব।

অক্ষয়বাবুর নিজের অবশ্য ছুটোছুটি করার কিছু অসুবিধা আছে। এতখানি বয়েস, ও রকম জল-কাদার দেশে গিয়ে থাকতে হলে সঙ্গে একটা বিরাট লটবহর প্রয়োজন। ছেলেরা সব উপযুক্ত হলেও বুড়ো বাপের সঙ্গে কেউ যেতে রাজি নয়। ছেলেরা অবশ্য মাঝে মাঝে যে ওখানে না যায় এমনও নয়, কিন্তু ছেলেরা যায় ইয়ারবন্ধু নিয়ে ফুর্তি করতে।

গত পুজোর ঠিক আগেই অক্ষয়বাবুর মেজ ছেলে তুই বন্ধুকে নিয়ে হাজির হয়েছিল জলকরে। মেজ ছেলের নাম স্বপন। হাবভাব চলন

বলনই ওদের অন্য রকম। ঠিক খাপ খায় না, তবু ওদের তোয়াজ করায় কারো এতটুকু খামতি ছিল না।

খবর পেয়েই ছুটে এসেছিলেন ম্যানেজারবাবু। আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন ওদের নিয়ে গিয়ে নিজের বাড়িতে তুলতে। ভাবখানা এ রকম যেন আলায় থাকলে কে কি মন্ত্র কানে দেবে তার চে' নিজের মুঠোর মধ্যেই রাখা ভাল।

কিন্তু ছেলেগুলো যায় আর এক কাঠি ওপরে। ওরা এসেছে ফুর্তি করতে, কারো বাড়িতে গিয়ে ওঠার কোন মানেই হয় না। ওরা এই আলাঘরেই উঠেছিল।

ম্যানেজারবাবু বলেছিলেন, এটা ভাল দেখায় না স্বপন। তোমরা এখানে এসে কষ্ট করে আলায় পড়ে থাকবে, এটা ভাল দেখায় না। তাছাড়া আমার বাড়িটা একবার দেখবে চল না, তোমাদের অপছন্দ হবে না।

না না কাকাবাবু, এখানেই ভাল। এখানে আমাদের একদম কষ্ট হবে না। আপনি কিচ্ছু ভাববেন না। আপনার বাড়ি না হয় এক সময় গিয়ে ঘুরে আসব।

আলায় বাঁশের বেড়া আর খড়ের ছাউনি দেওয়া তিনটে ঘর। গায়ে গায়ে লাগান। একটাতে ঢুকলেই দেখা যাবে বড় বড় দুটো কাঠের উনোন; ঝুড়ি বালতি গামলা ডেকচি আগড়ম বাগড়ম। দেখলেই বোঝা যায়, রান্না ঘর। আলার বার-চোদ্দ জনের রান্না তো আছেই, বাড়তি দু'চার জন লোক হয় না এমন দিন যায় না।

মাঝের ঘরটায় জিমনি আর জেলেরা থাকে। ঘরের একপাশে টানা লম্বা বাঁশের মাচা। মাচায় স্যাঁতসেতে কিছু বিছানা সারাক্ষণই পাতা থাকে। এক পাশে দু'চারটে চটা ওঠা টিনের বাক্স। মাচার নিচে মাছ ধরার নানা সরঞ্জাম; ধোসনা, পাটা, জাল আরো কত কি!

একেবারে সামনে মাঝারি আকারের ঘরটা ভাইদার। এ ঘরে একটা ক্যাম্প খাট, একপাশে একটা টেবিল। টেবিলে গোটা কয়েক ফাইল, কাগজপত্র। এ ঘরটাই স্বপনবাবুদের ছেড়ে দিয়েছিল ভাইদা।

তেমন বিশিষ্ট কোন লোকজন এলে এ ঘরটা ছেড়ে না দিয়ে উপায়ও থাকে না। ফলে, স্বপনবাবুরা এখানে যে ক'দিন ছিল, ভাইদাকে মাঝের ঘরে আর দশ জনের সঙ্গেই রাত কাটাতে হয়েছে। তাতে অবশ্য বিন্দুমাত্র অসুবিধা হয় নি ভাইদার। হাসি মুখেই সব কিছু মানিয়ে নিতে পারে ভাইদা।

তবে একটা রাত কাটতে না কাটতেই স্বপনবাবুদের হাবভাব দেখে কেমন যেন হকচকিয়ে গিয়েছিল ভাইদা। অক্ষয়বাবুর ছেলে বলে ভাবতে কেমন কষ্ট হয়েছিল ওর। অক্ষয়বাবু কত সাত্ত্বিক, কত ধার্মিক মানুষ, অথচ তারই ছেলে হয়ে কিভাবে বোতলের পর বোতল মদ উড়িয়ে গেল ওরা। মদের বোতল লোক দিয়ে আনিয়ে দিতে হয়েছে ভাইদাকেই। কপালের লেখা ছিল তাই ও সব করতে হয়েছিল।

স্বপনবাবুরা মদ খাক আর যাই করুক, সারাক্ষণ নজর রাখতে হয়েছে ওদের। পান থেকে চুণ যাতে না খসে সারাক্ষণ তার জন্য সতর্ক থাকতে হয়েছে।

এ সময় ম্যানেজারবাবুরও স্বস্তি ছিল না। সারাক্ষণ প্রায় আলাতেই পড়ে থাকতেন। বাড়ি থেকে কখনো-সখনো ভাল-মন্দ খাবার আনাতেন। নিজে কখনো বিড়ি ছাড়া খান না, কিন্তু স্বপনবাবুদের খুশি রাখতে হবে বলে সারাক্ষণ পকেটে সিগারেট রাখতেন। কত মিষ্টি-মিষ্টি কথা, কত কৌশল। এমন ভাব করতেন যেন উনিই সব, এই জলকরের চিন্তায় রাতে ওর ঘুম হয় না।

ম্যানেজারবাবুর রকমসকম সহ্য করার নয়, অন্তত ভাইদা কিছুতেই লোকটাকে বরদাস্ত করতে পারে না। তবে ভেতরে যা থাক, বাইরে তা প্রকাশও করে না। ভাইদা ভালই বোঝে, যেমন ওল তেমন তেঁতুল হওয়া দরকার। ফলে একটা কেবল সুযোগের অপেক্ষায় আছে ভাইদা। একবার একটু দাঁও মতো পেলে হয়, ম্যানেজারি কাকে বলে বুঝিয়ে দেওয়া যাবে তখন।

চোখদুটো খরিশ কেউটের মতো চকচক করতে থাকে ভাইদার।

তিন

চারপাশ ফর্সা হয়ে উঠতেই বিনোদ টং ছেড়ে আলায় ফিরে এল। আসবার সময় শিবুর টংয়েও একবার উঁকি মেরে এল, না নেই। টং ফাঁকা। সারাটা রাত শিবু তাহলে আজও অন্য কোথাও কাটিয়েছে। কোথায় কাটাল, কোথায় কাটাতে পারে! সন্দেহটা কেমন যেন মাথায় চেপে বসে ওর।

ভেবেছিল আলাতেই হয়তো দেখা হয়ে যাবে, কিন্তু না, আলাতেও নেই। কেমন অস্বস্তি হতে থাকে। রাতে যে মেয়েটা খোঁজ করতে এল, সে কে হতে পারে শিবুর! তবে কি মেয়েটার সঙ্গে কোন গোপন সম্পর্ক আছে ওর। কে জানে! একবার ভাবল নন্দ বা বলাইকে জিজ্ঞেস করে, ওরাও মেয়েটাকে টের পেয়েছে কি না। কিন্তু না, সাহস হয় না। শিবু জানতে পারলে হৈচৈ বাধিয়ে বসবে। মিছিমিছি কে ঝামেলায় জড়াতে চায়।

ফলে রোজকার মতই আলায় ফিরে এসেছিল বিনোদ। মেয়েটার ব্যাপারে ভুলেও মুখ খোলে নি। কি দরকার ওর মুখ খোলার, যার ব্যাপার সেই বুঝবে।

আলায় আজ কেমন একটা ঢিলেঢালা ভাব। বাজারের দিকে মাছ পাঠান হয় নি, ফলে সবার সঙ্গেই প্রায় দেখা হয়ে গেল। বাজারে মাছ পাঠান না হলেও বাঁধের ওপর কিছু মাটি ফেলার কাজ রয়ে গেছে। আলায় যারা রাতে ঘুমিয়েছে তারাই সে কাজ করবে।

বিনোদ দেখল, এই ভোরেই রান্না ঘর থেকে এক সানকি পান্তা নিয়ে খেতে বসেছে কিশোরী। মাঝের ঘর থেকে ঝুড়ি কোদাল টেনে টেনে বার করছে ভোলা। স্লুইস গেটের কাছে এক কোমর জলে নেমে কি যেন করছে ব্রজলাল, হয়তো কতটা মাছ জমেছে, তাই দেখছে। বিনোদ ধীরে ধীরে ঘরে ঢুকে দেখল, এরই মধ্যে বলাইটা মাচার এক পাশে কাঁথা মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়েছে।

একটা ধাক্কা দিল ও বলাইকে, কি গো বড়বাবু! সারা রাত তো টংয়ে ঘুমুলে, আবার এখনই ঘুম!

বলাই ঝট করে কাঁথা থেকে মুখ সরায়, টং কি ঘুমুবার জায়গা যে ঘুমুব? বিরক্ত করিস নাতো, পালা।

বিনোদ আরো একটু এগিয়ে এল, ঘুমোও নি মানে! নাকে তেল দিয়ে তো ঘুমুতে দেখলাম। ক'বার তোমাদের টংয়ে আলো ফেললাম, সাড়াই পাই নি।

আলো ফেললি, কেন! বলাই একটু সতর্ক হয়। রাতে টংয়ে উঠেই ওর ঘুম পেয়ে গিয়েছিল ঠিকই। কি জানি বিনোদটার হাতে ধরা পড়ে গেলাম কিনা।

কেন কি, বেশ কয়েকবার আলো ফেলেছি। কাল রাতে চোর এসেছিল টের পেয়েছ?

চোর! আধশোয়া হয়ে উঠে বসে বলাই, কখন?

কখন আবার, কোঁচড় ভরে মাছ নিয়ে পালাল।

বলাই অবিশ্বাস্য চোখে তাকায়, ধ্যাট, গ্যাস ঝাড়ছিস।

বিনোদ বলে, গ্যাস তো গ্যাস। ঠিক আছে টের পাবে'খন।

বলাই এবার ফ্যালফ্যাল করে এপাশওপাশ তাকিয়ে নিয়ে জিজ্ঞেস করে, ভাইদা জানে? বলেছিস নাকি ভাইদাকে?

মাথা খারাপ! এ সব কথা বলা যায়!

একটুক্ষণ গম্ভীর হয়ে থেকে বলাই আবার জিজ্ঞেস করে, কি রকম চোর? একা, না দল বেঁধে?

বিনোদ বলল, একা।

চেনা কেউ, না অচেনা মুখ?

বিনোদও একবার এপাশওপাশ তাকিয়ে নেয়, চিনব কি করে! বেটা ছেলে হলে কথা ছিল। প্রথমটায় আমি বিশ্বাসই করতে পারি নি, একা অমন একটা ডবকা মেয়াছেলে মাছ চুরি করতে আসবে। একদম একা।

বলাই উত্তেজনায় একটা বিড়ি ধরিয়ে ফেলে, বিনোদ সঙ্গে সঙ্গে হাত বাড়ায়, এদিকে একটা ছাড় দেখি, সারা রাত বিড়ি না খেয়ে খেয়ে পেট ফেঁপে আছে।

ইচ্ছে না থাকলেও একটা বিড়ি এগিয়ে দেয় বলাই, ব্যাপারটা বল দেখি।

কি আর বলব। চাঁদের আলো ছিল বলেই মেয়েটাকে আমি দেখতে পেয়েছি। টর্চের ফোকাস ফেললাম, মেয়েটা ছুটে গাঁয়ের দিকে পাইলে গেল।

বিনোদ খুব সাবধানে কথা বলছিল, এমনভাবে বলছিল যেন সাপও মরে, লাঠিও না ভাঙে। মেয়েটা যে মাছ চুরি করার বদলে শিবুর খোঁজ করতে এসেছিল তা বিন্দুমাত্র ভাঙল না।

নেভা বিড়িটা আবার ধরিয়ে নিল বলাই, নন্দকে বলেছিস? নন্দ জানে?

পেলে তো বলব।

কাঁকড়া ধরতে গেছে। ভাইদা ওকে কাঁকড়া ধরতে পাঠিয়েছে।

কোথায়?

নদীর ধারেই হয়তো!

চল না তাহলে নন্দকে একবার জিজ্ঞেস করি, ও কিছু দেখেছে কি না!

বলাই বলল, একটু ঘুমিয়ে নেব ভেবেছিলাম, ঠিক আছে চল। আজ হাটবার, হাটের দিকেও একবার যেতে হবে।

কেন? হাটে কি হবে?

মাচা থেকে নেমে দাঁড়ায় বলাই, এই দেখ পায়ের আঙুলগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখ, কি হয়েছে!

বিনোদ চমকে ওঠে, ইস, ঘা করে ফেলেছ আঙলে।

হ্যাঁরে, বড্ড কষ্ট পাচ্ছি। তাই ভাবছি হাটে গিয়ে ওষুধ কিনে আনব।

ওষুধ কিনবে তো ডাক্তারের কাছে যাও, হাটে কি হবে?

নোংরা একটা ছেঁড়া জামা বেড়া থেকে টেনে নিয়ে পরে নিল বলাই, ডাক্তারের ওষুধে আমাদের কাজ হয় না। ও সব বাবুদের জন্য। হাটে অনেক জড়িবুটি আসে, ওদের কাছ থেকে কিনব। ওদের ওষুধে বেশ কাজ হয়, দামেও সস্তা।

বিনোদ বলল, ঠিক আছে তাই চল তালে।

ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ে ওরা। বাইরে বেরতেই ভাইদার সঙ্গে দেখা, কোথায় যাওয়া হচ্ছে বাবুদের ?

বলাই বলল, একবার একটু হাটে যাব ভাইদা। পায়ে হাজা হয়েছে, ওষুধ কিনতে হবে।

হাট তো বিকেলে, এখন কি ?

বিনোদ বলল, বিড়িও কিনতে হবে। যাই একটু ঘুরে আসি।

যাচ্ছ যাও, আবার দিন কাবার করে এসো না যেন। আজও রাত জাগতে হবে, মনে থাকে যেন।

রাত জাগার কাজে বিন্দুমাত্র ভয় পায় না বিনোদ। বলল, টংয়ে রাত কাটাতে আমার খারাপ লাগে না। রোজ রোজ টংয়ে থাকতে হলেও আমার আপত্তি নেই।

টংয়ে থাকা মানে ঘুমোন নয়, মাছ বড় হয়ে উঠছে, এখনি উৎপাত শুরু হওয়ার সময়।

বলাই বলল, জানি। তবে চোররা আজকাল অনেক কৌশল শিখেছে ভাইদা। দিনেও দশজনের সামনে থেকে মাছ চুরি করে নিয়ে পালাতে পারে।

ভাইদা একবার বাঁকা চোখে বলাইয়ের দিকে তাকায়, দিনের কথা তোদের ভাবতে হবে না। রাতেরটা সামাল দে, তাহলেই হবে। রাতে কে কে ঘুমোয়, আর কে কে জাগে, এবার থেকে মাঝে মাঝে গিয়ে দেখে আসতে হবে।

বলাই ফ্যাকাসে একটু হাসল। তারপর আর দাঁড়াল না ওরা। আলা থেকে ভেড়িতে পা দিতেই নদীটা ওদের চোখে পড়ল। এখান থেকে নদীর চেহারাটা ভারি চমৎকার দেখায়। সপ্তমী কি অষ্টমীর চাঁদের মতো বাঁকা, চন্দ্রমুখী নামের সঙ্গে সুন্দর একটা মিল পাওয়া যায় এখানে দাঁড়ালে।

নদীর ওপারের গ্রাম শিবতলা। শিবতলার হাটখোলাটাও দেখা যায়। বেশ কিছু নৌকোর ভিড় দেখা যাচ্ছে ওখানে।

নদীতে এখন মাঝ ভাঁটা। আর ভাঁটার জন্য নদীর জল অনেক নিচ অবধি নেমে গেছে। দু'পারেই নদীর ঢালে থিকথিক করছে কাদা। সেই কাদায় এদিক-ওদিক ছড়ান বেশ কিছু নৌকো পড়ে আছে। জোয়ার এলে নৌকোগুলি আবার ভেসে উঠবে।

মাঝ নদী দিয়ে পাশাপাশি দুটো ভটভটি যেতে দেখল ওরা। বহু-দূরে বাজারের দিকে খেয়া পারের নৌকো চলছে। দু' একটা খড় বোঝাই নৌকোও চোখে পড়ল। এসব দৃশ্য ওরা রোজই দেখে, নতুনত্ব নেই; কিন্তু আজ যেন সব কিছুই কেমন রহস্যময় লাগছে বিনোদের।

মাকাল ঠাকুরের মন্দিরের কাছে আসতেই নন্দকে দেখা গেল, ওই যে নদীর ঢালে গো! কাদায় ভূত হয়ে কাঁকড়া ধরছে।

বলাইও দেখল, নন্দ উবু হয়ে কাঁকড়া ধরছে। কোমরে একটা টুকরি বাঁধা। কাঁকড়া তুলে তুলে দাঁড়া ভেঙে টুকরিতে রাখছে।

থাক, ধরুক। আয় একটু বসি এখানে। ও আস্থক।

ততক্ষণে হাঁটু ভাঁজ করে বসে পড়েছিল বলাই, ভাইদা ও কথা বলল কেন রে? সরাসরি এবার বিনোদের দিকে তাকায় বলাই।

কি কথা?

ওই যে রাতে কে কে ঘুমায়, কে কে জেগে থাকে, দেখবে?

বিনোদ বলল, কি জানি, কেন বলল!

নির্ঘাৎ তুই কিছু বলেছিস।

এই দেখ, আমি কি বলতে যাব। তাছাড়া সত্যি সত্যি তো আমি তোমাদের টংয়ে টর্চ ফেলি নি।

টর্চ ফেলিস নি! তাহলে মাছ চুরির ঘটনাটা বানিয়ে বানিয়ে বললি?

না, বানিয়ে নয়। সত্যি সত্যি একটা মেয়ে এসছিল। মেয়েটার নামও জেনে গেছি।

কি নাম?

হাসি।

ভ্রু কুঁচকে তাকায় বলাই, কি করে জানলি?

জিজ্ঞেস করেছিলাম!

জিজ্ঞেস করলি আর অমনি বলে দিল।

ধর্ম বলছি, তাই বলল।

ততক্ষণে নন্দও এগিয়ে এসেছে, কি গো? কি হয়েছে?

বলাই উঠে দাঁড়ায়, কাল রাতে ঘাটের একটা মেয়ে এসেছিল বিনোদের কাছে। বলেই হিঁ হিঁ করে হাসতে থাকে।

ঘাটের মেয়ে! নন্দ পায়ের কাদা ঝাড়তে ঝাড়তে হঠাৎ থেমে গেল, ঘাটের মেয়ে মানে, লঞ্চ ঘাটের?

তাহলে আর কি বলি! রাতে চুপিচুপি এসে ওর টংয়ে উঠে বসেছিল। হি হি।

লঞ্চ ঘাটের মেয়ে বলতে কি, বিনোদেরও জানা। হালে লঞ্চ ঘাটের বাঁ দিকে আট দশটা ঝুপড়ি ঘর গজিয়ে উঠেছে। তাতে সব নষ্ট মেয়েরা থাকে। নৌকার মাঝি-মাল্লাদের প্রায়ই ওখানে ঢুকতে দেখা যায়।

ভাইদার মুখেই বিনোদের শোনা, মেয়েগুলোকে উৎখাতেরও নাকি অনেক চেষ্টা হয়েছে, কিন্তু পেছনে ওদের কলকাঠি নাড়ার লোক আছে, তাই নাকি সম্ভব হয় নি। ম্যানেজার প্রসন্নবাবুও নাকি চান না ওরা উঠে যাক। ম্যানেজারবাবুর মতে, মানুষ তো; উঠিয়ে দিতে কতক্ষণ, কিন্তু যাবে কোথায় ওরা। আসলে মেয়েগুলোর কাছ থেকে নজরানা নেয় ম্যানেজার। ভাইদার মুখেই এসব শোনা, কিন্তু বিশ্বাস করতে পারে না বিনোদ। প্রসন্নবাবু অত নিচে নামতে পারেন বিশ্বাস হয় না।

বিনোদ উঠে দাঁড়ায়, বিশ্বাস করলে না তো! ঠিক আছে, যা মুখে আসে বলে যাও।

নন্দ আরো একটু এগোয়, কি হয়েছে বল না?

কি আর হবে, আমরা নাকি সারা রাত টংয়ে ঘুমিয়ে কাটিয়েছি। আর ও জেগে বসেছিল।

নন্দ প্রতিবাদ করল, বাজে কথা। আমি ঘুমুইনি। ঘুমঘুম ভাব এসেছে ঠিকই, কিন্তু ঘুমুই নি।

তাহলে কাল রাতে যে একটা মেয়ে এসে মাছ চুরি করে নিয়ে পালাল টের পেলে না কেন ? কেমন কৌতুক বলাইয়ের চোখে।

বিনোদ বলল, মাছ চুরি করেছে কিনা আমি দেখি নি। তবে একটা মেয়ে যে এসেছিল আমি নিজের চোখে দেখেছি।

এই, শোন কথা। একটা মেয়ে এল। অথচ—

ও কথা থাক, বিনোদ একটু গম্ভীর হয়।

বলাই হেসে ওঠে, মেয়েটা তাহলে তোর টংয়ে সারারাত কাটিয়েছে, তাই তো ?

বিনোদ বুঝতে পারে, ব্যাপারটা ওদের না শোনালেই হত। নিজেকে সামলাবার জন্য বলল, বাজারে যাবে তো চল। আমি চললাম।

নন্দ বলল, বাজারে যাচ্ছ যখন লঞ্চ ঘাটটায় একটু ঘুরে এসো গো, বিবিদের সঙ্গেও একটু দেখা করে এসো। বলতে বলতে আবার কাঁকড়া ধরার জন্য নিচে নেমে গেল। বলাই আর বিনোদ ভেরি ধরে হাঁটতে শুরু করল বাজারের দিকে।

আলা থেকে বাজার বড়জোর মাইল খানেক পথ। গাঁয়ের লোকের কাছে এ পথ এমন কিছুই না। তেমন হলে দিনে চার বার ছ'বারও যাতায়াত করতে হয়। এখন শুকনোর সময়, ভেড়ির ওপর দিয়ে হাঁটতে খারাপ লাগে না। একদিকে নদী, আর একদিকে জলকর ছাড়ালে পতিত জমি, ঝোপঝাড় জঙ্গল। নদীর দিক থেকে হু হু করা বাতাস ছুটে আসে। হাঁটবার সময় কখনো কখনো মনে হয় বাতাস যেন উড়িয়ে নিয়ে যাবে।

ওপাশে হরিণচকের ভিতর দিয়েও একটা পথ আছে। কিন্তু নদীর ধার দিয়ে যাওয়ায় আলাদা একটা মজা পায় ওরা।

খানিকদূর এগোতেই নদীর ধারে ধারে বেশ কিছু বউ-ঝিদের চারা মাছ তুলতে দেখা গেল। হাঁটু জলে, কেউ কেউ বা কোমর জলে নেমে পড়েছে। কোমরের সঙ্গে দড়ি দিয়ে বাঁধা এলুমিনিয়মের গামলা জলে ভাসিয়ে রাখা হয়েছে। জল ছেঁকে ছেঁকে গামলায় তুলছে চারা।

দৃশ্যটা চোখে পড়ায় শিবুর বউকে কামটে খাওয়ার কথা মনে পড়ে

গেল বিনোদের। মানুষের সাহস বলিহারি। পেটের দায়ে বিপদ-টিপদ সবই আজকাল কেমন ছোট হয়ে আসছে।

নিঃশব্দেই হাঁটতে থাকে ওরা। একসময় বিনোদই আবার কথা বলে, আচ্ছা শিবুর কি ব্যাপার বল তো ভাই? সারাটা রাত কোথায় কাটায় কিছুই বোঝা যায় না।

শিবু ম্যানেজারবাবুর লোক, ওর কথা ছেড়ে দে।

তা হতে পারে, কিন্তু কাল রাতে ওই যে মেয়েটা এইছিল বললাম, ও কিন্তু এসে শিবুরই খোঁজ করছিল। কি নাকি ভীষণ দরকার ওর শিবুর সঙ্গে।

শিবুর মেয়ে না তো? এবার একটু থমকে দাঁড়ায় বলাই।

শিবুর মেয়ে আছে নাকি? অত বড মেয়ে!

ওই মেয়েকে নিয়েই তো শিবুর জ্বালা। মা মরে যাওয়ার পর মেয়েটাকে কে দেখাশোনা করে তার ঠিক নেই। শিবু তো ওর দাদা ভরতের সঙ্গে ঝগড়াঝাটি করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলো, মেয়েটা যায় কোথায়?

বিনোদ কেমন হাঁ করে তাকিয়ে থাকে। তারপর আবার প্রসঙ্গটা টানল, তা, মেয়েটার বিয়ে দিলেই তো পারে!

সে সব শিবুর ব্যাপার। শিবুই ভালো বুঝবে। ভাইদা একবার ওকে বলতে গিয়েছিল, এই মারে তো সেই মারে। তারপর থেকে আমরা কেউ আর ওকে কিছু বলি না।

বিনোদ জিজ্ঞেস করে, তাহলে কাল যে এইছিল সে শিবুর মেয়ে?

কে জানে, হবে হয়তো। জ্যাঠার কাছে থাকে। ঝাটা-লাথি খেয়ে কোনরকমে বেঁচে আছে। সবই কপাল।

আবার ওরা হাঁটতে থাকে। আলাঘরটা ধীরে ধীরে ওদের দৃষ্টির বাইরে চলে যাচ্ছে। নদীর ধার ঘেঁষে দু'চারটে করে বাড়ি এবার চোখে পড়তে থাকে ওদের। জমি কিনে কিনে অনেকে বাড়ি করছে এদিকটায়।

আরো খানিকটা এগোবার পর কাঁটাদারদের বাজারটা চোখে

পড়ল। দাপনার বেড়া দেওয়া পর পর অনেকগুলি ঘর, ঘরের সামনে বাঁশ দিয়ে মাচা করা বেঞ্চ। খুব ভোরেই বাজার শেষ হলেও এখনো বেশ লোকজন রয়েছে। চারপাশে কেমন স্যাঁতসেঁতে কাদা ছড়ান। আঁশটে মাছ-মাছ গন্ধ।

আরো খানিকটা এগোলে একটা পুকুর। পুকুরের ওপারে হাটের ব্যাপারীরা সাজিয়ে গুছিয়ে পসরা নিয়ে বসতে শুরু করেছে।

ওরা পুকুরটার প্রায় কাছাকাছি, চলে এসেছিল, হঠাৎ একটা ঘরঘরে গলা শুনে থমকে দাঁড়াল, এই যে কর্তা, তোমরা আলায় থাক না?

বলাই উত্তর দিল, আজ্ঞে হ্যাঁ।

লোকটার মাথায় ডুমো ডুমো চুল, তামাটে। বয়স দু' কুড়ির কম নয়। খালি গা, পরনে একটা লুঙ্গি। নিচের ঠোঁটটা কেমন যেন একটু ঝুলে রয়েছে। লোকটা এ অঞ্চলে কারো অচেনা নয়। এক বাক্যে সবাই ওকে 'মামু' বলে জানে। মামু গুণ্ডা। হেন কুকীর্তি নেই ও করতে পারে।

শুনলাম, আলায় নাকি গাঁয়ের গরিব মেয়েগুলোকে ফুসলিয়ে ফুসলিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়, কথাটা কি ঠিক?

বিনোদ আর বলাই যেন আকাশ থেকে পড়ে, আজ্ঞে!

কথা বোঝ না শালা! দেব গজ ঢুকিয়ে।

আজ্ঞে, এমন তো কিছু হয় না।

হয় না। চোপ শালা। আমি তাহলে বাজে কথা শুনেছি?

মামুর কোমরের লুঙ্গি কথার দাপটে আলগা হয়ে খুলে এসেছিল, আবার তা দু'হাতে সামলে নিয়ে গিঁঠ দিতে দিতে বলল, ঠিক আছে, আমি শালা একদিন খবর নিতে যাব তোমাদের। ম্যানেজারটাকে বলে দিও, যেন তৈরি থাকে।

রাগটা কি প্রসন্নবাবুর ওপর, ঠিক বোঝা গেল না। কিন্তু এরপর আর কথা বাড়ানও চলে না। বোকার মতো ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে ওরা।

মামুও আর দাঁড়ায় না। পুকুর ঘাটের দিকে এগিয়ে গেল। ঘাটে নামার মুখে একটা আম ডাল ভেঙে নিয়ে দাঁতন করতে বসে পড়ল।

বলাই ফিসফিস করে বলল, চ' পালাই।

বিনোদও বলে চ'। যেন এ মুহূর্তে পালাতে পারলেই বাঁচে ওরা।

চার

হরিণচকের ইতিহাসে গত পাঁচ সাত বছরে অনেক নতুন কিছু যুক্ত হয়েছে। নদীর ধারের নোনা জমিতে অক্ষয়বাবুরা চাষ-আবাদ বন্ধ করে জলকর করেছেন। বিঘা প্রতি আগে ধান হয়ে যা পয়সা ঘরে আসত, এখন চিংড়ির দৌলতে সেই আয় বাড়তে শুরু করেছে। অক্ষয়বাবুরা ভালই বোঝেন, নিজেরা এখানে থেকে যদি দেখাশোনা করতেন, আয়ের পরিধি অনেক বাড়াতে পারতেন। তবু ভাইদার মতো বিশ্বস্ত একজনকে পেয়েছেন ওরা। পয়সার ব্যাপারে লোকটার ওপর চোখ বুজে বিশ্বাস করা যায়। অনেকভাবে পরীক্ষা করে দেখেছেন অক্ষয়বাবুরা, না, লোকটা আর যাই করুক অক্ষয়বাবুদের ঠকিয়ে খাবে না। আগে কাঁচা পয়সা নিয়ে প্রায়ই ভাইদাকে কলকাতা ছুটতে হত, এখন আর তা প্রয়োজন হয় না। এখন অনেক লেখালিখি করে ইউ ব্যাঙ্কের লঞ্চ সার্ভিস হরিণচকের লঞ্চ ঘাট অবধি আনতে পেরেছেন। সপ্তাহে দু'দিন ব্যাঙ্কের লঞ্চ ঘাটে এসে দাঁড়ায়। পয়সা কড়ি যা জমা দেওয়ার ওখানেই দেওয়া হয় আজকাল। হরিণচকের মতো এমন একটা অজ গাঁয়ে ব্যাঙ্কের সার্ভিসও যে পাওয়া যাবে, কে ভাবতে পেরেছিল।

হরিণচকে আগে কাঁটাদারদের বাজারের নামগন্ধও ছিল না। সপ্তাহে দু'দিন করে অর্থাৎ শনি আর মঙ্গলে হাট বসত লঞ্চঘাটের কাছে। গাঁয়ের হাট যেমন হয়, তেমনই। সাত গাঁয়ের লোক এসে জমাট করে তোলে সেই হাট। এখনো হাটে রবরবা অবস্থাটা কমেনি।

বরং দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে। উপরি হয়েছে কাঁটাদারদের বাজার। হাটের কাছাকাছিই পুরনো দীঘির উলটো দিকে খানকয়েক ঝুপড়ি ঘর তৈরি করে নিয়েছে কাঁটাদাররা। অক্ষয়বাবুদের জলকর ছাড়াও নদী পেরিয়ে শিবতলা হয়ে হাঁসুয়ার দিকে গেলে আরো কিছু জলকর গড়ে উঠেছে। সেখান থেকে প্রতিদিন মাছ আসে কাঁটাদারদের আড়তে। বাজার বসে শেষ রাতের দিকে। ভোর হতে না হতেই বাজারের শেষ।

হরিণচকেই কাঁটাদারদের বাজার হওয়ার একটাই কারণ, এখান থেকে সড়কপথে লরি টেম্পো বোঝাই মাছ ছুটে যেতে পারে কলকাতার দিকে। নদী ডিঙোতে হয় না।

হ্যাঁ, পথেরও অনেক উন্নতি হয়েছে আজকাল। আগে ছিল কাঁচা রাস্তা। বর্ষায় সে রাস্তায় চলাচল করার উপায় থাকত না। এখন টনটনে পিচের পথ। অনায়াসে ভারি লরিও চলতে পারে। সার্ভিস বাসও হল বলে। সার্ভিস বাস যাতে আর একটা ভোটের আগেই তৈরি করে ফেলা যায়, তার জন্য প্রসন্নবাবুর তদ্বিরের খামতি নেই। বাস যে দিন প্রথম এসে হাজির হবে হরিণচকে, সেদিন ঝাণ্ডায় ঝাণ্ডায় মাতিয়ে তুলতে হবে হরিণচককে। ফিতে কাটার জন্য কোন মন্ত্রীকে এখানে আনারও স্বপ্ন দেখেন প্রসন্নবাবু। এই তো সুযোগ। এসব কাজের মধ্য দিয়েই তো এগোতে হয়। জনসংযোগ বাড়াতে হয়।

অবশ্য হরিণচকের এত উন্নতির মূলে যে অক্ষয়বাবুদের জলকর তাতে সন্দেহ নেই। জলকরের দৌলতেই কাঁটাদারদের বাজার। লরি-টেম্পোর যাতায়াত। আর সেই সঙ্গে বাজারের লাগোয়া একটা বরফ কল। জোতদার সুরেশ ডিঙাল জেনারেটর বসিয়েছেন বরফ তৈরির জন্য। জেনারেটরের শব্দে পাখপাখালি ভয়ে পালায়। তা পালাক, মাছ চাপা দেওয়া বরফের জোগান না হলেই বা চলে কি করে।

সুরেশবাবু হালে একটা সিনেমা হাউস বানিয়েছেন। লঞ্চঘাট থেকে বাঁ দিকে খানিকটা এগিয়ে গেলে ভেড়ির প্রায় গায়-গায় সিনেমা

হাউস। ইটের দেয়াল, উপরে টিনের চাল। দর্শকদের বসার জন্য হলের অর্ধেকটা চট বিছানো। পিছনে কয়েক সারি বেঞ্চ, তারপর চেয়ার। শো শুরুর আগে গাঁকগাঁক করে বাইরে মাইক বাজিয়ে জানান দেওয়া হয়, কি ছবি, কার কার অভিনয়, টিকিটের দাম কত। সিনেমা হাউসের চমৎকার একটা নামও রেখেছেন সুরেশবাবু, 'চন্দ্রমুখী'।

হরিণচকের মানুষজন এখন তাই সিনেমাও দেখে। ছিঁচ কাঁদুনে বর্ষায় কখনো-সখনো বন্ধ রাখতে হয় সিনেমা। বাদার এই মাটিতে বর্ষার দাপট বড় মারাত্মক।

তা সে কথা থাক। হরিণচকের মানুষ এই সামান্য কয়েকটা বছরে, হরিণচকটাকে কি ভাবেই না পালটে যেতে দেখল। ভালই তো, কাঁচা পয়সার মুখ দেখা আগে ছিল স্বপ্ন, এখন ঘরে ঘরে রেডিও বাজে। গ্রামের মানুষ গ্রাম্যতাকে কাটিয়ে শহুরে হয়ে উঠছে, ভাবতেও কেমন লাগে।

তবে হরিণচকের মানুষের অভিজ্ঞতায় সবচে বড় রকমের যা নাড়া দিয়েছে, তা হল লঞ্চঘাটের কাছে ওই ঝুপড়িগুলো। নদীর ঢালে কাছিমের পিঠের মতো একটু জমি, শত জোয়ারেও ওখানে জল ওঠার সম্ভাবনা থাকে না। তা ছাড়া বেওয়ারিশ জমি। হঠাৎ দেখা গেল, কোত্থেকে গুটি কয় সংসার পাতাকুটোর আড়ালে মাথা গোঁজার চেষ্টা করছে। আসলে এক দঙ্গল মেয়ে। দু' চারজন বয়স্ক, বাদবাকি সবই চঞ্চলা, চপলা। পাছা না দুলিয়ে হাঁটতে পারে না। চোখের চাহনিতে সারাক্ষণ শিকার ধরার কল। একবার একটু হেসেছ, কি মরেছ।

মেয়েগুলো কয়েক মাসের মধ্যেই দাপনার বেড়া আর খড়ের ছাউনি তুলে ফেলল। নষ্ট মেয়েদের নাকি দেবদ্বিজে অশেষ ভক্তি। একটা তুলসীমঞ্চও বসিয়ে ফেলল। সন্ধ্যায় কখনো-সখনো ওই সব ঘরের ভিতর হারমোনিয়াম বাজে, তবলা বাজে। টিমটিম করে কুপি জ্বলে।

ঘাটের নেয়ে মাঝিরা এপাশওপাশ তাকিয়ে টুক করে ঢুকে পড়তে শুরু করল ওইসব ঘরে। পশারটা ওদের ভালই চলতে লাগল।

কিন্তু হরিণচকের মানুষ এসব বরদাস্ত করে কি করে। গুজগুজ ফুসফুস কাণাঘুষা। মেয়েগুলোকে জড়িয়ে কত না কেচ্ছা, গেল গেল, পাড়ার উঠতি ছেলেগুলোর মাথা খাবে এবার।

বয়স্ক লোকে একটু একটু করে মুখ খুলতে শুরু করল, না না, এ সব চলতে পারে না। কোত্থেকে যে এই অনাসৃষ্টি ঢুকে বসল এখানে, বলো দেখি ?

মিনমিন না করে প্রসন্নবাবুকে ধর না। উনি পঞ্চায়েতের মেম্বার। ওরই তো এসব দেখার কথা।

প্রসন্নবাবুকে একদিন পাকড়াও করেছিল কয়েকজন মিলে। এই যে প্রসন্নবাবু, আপনিও কি চোখ বুজে থাকবেন ?

প্রসন্নবাবু হাঁ করে তাকিয়েছিলেন, কি ব্যাপার ?

কি ব্যাপার, চলুন না একবার দেখে আসবেন। সন্ধ্যার পরে লঞ্চঘাটের দিকে আর যাওয়ার উপায় নেই মশাই। ভেড়ির ওপর উঠে বাজপাখির মতো সব বসে থাকে। ওদের দিকে তাকালেও পাপ হয়।

তাকাবেন না। ওরা তো আর আমার আপনার জমিতে বসে নি যে ডাণ্ডা মেরে উঠিয়ে দেব।

যার জমিতেই বসুক, ওদের এভাবে বাড়তে দিলে গাঁয়ে বাস করতে পারবেন ? কিছু যদি না করেন, আমরা থানায় যাব।

যাবেন। আমি কি করব।

প্রসন্নবাবু আসলে মেয়েগুলোকে নিয়ে চট করে কোন ঝামেলায় পড়তে চান না। উনি ভালই বোঝেন, এখন যা অবস্থা, ঝুপড়িগুলো ভেঙেচুরে মেয়েগুলোকে তাড়িয়ে দিতে গেলে অন্য এক ঝামেলার মধ্যে জড়িয়ে পড়তে হবে। গায়ে ফুঁ লাগিয়ে সব কেটে পড়বে, মাঝখান থেকে ওরই হবে ঝামেলা। একেবারে গোড়ার দিকে যদি বাধা দেওয়া যেত, তাহলে আজকের মতো এত ঝুঁকি থাকত না। আজ দশ-বারোটা মেয়ে বই তো নয়, পেছনে মদত জোগাবারও লোক রয়ে গেছে প্রচুর। মামু গুণ্ডাদের কথাই এ সময় প্রথম চোখের ওপর ভেসে উঠেছিল প্রসন্নবাবুর।

মেয়েগুলোকে তোলার অনেক চেষ্টা-চরিত্রও হয়েছিল। কিন্তু মেয়েগুলোরও কোমরের জোর যে পলকা নয়, তা বেশ বোঝা গেল।

কানাঘুষা উঠল, থানায় কিছু করবে না। ওরা যদি চুরি ছ্যাঁচড়ামি করে, ধরে নিয়ে থানায় পোরা যেতে পারে। তার বেশি কিছুই করার নেই থানার।

আসলে বুঝলে না, মেয়েগুলোর কাছ থেকে পয়সা খায় থানার দারোগা। পয়সা বড় কিমতি চিজ হে!

প্রসন্নবাবুরও কি বখরা আছে?

থাকতেও পারে। নইলে অত দরদ বোঝ না!

প্রসন্নবাবুর উলটো পার্টির লোকেরা চালু করে দিল, প্রসন্নবাবু পয়সা খায় মেয়েগুলোর কাছ থেকে। সরকারি পয়সা মেরে আশ মিটছে না, বেশ্যামাগীদের পয়সার লোভও ছাড়তে পারছে না। থুঃ!

নাই কথা নিয়ে একটা ছোটখাট মাথা ফাটাফাটিও হয়ে গেল একদিন। বাজারে মাত-মাত চেহারা। পরে সে হাঙ্গামা মেটাতে শান্তিসভা ডাকতে হয়। মেয়েগুলো যাতে গাঁয়ের ভেতর আর ঢুকতে না পারে, সে ব্যাপারে ওদের কড়া করে শাসিয়েও দেওয়া হয়।

ঘটনাটা সামান্যই। দু' তিনটে ঝুপড়ির মেয়ে গাঁয়ে ঢুকে ছল্লিবল্লি শুরু করেছিল। গাঁয়ের সবাই থ। মাগো কি ছুরত?

পঞ্চাননের দাওয়ায় গিয়ে বসে পড়ল একটা, কি গো বাবু, মুখ লুকোলে কেন, কিছু বলো?

পঞ্চানন বাড়ি ছিল না। ওর ছেলে মাধব, ভাল গলায় বলল, এখানে মরতে এলে কেন? যাও যাও, ভাগো?

ও বাবা, কেমন করে কথা বলে গো। আমরা কি মানুষ নই? বেড়াল কুকুরকেও তো কেউ অমন করে কথা বলে না।

মাধবের মা খ্যাঁকখ্যাঁক করে উঠল, পারলে যেন বঁটি দিয়ে কুপিয়ে মারে।

কি হল, যাবি না? একটা লাঠি তুলে এগিয়ে এল মাধব।

আর তাইতে যেন ঘিয়ে আগুন। মেয়েগুলো এমন ভাব শুরু করে দিল যেন ওদের লাঠিপেটা করা হয়েছে।

লোক জমে গেল আরো। মেয়েগুলো ভিড়ের ভেতর দিয়ে কাঁদতে কাঁদতে ছুট। একেবারে বাজারে।

কি, কি, কি হয়েছে?

মামু গুণ্ডারা চায়ের দোকান থেকে বেরিয়ে এল। নারী নির্যাতন সইবে এমন মানুষ মামু নয়।

কি এমন অন্যায় করেছি আমরা। লাঠি দিয়ে মারল গো! আমরা হতে পারি নিচু জাতের মেয়ে, তাই বলে কি মানুষ নই?

মামু গুণ্ডারা ঘর থেকে মাধবকে বার করে লাগাল দু' চার ঘা। আর এর পরিণতি যা হতে পারে তাই হল। ঝপাঝপ ঝাঁপ পড়তে শুরু করল বাজারে। সারা হরিণচক হয়ে উঠল গরম।

অল্পের ওপর দিয়েই অবশ্য ব্যাপারটা সামাল দেওয়া গিয়েছিল। ক'দিন ধরে ঘটনাটার জের চললেও আর তেমন বড় কিছু ঘটে নি। তারপর কিছু দিন যেতেই আবার সব স্বাভাবিক।

হরিণচকের মানুষ আরো কত কি যে দেখবে কে জানে। কিন্তু এ কথার কি ভুল আছে, হরিণচকের জলকরটাই যত নষ্টের গোড়া। একশ বিঘার একটা জলকর কিন্তু চিংড়িমাছের দাপানি যেন সারা তল্লাটেই ছড়িয়ে পড়েছে।

পাঁচ

দেখতে দেখতে আর একটা রাত নেমে এল জলকরে। সন্ধ্যায় মাকাল মন্দিরের কাছে ধূপধুনো জ্বালিয়ে ফিরে এল বিনোদ। আজ রাতটাও ওকে টংয়ে থাকতে হবে। আর একটু রাত হলে এক পেট খেয়ে ও টংয়ে চলে যাবে।

কিন্তু ধূপধুনো জ্বালিয়ে যখন ফিরছে ঠিক সেই সময় শিবুর দেখা পাওয়া গেল। মুখটা থমথমে। কিছু একটা যেন ঘটেছে। কি

ঘটেছে জিজ্ঞেস করতে আর সাহস হয় না। হাঁ করে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল বিনোদ।

শিবুও কোন কেয়ার করল না ওকে। পাশ দিয়ে এগিয়ে চলে এল আলাঘরের উঠোনে। আর তক্ষুনি ভাইদা টানটান হয়ে দাঁড়াল, সারাদিন কোথায় কাটান হল বাবুর?

শিবু নির্বিকার।

ভাইদার মাথায় যেন রক্ত চড়ে এল, কেউ কিছু জিজ্ঞেস করলে তার উত্তর দিতে হয়, তাও শেখাতে হবে তোকে?

শিবু একটু দাঁড়ায়, কি উত্তর দেব? ম্যানেজারবাবুর ওখানে গিয়েছিলাম। তোমরা যা টাকা দাও তাতে আমার চলে না।

টাকা সবাই যা পায়, তুইও তা পাস। তোকে তো কম দেওয়া হয় না?

আমার ওতে হয় না। আমাকে জন খাটতেই হয়।

ঘরসংসার তো ছেড়ে দিয়েছিস, অত টাকা কোথায় খরচ করিস শুনি?

সে তোমাকে বলতে হবে নাকি?

শিবুর গলার স্বর অন্যরকম লাগে ভাইদার। প্রসন্নবাবুর আস্কারাতেই যে এমন হচ্ছে সন্দেহ নেই। বলল, নিজেকে যতই লুকোবার চেষ্টা করিস শিবু, আমরা সব জানি। কোন খবরই চাপা থাকে না, সবই আমাদের কানে আসে রে, শুনতে পাই।

কি শুনতে পাও? শিবু শক্ত হয়ে দাঁড়ায়।

রাতে তো টংয়ে থাকিস না। কোথায় গিয়ে রাত কাটাস, তা আমরা জানি না বলতে চাস?

টংয়ে থাকি না কে বললে?

বলাবলির কি আছে, বুকে হাত দিয়ে তুই বল না, টংয়ে থাকিস কি না?

শিবু বলল, রাতে একবার টংয়ে উঠে দেখে এলেই পার, থাকি কি না বুঝতে পারবে। তা ছাড়া সারা রাত যে টংয়েই থাকতে হবে এমন

কোন কথা নেই। পায়খানা পেচ্ছাব করার জন্যও তো নামতে হতে পারে।

ভাইদা বলল, ঠিক আছে হাতে-নাতেই একদিন ধরে তোকে দেখাব।

দেখিও। তাচ্ছিল্য দেখিয়ে নবাবের মতো আলাঘরে গিয়ে ঢুকে পড়ল শিবু।

বিনোদ হাঁ করে কথা শুনছিল, অল্পের ওপর দিয়েই যেন ব্যাপারটা মিটে গেল। কিন্তু মিটলেও চারপাশের হাওয়াটাই কেমন যেন পালটে গেল। সন্ধ্যার পর আলাঘরের উঠোনে রোজই জেলে জিমনিদের আড্ডা বসে, আজ সব কেমন যেন ভেস্তে গেল।

একা একাই খানিকক্ষণ নদীর ধারে ঘোরাঘুরি করে সময় কাটাল বিনোদ, তারপর একটু রাত বাড়তেই খাওয়াদাওয়া সেরে টংয়ে এসে উঠে বসল।

সামনেই বহুদূর পর্যন্ত ছড়ানো জল। ওদিকে হরিণচক গ্রামটা কেমন স্তব্ধ হয়ে রয়েছে। মিটমিট করে কোন কোন বাড়িতে আলো জ্বলছে। আশেপাশে দুটো-চারটে জোনাকি জ্বলতে দেখা যাচ্ছে। আকাশে অসংখ্য তারা ফুটেছে। কিন্তু বিনোদের যেন আজ কোন দিকেই মন নেই! কি জানি শেষ পর্যন্ত শিবুটা কি ভাবছে কে জানে। ভাইদার কাছে বিনোদই চুগলি করেছে ভাবলে তো গেছি। আসলে বিনোদ ভেবে দেখেছে ওর কপালটাই খারাপ। কোথাও বেশি দিন মানিয়ে টিকে থাকতে পারে না ও। না ঘরে না বাইরে। একটা না একটা গোলমাল ও করে ফেলবেই। এই আক্রাগণ্ডার দিনে জলকরের এই চাকরিটা যেন স্বর্গ পাওয়ার মতো ব্যাপার হয়েছিল। কিন্তু শিবু ম্যানেজারের লোক, ও যদি পেছনে লাগে, ক'দিন এখানে ও টিকে থাকতে পারবে কে জানে!

বাড়ির কথা মনে পড়ল। বাড়ি বলতে কোন রকমে একটা মাথা গোজার ঠাঁই। তাও কি এখানে! ভটভটিয়ায় তিন চার ঘণ্টার পথ, ঝিলখালি। সেখানে ও বউটাকে একা ফেলে রেখে এখানে চাকরি

করতে এসেছে। চাকরিতে আসার আগে বিনোদ বলেছিল, বুইলি পার্বতী, সরকারবাবুদের ধানকলে কাজের জন্য আর আমাদের হত্যে দিয়ে পড়ে থাকতে হবে না। মাসে মাসে সত্যি যদি এবার তিনশ' টাকা করে দেয় ওরা, তাহলেই আমাদের চলে যাবে, কি বলিস?

পার্বতী বলেছিল, ঘর না ছাইলে এবার কিন্তু আর থাকা যাবে না। হুটপাট করে টাকা নষ্ট করা চলবে না বলে রাখছি।

আরে নানা, মাস গেলেই এখানে এসে টাকা বুঝিয়ে দিয়ে যাব। যা যা করা দরকার এবার থেকে তোকেই করতে হবে।

দেখতে দেখতে মাস দেড়েক পার হয়ে গেছে, বিনোদের বাড়ি যাওয়া হয়ে ওঠে নি। যাব যাব করেও একটা না একটা ঝামেলায় যাওয়া হচ্ছে না। বিনোদ মনে মনে ঠিক করল, ভাইদার কাছ থেকে টাকাটা নিয়ে এবার ও বাড়ি যাবে। সকালে বেরিয়ে পরদিনই আবার ফিরে আসবে।

রাতে এই টংয়ে বসে কাটাতে কাটাতে মাঝে মাঝে ওর মনটা বেশ খারাপই হয়ে ওঠে। একটানা প্রায় এক কুড়ি বছর ও পার্বতীর সঙ্গে কাটিয়েছে, এখন ঘর ছাড়া। এই কুড়ি বছরের মধ্যে একটাও যদি বাচ্চা হত ওদের, বিয়ে করা জীবনটা তাহলে সার্থক হত। কথাটা ভাবতেই কেমন বিমর্ষ লাগে। কত লোকের কত বাচ্চা হয়, ওদের কিছু হতে পারে না! কেন হয় না! বউটা কি ওর বাজা! ঠিক বুঝতে পারে না বিনোদ। তাবিজ-কবজ-তো কম নেওয়া হল না কিন্তু ফুল ফোটে কই।

হ্যাঁ, একটা সন্তানের অভাবই যেন জীবনের বেশির ভাগটা ওর অন্ধকার করে রেখেছে। এ সব কথা কাকেই বা বলা যায়, কেই বা বুঝবে। বুকের দীর্ঘশ্বাসটা বুকের মধ্যেই পাক খেয়ে ওঠে ওর।

একটা বিড়ি ধরালো। তারপর ঘাড় ঘুরিয়ে শিবুর টংয়ের দিকে তাকাল। প্রায় শ' খানেক হাত দূরে শিবুর টং। গোমড়া মুখে কাউকে কিছু না বলে শিবু অনেক আগেই টংয়ে এসে উঠে বসেছে।

চুপি চুপি একবার ওর কাছে গেলে কেমন হয়। অন্তত কি ভাবছে ও বুঝে আসা যায়।

উশখুশ করে উঠল বিনোদ। তারপর বাঁশের সিঁড়ির ধাপে পা রেখে একবার আলাঘরের দিকে তাকাল, ঝাপসা ঝাপসা। কেমন নিস্তব্ধ হয়ে আছে সব। এতক্ষণে হয়তো ভাইদাও ঘুমিয়ে পড়েছে। ঘুমোক। তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে নেমে দু'একবার টর্চের ফোকাস মারল জলে। তারপর ফোকাস ঘুরিয়ে এনে শিবুর টংয়ে। কিন্তু শিবুর দিক থেকে কোন পালটা এল না। শিবু আজ টংয়ে আছে ঠিকই কিন্তু জেগে আছে তো! শিবু না পারে হেন কাজ নেই।

পা ফেলে ফেলে শিবুর টংয়ের কাছে এগিয়ে এল ও। ডাকল, শিবুদা একটা বিড়ি খাবে গো?

কে? এতক্ষণে টংয়ের ওপর থেকে পালটা ফোকাস পড়ল বিনোদের দিকে।

বিনোদ বলল, আমি শিবুদা, বিনোদ!

কী হয়েছে? আমি টংয়ে আছি কি নেই দেখতে এলি বুঝি?

না না শিবুদা তা নয়। ভাবছিলাম একসঙ্গে বসে একটু বিড়ি খেয়ে যাই। উঠব?

আয়। সিঁড়ির ওপর টর্চের ফোকাস রাখে শিবু।

বিনোদ ধীরে ধীরে ওপরে উঠে আসে। দু'জনের ভারে মাচাটা একটু যেন দুলেও ওঠে।

উপরে উঠে এক পাশে বসে পড়ে বিনোদ, ঘুমোচ্ছিলে নাকি গো শিবুদা?

টংয়ে কেউ ঘুমায় না, এটা ঘুমোবার জায়গা না। ঝাঁঝিয়েই উত্তর দেয় শিবু।

বিনোদ সরলভাবেই বলার চেষ্টা করে, মাঝে মাঝে চোখ জুড়ে আসে তো, তাই বললাম আর কি! যাক গে দেশলাইটা দাও, বিড়ি ধরাই।

দেশলাই বার করে শিবু। বিনোদ একটা বিড়ি এগিয়ে দিয়ে আর একটা নিজের ঠোঁটে চেপে ধরে।

কাল সারারাত কিন্তু তোমার সাড়া পাইনি গো। ক'বার এসে খুঁজে গেছি।

শিবু কেমন চোখ ছোট করে তাকায়, কেন ?

কাল শেষ রাতের দিকে বুইলে শিবুদা, একটা অদ্ভুত ব্যাপার হল।

কি ব্যাপার ? শিবুর গলায় কৌতূহল।

শিবুদা, কিছু যদি মনে না কর তালে বলি।

কি হয়েছে বল্ না ?

বিড়িটা নিভে গিয়েছিল, আবার ধরাতে হল। বিনোদ বলল, একটা মেয়ে গো। হঠাৎ দেখি একটা মেয়ে আমার টংয়ের সামনে এসে হাঁ করে দাঁইড়ে আছে। মেয়েটা যে মাছ চুরি করতে এয়েছে তাও মনে হল না। মাছ চুরি করবে তো দাঁইড়ে থাকবে কেন ?

কখন এস্ছিল ?

বিনোদ বলল, শেষ রাতের দিকে গো। আমার চোখটা একটু লেগে এইছিল, তাকিয়ে দেখি ওই কাণ্ড। তা আমি জিজ্ঞেস করলাম, কে ? কে তুমি ? কথায়বার্তায় বুঝলাম ও তোমারই খোঁজে এইছিল গো।

শিবু চুপ করে শুনল।

তা আমি বললাম, এত রাতে কি দরকার তোমার শিবুকে ? মেয়েটা বলে দরকারটা নাকি তোমারই সঙ্গে। বলল, হাসি এইছিল বলে দিও। হ্যাঁ শিবুদা, চেন নাকি মেয়েটাকে ?

চিনি। ছোট্ট করে উত্তর দেয় শিবু।

কে গো ? অত রাতে একা একা এই জলকরের বাঁধে এসে দাঁড়ায়, আমি ভাবতেই পারি না। তোমার নাম বলেছে বলেই আমি আর চেঁচামেচি করি নি।

আর কাকে বলেছিস কথাটা ? ভাইদা জানে ?

বিনোদ বলল, তুমি কি ভাব বলো তো। কাউকে বলিনি। কিন্তু মেয়েটা কে গো, একেবারে কচি বয়স !

মেয়েটা মেয়ে। চুপ করে যায় শিবু। তারপর কি ভেবে বলল, আমারই মেয়ে।

তোমার মেয়ে! আশ্চর্য, আগে বলবে তো। এই দেখ, কি ব্যাপার!

বলার কি আছে, সবাই জানে! মেয়েটাকে নিয়েই যত ঝামেলা আমার। সংসারে আমার একটা খিঁচই রয়ে গেছে।

তোমার দাদা ভরতের কাছে থাকে বুঝি?

আমার দাদা না, ও শালা আমার শত্রু।

তোমার দাদাকে কিন্তু খুব নরম মানুষ মনে হয়।

ভেতরে বিষ। মেয়েটাকে ও খেতে দেয়, তার জন্য টাকা দিতে হয় ওকে। মেয়েটার একটা বিয়ে দিতে পারলে আমি বেঁচে যেতাম।

বিনোদ তাকিয়ে থাকে শিবুর দিকে। শিবুর জন্য কেমন একটু খারাপও লাগে ওর। সত্যি সত্যি অত বড় একটা মেয়ে নিয়ে তাহলে বেশ সমস্যাতেই আছে ও।

বাড়িতে দাদার কাছে যাও না তুমি? মেয়ের সঙ্গে দেখা কর না?

তোকে তো আগেই বলেছি, দাদার সঙ্গে আমার সম্পর্ক নেই। একটু থেমে আবার বলতে লাগল, আগে যেতাম, এখন আর যাই না। ওদের মুখই আর দেখতে ইচ্ছে করে না। আসলে দাদার চেয়ে বউদিটা আরো খারাপ। যত রাজ্যের কূট-কচালি নিয়ে কেবল ঘোট পাকায়। যাক গে, ও সব থাক।

কাল তোমার মেয়ের হাবভাব দেখে মনে হল, কি যেন বলতে এইছিল গো! অনেক দিন বোধ হয় দেখা হয় না তোমার সঙ্গে?

এসব কথা আর আমার ভাল লাগে না বিনোদ; তুই থাম।

বিনোদ আবার চুপ করে যায়। শিবুই এবার দুটো বিড়ি বার করে। একটা বিনোদের দিকে এগিয়ে দেয়, নে খা।

বিড়ি ধরায় বিনোদ! আর ঠিক এই সময় টংয়ের ঠিক নিচেই একটা মাছ লাফিয়ে ওঠার শব্দ পেল ওরা। টর্চ তুলে জলের ওপর

একটু ফোকাস মারল বিনোদ। নিস্তরঙ্গ জলে হালকা চাঁদের আলো ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়ল না।

খানিকক্ষণ পর শিবুই হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, আমার নামে ভাইদার কাছে কে চুগলি করেছে বলতে পারিস ?

বিনোদের বুকটা ধড়াস্ করে ওঠে ; চুগলি !

সন্ধ্যায় যখন ফিরলাম, দেখলি না কেমন চিড়বিড় করে উঠল আমাকে দেখে।

বিনোদ একটু আমতা আমতা করে, না চুগলি তো কেউ করে নি, চুগলি করার কি আছে। ও তুমি সারাদিন ছিলে না বলেই হয়তো বলেছে।

একটুক্ষণ চুপ করে থাকে শিবু, বুঝেছি। ঠিক আছে তুই যা এবার, আমি ঘুমোব, ঘুম পাচ্ছে।

বিনোদ বোকার মতো তাকায়, টংয়ে ঘুমোন নিয়েই এত ঝামেলা, অথচ ঘুমোবার কথা বলতে বিন্দুমাত্র গলায় বাঁধে না শিবুর।

কি হল, ওঠ ! সারা দিন ম্যানেজারবাবুর বাগানে মাটি কুপিয়েছি, এখন না ঘুমুলে পারব না, ওঠ এবার।

বিনোদ বুঝতে পারে ওকে তাড়াতে চাইছে শিবু। তবে কি ওকেই সন্দেহ করল নাকি ! বলল, বিশ্বাস কর শিবুদা, ভাইদা কেন ওভাবে তোমার সঙ্গে কথা বলল আমি জানি না।

শিবু বলল, ঠিক আছে, আমি জেনে যাব, তুই যা এবার।

বিনোদের আর একটু বসতে ইচ্ছে করছিল, কিন্তু উপায় নেই। বলল, ঠিক আছে, যাই তাহলে।

ধীরে ধীরে টং থেকে নেমে আসে বিনোদ। নেমেই কেমন বোকা বোকা লাগে। চারপাশের নিস্তব্ধতার মধ্যে খানিকক্ষণ এদিক ওদিক তাকায়। আরো ওদিককার টংয়ে বলাই রয়েছে, নন্দ রয়েছে। ওরাও ঘুমুচ্ছে কিনা কে জানে। টং পাহারা দেবার নাম করে বেশ ঘুমুতে পারে এরা।

ধীরে ধীরে আবার নিজের টংয়ের কাছেই ফিরে আসে বিনোদ।

তারপর সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে আসে। উঠে একটু কাত হয়ে বসে পড়ে। পাদুটো টানটান করে ছড়িয়ে দিয়ে টর্চটা একপাশে রাখে। তারপর ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে জলের দিকে।

স্থির হয়ে আছে জলরাশি। জলের ভাঁজে ভাঁজে মাছেরা এখনো হয়তো খেলে বেড়াচ্ছে। মাছেদের কি ঘুম বলে কোন বস্তু নেই, কে জানে! বিনোদের কাছে সবই কেমন রহস্যময়। মনে পড়ল, জলকরে যখন ও কাজে লাগে তখন ওর ধারণা ছিল জলের চারপাশে বাঁধ দিয়ে মাছ ছাড়লেই বুঝি জলকর হয়। কিন্তু জলকরেরও যে কত নিয়মকানুন এ সব শিখল ও ধীরে ধীরে।

আবার একবার মুখ ঘুরিয়ে শিবুর টংয়ের দিকে তাকাল, সত্যি সত্যি কি ঘুমিয়েই পড়ল শিবুদা। কে জানে!

আরো কিছুক্ষণ কেটে গেল। কেবল শিবুর টংই না, সমস্ত চরাচর যেন ঘুমে অচৈতন্য। মাথাটা এবার একটু কাত করে এলিয়ে দিল ও। কেমন যেন ওরও ঘুমঘুম লাগছে। চোখ বুজল। তারপর বুঁদ হয়ে বসে রইল।

কতক্ষণ যে ওই ভাবে কাটল, খেয়াল নেই। হঠাৎ চমকে উঠে ও। শিবুর টংয়ের গোড়ায় কে ও! সমস্ত শরীরে যেন বিদ্যুৎ ঝলক। কিন্তু খপ করে টর্চটা হাতে তুলে নিয়েও জ্বালাল না। সেই মেয়েটা না! হ্যাঁ, শিবুরই মেয়ে, ঠিক চিনতে পেরেছে বিনোদ। তাহলে আজও এসেছে। ভারী অদ্ভুত লাগে বিনোদের।

কয়েক পলক যেতে না যেতেই শিবুকেও দেখা গেল টং থেকে নামছে। হ্যাঁ বাঁধের ওপর নেমে এসেছে শিবু। মেয়ে বাপে কি যেন কথা হচ্ছে এখন। বড় শুনতে ইচ্ছে করছে ওর। কিন্তু অসম্ভব। ও যে জেগে বসে ব্যাপারটা দেখছে কিছুতেই বুঝতে দেওয়া উচিত নয়।

পলক পড়ছে না বিনোদের। দেখল, হাসি এবার টংয়ে উঠতে শুরু করেছে। আর শিবুদা, ওকি, টং ছেড়ে কোথায় যাচ্ছে শিবুদা! বাঁধের ওপর দিয়ে আলার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে যে। মেয়েটাই কি তবে বাপের হয়ে টং পাহারা দেবে নাকি!

উত্তেজনায় আরো একটু ঘাড় ঝুঁকিয়ে বসে বিনোদ। আর এ সময় আরো অবাক হয় ও। আলাঘরের কাছে গইবাক্সটার স্লুইস গেট মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে শিবু। কি করবে ওখানে!

অবিশ্বাস্য ঘটনা। শিবুদা গইবাক্সের কাছেই ধীরে ধীরে জলে নামছে। জিয়োন মাছ রয়েছে ওখানটায়। তবে কি মাছ তুলবে! এই রাতে মাছ তুলে কি করবে শিবুদা! আশ্চর্য!

বিশ্বাসই করতে পারছে না বিনোদ, শিবুদা মাছ চুরি করতে পারে। মাছ চুরি করে তবে কি হাসিকে দেবে! দিতেও পারে। কিলোখানেক মাছ তুললেই তো অনেক টাকা। কাঁটাদারদের কাছে বিক্রি করলে নব্বই, একশ। অবশ্য বাজারে বসে বিক্রি করলে অত পাবে না।

সব কিছুই কেমন যেন গোলমেলে মনে হতে থাকে ওর।

হ্যাঁ, শিবুদা এবার উঠে আসছে। মাছ তুলেছে যে সন্দেহ নেই। এবার টংয়ের দিকেই এগোচ্ছে। খানিকটা দৌড়তে দৌড়তেই আসছে।

টংয়ের কাছাকাছি এসে থলি ভর্তি মাছ হাসির হাতে তুলে দিল শিবুদা। তারপর কয়েক মুহূর্তের ব্যাপার। মাছ নিয়ে হাসি নদীর ধারে এসে বাঁধে উঠল, ছুটতে শুরু করল।

কিন্তু ওদিকে কোথায় যাচ্ছে মেয়েটা। তবে কি কাঁটাদারদের কাছেই।

বিনোদ হাঁ করে তাকিয়েই থাকে। শিবু আবার টংয়ে উঠছে। যেন কিছুই হয় নি এমন ভাব শিবুদার। আশ্চর্য! নাটকটা নাটকই রয়ে গেল বিনোদের কাছে।

ছয়

নদীর দিকে তাকালেই মায়ের কথা মনে পড়ে যায় হাসির। নদী না রাক্ষুসী! টুক করে ওর মাকেই একদিন খেয়ে বসল। অথচ গাঁয়ের কত মেয়েই তো সারাদিন এই নদীতে নেমে মাছ ধরে।

তেকাঠি জাল নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দেয়। কই আর তো কারো এমন হয় না! সবই কপাল।

ঘটনাটা কেন জানি আজ আবার চোখের ওপর ভেসে উঠল। সেদিন হাসি আর হাসির মা খুব ভোরে জাল আর এলুমিনিয়মের হাঁড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিল ঘর থেকে। তা আজ থেকে প্রায় বছর খানেক আগের কথা। কেবল ওরা তুজনেই নয়, গাঁয়ের আরো তু-চারটি মেয়ে-বউ। চিংড়ির চারা তো আছেই। কিছু ভিন্ন জাতের টুকিটাকি মাছও যে না পাওয়া যায় এমন নয়।

ওরা মা মেয়েতে যখন জলকরের পাশ দিয়ে নদীর বাঁধের কাছে এসে দাঁড়াল, তখন ঝলমলে রোদ ছিল চারপাশে। দিনের প্রথম রোদের আদর খেতে শুরু করেছিল নদী। তখন জলকরের দিক থেকেও চোখ ফেরান যায় না। একশ' দেড়শ' হাত দূরে দূরে এক একটা টং। বাঁশের খুঁটির ওপর মাচা, তার ওপর ছই দিয়ে ঢাকা। ওর বাবা শিবুচরণ ওরকমই একটা টংয়ে রোজ রাত কাটায়। জলকর পাহারা দেয়। জলকরই যেন বাবার সব। বাড়ির কথা আর মনেই থাকে না।

যাই হোক, সেদিন মাছ ধরার জন্য বাঁধের ওপর থেকে তরতর করে ওরা নদীর ঢালে নেমে এসেছিল। ওদিকে ওদের পাড়ার পূর্ণিমারা বড় একটা কিছু ধরে ফেলেছিল বোধ হয়। উৎসাহে ছুটে গিয়েছিল হাসি, কি রে, কি?

মাছটা হাঁড়িতে ঢুকিয়ে দিতে দিতে পূর্ণিমা বলেছিল, ল্যাটা। তোদের এত দেরি হল?

—ওমা দেরি কোথায়! রোদ না উঠলে আসা যায়!

হাসির মা ততক্ষণে কোমরে কাপড় জড়িয়ে এক হাঁটু জলে নেমে পড়েছিল। কোমরের সঙ্গে গামছায় বাঁধা এলুমিনিয়ামের হাঁড়ি। হাঁড়িতে কিছু জল ভরে নেওয়া হয়েছে। তাতে ভাসাতে সুবিধা হয়, তাছাড়া ধরা মাছও জিইয়ে রাখা যায়।

হাসি এগিয়ে এল। তৈরি হয়ে নিয়ে জলে তেকাঠি ডুবিয়ে চোখ

বুজে একবার মাকাল ঠাকুরের নাম নিয়ে নিল। মাছ যেন পাই গো মাকাল ঠাকুর। তারপর কোমর জলে হাঁটতে শুরু করল সামনের দিকে।

মাটির ঘোলা মেশান নদীর জল, কত ময়লা, খড়ের গুছি, পাতা, কখনো মড়াফড়াও ভেসে যায় এই জলে। কিন্তু নদী কখনো অপবিত্র হয় না।

মাথার ওপর রোদ তাতিতে উঠছিল ধীরে ধীরে। পায়ের নিচে কখনো ধারালো শামুককুচি পড়ছে, কখনো বেয়াড়া সব কাঁটা। সাবধানে পা না ফেলে উপায় নেই। কিন্তু মাছের চারা তুলতে এসে পায়ের নিচে কি পড়ছে ভাবলে চলে না। গোটা পাঁচেক ভাঙনের বাচ্চা পেয়ে গিয়েছিল ওরা। আর তাইতে কি আনন্দ। কিন্তু ভাঙন ভেটকি ল্যাটা বা গুলে মাছের চেয়েও চিংড়ির চারার দিকেই ওদের নজরটা ছিল বেশি। চিংড়ির চারা আলায় নিয়ে ফেলতে পারলেই পয়সা।

মাঝে মাঝে হাসির মা সাবধান করে দিচ্ছিল হাসিকে, এই ধিঙ্গি, অত জলে যাচ্ছিস কেন! ধার দিয়ে চল না বাপু।

হাসি বোঝে, কেন এত সাবধান করা। নদীতে ডুবে মরার ভয়ে নয়। যারা সাঁতার জানে তারা ডুবে মরে না। আসলে ভয় অন্য জায়গায়। বাদার এ নদীর চরিত্র তো কারো না বোঝার নয়। জলের ভাঁজে কামট লুকিয়ে আছে কিনা কে বলবে। কামট যে মাঝে মাঝে না দেখা যায় এমন নয়।

হাসি বলেছিল, কামটে ধরলে হাঁটু জলেও ধরতে পারে মা।

আরো বেশ খানিকটা বেলা হয়েছিল। রোদের তাপটা যেন বেশ অনুভব করা যাচ্ছিল। হাসি উঠে দাঁড়িয়েছিল জল থেকে। পায়ের আঙুল, পাতা সব কেমন জলে জলে ফ্যাকাশে হয়ে উঠেছিল। এরকম পায়ের দিকে তাকাতে কেমন ঘেন্না ঘেন্না লাগে।

হাসি কাপড় নিংড়ে গায়ে জড়াল, ও মা, ওঠ না। আর কত?

হাসির মা উঠি উঠি করেও আরো কিছুক্ষণ কাটিয়ে দিল জলে।

মাছ ধরা তো কেবল পয়সার জন্যই নয়, নেশাও যে। যেন তেমনি এক আদিম নেশাতেই পড়ে গিয়েছিল ওর মা। আর সেই নেশারই শিকার হয়ে গেল শেষপর্যন্ত।

একটু অন্যমনস্ক ছিল হাসি। হঠাৎ পূর্ণিমার চিৎকারে চমকে উঠল। ব্যাপারটা যখন বুঝতে পারল, ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেছে। হাসি দেখল, জলের নিচে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে তলিয়ে যাচ্ছে ওর মা। হাঁটু জলে দাঁড়িয়ে ওভাবে তলিয়ে যাওয়ার কথা নয়। কিছু একটা যেন ওর পায়ের দিকে আঁকড়ে ধরে মাঝ নদীর দিকে টেনে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে।

হাসি চিৎকার করে জলের ধার অবধি এগিয়ে এল। পূর্ণিমারা চেঁচিয়ে উঠল, কামট, কামট।

কামট কি ! কথাটা কিছুতেই মাথায় ঢুকছিল না হাসির। চিৎকার করে কেঁদে উঠল, মা মা।

বাঁধের ওপর উঠে কিছুটা এগোলেই আলা। আলায় কেউ না কেউ থাকবেই। পূর্ণিমা ছুটে গিয়েছিল আলার দিকে, কামট গো কামট। হাসির মাকে কামটে নিয়ে গেল, কামটে নিয়ে গেল।

কামটে নিয়ে গেল ! আলা থেকে ছুটে বেরিয়েছিল কয়েকজন। কামটে নিয়ে গেল মানে ?

হাঁটু জলে দাঁড়িয়ে মাছ তুলছিল, হঠাৎ ডুবে গেল। কামট এসে পায়ের দিকে ধরে টেনে নিয়ে গেল।

প্রথম দিকে কারো বিশ্বাস হয়নি। কিন্তু যেভাবে মেয়েগুলো চেঁচাতে শুরু করেছে, অবিশ্বাসও করা যায় না। লাঠিসোটা নিয়ে ছুটে গেল কয়েকজন। খবর পেয়ে ছুটে এল হাসির বাবা, শিবুও।

নদীতে ভাটা। জল অনেক নিচ অবধি নেমে রয়েছে। ঢালের কাদায় লাফিয়ে লাফিয়ে ওরা একেবারে জলের ধারে এসে দাঁড়াল, কোথায় কামট ? নির্বিকার ঘোলা জলের স্রোত বয়ে যাচ্ছে নদী দিয়ে। এপার ওপার তো অনেকখানি ব্যাপার, এর মধ্যে কোথায় কামট, কোথায় হাসির মা !

শিবু পাগলের মতো হয়ে উঠেছিল। লাফিয়ে পড়েছিল জলে। বাদাবনের নদী, চোখে দেখা না গেলেও নোনা জলে কোথায় কি লুকিয়ে আছে কে বলতে পারে। শিবুকে টেনে তুলে আনা হয়েছিল। ততক্ষণে ভিড় জমতে শুরু করেছিল নদীর ধারে। নৌকো নামান হল তুটো, গুন ছোঁড়া হল, জাল টানা হল। কত কসরৎ, কত ধস্তাধস্তি নদীর সঙ্গে। কিন্তু হাসির মার সন্ধানই আর পাওয়া গেল না কোনদিন। দেখতে দেখতে একটা বছর প্রায় পার হয়ে গেল।

চোখতুটো জলে কেমন ভার হয়ে আসে হাসির। কপাল ছাড়া কি আর। সবই ওর কপাল। মাকে কামটে নিয়ে গেল। বাবা মতিচ্ছন্ন, একবার যদি একটু ওর দিকে তাকাবার সময় পায়। ওদিকে ওর বাবা আর বাড়িমুখো হয় না বলে ওর জেঠাজেঠিও যেন হাসিকে এখন বিদেয় করতে পারলে বাঁচে। সারাক্ষণ খিচিরখিচির লেগেই আছে। উঠতে বসতে শাপান্ত।

জেঠি বলে, মর না। তুই মরলে তোর বাবার হাড় জুড়োবে।

অন্য সময় হলে হাসি মুখের ওপর পালটা জবাব ছুঁড়ে দিতে পারত, কিন্তু এখন আর হয় না। এখন কেবল কান্না ছাড়া কিছুই সম্বল নেই ওর।

কালী কাঁটাদার যে অমনভাবে ওর সর্বনাশ করে বসবে কে ভেবেছিল।

কালী কাঁটাদারের সঙ্গে ওর পরিচয় মা মারা যাওয়ার মাস ছয়েক পরে। ওর বাবার মুখেই প্রথম ও কালী কাঁটাদারের নাম শোনে। মনে আছে, একদিন সন্ধ্যার কিছু আগে ও আলায় এসেছিল বাবার খোঁজ করতে।

কি রে হাসি! দূর থেকে হাসিকে দেখেই ছুটে এসেছিল শিবু। কোথায় যাচ্ছিস? কি হয়েছে?

বাড়িতে আর থাকা যাবে না বাবা! আমি আর ওখানে থাকব না। তুমি যদি আমাকে অন্য কোথাও না রাখ, একদিন দেখ, আমি গলায় দড়ি দেব।

হাসিকে টেনে এনে বাঁধের ধারে বসেছিল ওর বাবা। কি হয়েছে বলবি তো?

ঝরঝর করে কেঁদে ফেলেছিল হাসি। আমি নাকি বেজন্মা। ছ'বেলা নাকি ওদের ভাত গণ্ডেপিণ্ডে গিলি। ওদের অন্ন ধ্বংস করি। যা মুখে আসে বলে যায়।

কে বলে?

কে বলে বোঝ না? জেঠিমা। আমি আর ওখানে থাকব না। তুমি যদি আমার সঙ্গে থাক, তাহলে ওখানে ফিরব, না হলে আর ফিরবই না।

দূর পাগল। হাসির পিঠে হাত বুলিয়ে দিয়েছিল শিবু। আমি যদি তোর সঙ্গে ওখানে থাকি তাহলে তো রক্তারক্তি হবে। কোনদিন দা দিয়ে তোর জেঠির গায়ে কোপ বসিয়ে দেব, সেটা কি ভাল হবে?

তাহলে অন্য কোথাও থাকার জায়গা কর আমার।

ভালই বলছিস। বাড়ির অধিকারটা ছেড়ে দিই, সব যাক আমাদের।

হাসি একটুক্ষণ চুপ করে থাকে।

শিবু বলে, মাসে মাসে জেঠার হাতে তোর খাই-খরচটা দিয়ে দিবি এবার থেকে। তোর খাওয়ার খরচ হাতে পেলে আর কথা বলবে না, আমি সব বুঝি।

হাসি বলল, ঠিক আছে। তাই দাও। কিছু বলতে এলে এবার আমিও কিন্তু আর ছেড়ে কথা বলব না। জেঠি বলে আর সম্মান করব না।

শিবু একবার চারপাশ তাকিয়ে নেয়। সন্ধ্যার নিস্তব্ধতায় চারদিক যেন থমথম করছে। আবার হাসির দিকে তাকায় শিবু, আমার একটা কাজ করে দিতে পারবি মাঝে মাঝে? খুব গোপনে করতে হবে।

হাসির কেমন সন্দেহ জাগে, কি কাজ?

মাঝে মাঝে তোর হাতে কিছু বাগদা তুলে দেব, তুই চুপি চুপি কালী কাঁটাদারকে দিয়ে টাকা নিয়ে আসবি।

কালী কাঁটাদার। সে আবার কে ?

তোর সঙ্গে দেখা করিয়ে দেব। একা মানুষ। ওর বাপ মা থাকে ক্যানিংয়ের কাছে। ওখানেও ওদের মাছের ব্যবসা। বাপের সঙ্গে বনে না বলে কালী এখানে এসে ব্যবসা শুরু করেছে।

হাসি জিজ্ঞেস করে, বাগদা কোথায় পাব ?

আবার সস্নেহে হাসির পিঠে হাত রাখে শিবু, জলকর যখন তৈরি হয়েছে বাগদার অভাব !

চুরি করবে ?

সবাই করে, আমি করলে দোষ কি। তাছাড়া এটাকে চুরি বলে না, ভাইদা আমাদের ঠকাচ্ছে আমরাও ওকে ঠকাব।

চুপ করে শোনে হাসি।

শিবু বলল, সপ্তাহে একবার দু'বার যদি মালটা পাচার করে দিয়ে আসতে পারিস তাহলে তোর জেঠাজেঠির মুখে গোছা গোছা টাকা ছুঁড়ে মারতে পারবি। দেখবি আজ যারা তোকে বেজন্মা বলছে কালই তারা তোকে খাতির করবে।

যদি কেউ দেখে ফেলে ?

দেখবে কেন, মাঝ রাতে চুপিচুপি চলে আসবি। অত রাতে বাঁধের ওপর কেউ থাকে না। তাছাড়া তুই তো আমার কাছে আসবি, কেউ সন্দেহ করবে না। মাছগুলো নিয়ে কালীকে দিয়ে টাকা নিয়ে চলে আসবি, ব্যাস। টাকা নিয়ে আমাদের কথা।

হাসি ভয়ে ভয়ে মাথা নেড়েছিল, ঠিক আছে, আসব।

সেই থেকে কালী কাঁটাদারের সঙ্গে ওর পরিচয়। প্রথম দিকে ভয়ে ভয়ে কালী কাঁটাদারের দরজায় গিয়ে টোকা দিত হাসি। কোন-ক্রমে মাছগুলো দিয়ে পালিয়ে আসতে পারলেই যেন বাঁচে। কিন্তু ধীরে ধীরে এই কালীকেই কেমন যেন না দেখলে ওর খারাপ লাগতে লাগল।

ভারী মজাদার লোক এই কালী, কথায় কথায় হাসাতে পারে, হাসতেও পারে। কত মজার মজার সব গল্প বলতে পারে। একদিন

'সাপ সাপ' বলে পেছন থেকে এমন চেঁচিয়ে উঠেছিল যে, মাগো সে কথা ভাবতেও এখন কেমন যেন লাগে।

এই কালী কাঁটাদারকেই ও ভালবেসে ফেলল। শেষ পর্যন্ত হাসিও নিজের কথা বলতে শুরু করল কালীকে। ওর জেঠাজেঠির কথা, বাবার কথা, ওর মায়ের কথা। ওর জীবনটা যে কত অদ্ভুত ও বোঝাত কালীকে। তারপর মাছ না নিয়েও কত রাত যে ও এসে হাজির হত কালীর ডেরায় তার হিসেব নেই।

একদিন জিজ্ঞেস করল, কালীদা সত্যি করে বলো তো, তুমি আমায় ভালবাস ?

আই বাপ, তোর জন্য আমি জীবন অবধি দিতে পারি।

যাহ্, বাজে কথা।

হাসিকে আদরে আদরে ভরিয়ে দিত কালী।

শিবু জিজ্ঞেস করত, কি রে ঠিক মতো পয়সাকড়ি দেয় তো কালী। ছোঁড়া অবশ্য তোকে ঠকাবে বলে মনে হয় না।

হাসি কি উত্তর দেবে ভেবে পায় না। বাপের কাছেও কি সব কথা বলা যায়! বলতে পারেনি হাসি। যাকে ও জীবনের সঙ্গী হিসেবে বেছে নিয়েছে তার কথা বুঝি বাপ-মায়ের কাছেও বলা যায় না। তাছাড়া বাবাই তো চুরি করতে শিখিয়েছে ওকে। চুরি করবে না কেন হাসি। এ সংসারে কে না চুরি করে বেঁচে থাকে।

হাসির জীবনের সব কিছুই যেন অন্যরকম হয়ে উঠছিল। হাসি টের পাচ্ছিল এখন আর ওর সময় নষ্ট করার উপায় নেই। ওর দেহের ভিতরে এতদিনে যে ভালবাসার বীজ বপন করে দিয়েছে কালী সেই বীজ অঙ্কুরিত হয়ে চারায় রূপান্তরিত হয়ে ওঠার সময় এগিয়ে আসতে শুরু করেছে। প্রকৃতির নিয়মকে কে ঠেকিয়ে রাখতে পারে।

আজও বাবার কাছ থেকে মাছের থলি নিয়ে ছুটতে শুরু করল হাসি। ভেরির এক দিকে নদী, জোয়ারে টইটম্বুর হয়ে রয়েছে। অন্যদিকে ঝোপঝাড় জঙ্গল। বহু দূরে হরিণচকের দিক থেকে কুকুর চেঁচাচ্ছে।

দৌড়তে দৌড়তে হাঁফ ধরে গেলে একটু দাঁড়ায় ও। পিছন ফিরে তাকায়, না, জলকরকে আর দেখা যায় না, নিশ্চিন্তি। ধীরে ধীরে হাঁটতে শুরু করল আবার।

গত সপ্তাহেও দু'দিন এমনি রাতে মাছ নিয়ে ও হাজির হয়েছিল কালীর কাছে। কিন্তু লোকটা যেন কিছুই বুঝতে পারে না। হাসি যে অন্তসত্ত্বা এটা মুখ ফুটে না বললে যেন ও বুঝতেই পারবে না। নাহ্, আজ বলতেই হবে। আর ক' দিন এমন ভারী পেট নিয়ে ঘোরাঘুরি করা যাবে কে জানে!

সঙ্গে সঙ্গে নানান দুশ্চিন্তা এসে মাথায় ভর করে বসে ওর। কালী যদি অস্বীকার করে, যদি বিয়ে করতে না চায়, কি উপায় হবে ওর!

উত্তেজনা বেড়ে যায়। একটু পা চালিয়েই হাঁটে এবার। যা থাকে কপালে আজ বলেই ফেলব ওকে। অস্বীকার করলেই হল, না। হাসিও জানে কি ভাবে ওষুধ দিতে হয়।

কাঁটাদারদের বাজারটা এবার চোখে পড়ছে। এখনো ঝাঁপ খোলে নি কেউ। আর একটু রাত না কাটলে ঝাঁপ খুলবে না ও জানে। ফলে খানিকটা নিশ্চিন্ত মনেই বাঁধ থেকে তরতর করে নিচে নেমে চুপিচুপি এক সময় কালীর ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল। চারপাশে একবার ভয়ে ভয়ে চোখ বুলিয়ে নিয়ে দরজায় ঠুক ঠুক করে টোকা মারল।

খানিকক্ষণের মধ্যেই খুলে গেল দরজা। দেখল, হাসিমুখে দাঁড়িয়ে আছে কালী, ঘরের ভেতরে একটা হ্যারিকেন জ্বলছে। আলোটা হয়তো নিভু নিভু করে শুয়েছিল ও, দরজায় টোকা পড়তেই আবার তা বাড়িয়ে নিয়েছে।

আয়। তোর কথাই ভাবছিলাম।

কালী ওকে ঘরে ঢুকিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল।

ঘুমোও নি? হাসি জিজ্ঞেস করে।

ঘুমোবার উপায় আছে নাকি, এ রকম একটা সোনার চাঁদ মুখ না দেখলে ঘুমোন যায়!

ঘরের ভিতর একটা ক্যাম্প খাট; তাতে কাঁথা কম্বল বিছোন।

বালিশটা কেমন তেলচিটে হয়ে আছে। বিছানার একপাশে একটা ক্যাশবাক্স। ঘরে আসবাব বলতে আর কিছুই নেই। একটা জলের কুঁজো, গ্লাস, একটা বালতি আর মগ। দাপনার বেড়ায় কালীর কিছু জামা কাপড় গোঁজা।

মাছগুলো একপাশে রাখল হাসি। তারপর এগিয়ে গিয়ে খাটের পাশে পা ঝুলিয়ে বসল। আমার কথাই বুঝি ভাবছিলে কালীদা?

ভাবছিলাম বৈকি। ভাবছিলাম চোরাই মাছ তো রোজ বিক্রি করে পয়সা নিয়ে যাস, একদিন বিক্রি না করে রান্না করে কিছু খাওয়া না।

কবে খেতে চাও বল? হাসি প্রশ্ন করে তাকায়। খাট থেকে পা দোলাতে শুরু করে।

সেটা তো যে খাওয়াবে তার ভাবার কথা। তুই বল না কবে খাওয়াবি?

একটু ইতস্তত করে হাসি। আমি কি বলব, তোমার এখানে তো উনুন-টুনুন কিচ্ছু নেই।

আমি হোটেলে-খাওয়া লোক, উনুন দিয়ে কি করব! হাসে কালী।

তা'লে?

তা'লে কি, বাড়ি থেকে কোনদিন রান্না করে নিয়ে আয় না। আমি না হয় হোটেল থেকে ভাত এনে রাখব।

হাসি কেমন গম্ভীর হয়ে গেল, বেশ বললে যা হোক, আমাদের অবস্থা জান না? কত দিন তো বলেছি, আমি কিভাবে ঝাঁটালাথি খেয়ে জেঠাজেঠির কাছে থাকি!

কালী হাসে। একটু আদর করার জন্য এগিয়ে এসে হাত বাড়ায়, জানব না কেন সব জানি। তোর বাবাও আমাকে সব বলেছে।

হাসি ওর হাতটাকে সরিয়ে দিল, আহ্ ছাড়ো।

কেন, কি হয়েছে? না হয় পরে যখন সময় হবে, খাওয়াস।

আহ্ ছাড় না, আমার ভাল লাগে না।

সে কিরে! আরো কাছে এগোয় কালী, এই প্রথম তোর ভাল লাগে না শুনছি। কি ভাল লাগে না?

আমার শরীর ভাল না।

কেন, কি হয়েছে ?

কালীর হাতটা এবার ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেয় হাসি, ন্যাকা! কিচ্ছু বোঝে না।

কেমন আড়ষ্ট হয়ে যায় কালী, কি বুঝব ?

হাসি সরাসরি ওর চোখের দিকে তাকায়, তুমি বাবা হবে। কথাটা বলেই কেমন যেন গুটিয়ে যায় হাসি।

কি হব ? বোকার মতো তাকায় কালী।

হাসি চোখ সরায়, সব বুঝেও কেমন ন্যাকা হয়ে থাকে।

কালী একপাশে বসে পড়ে ওর, বাবা হচ্ছি মানে ?

বাবা বোঝ না। সত্যি সত্যি সত্যি, তিন সত্যি, তুমি বাবা হবে। আমার গায়ে যখন হাত রাখ, বুঝতে পার না ? বোকা নাকি!

কালী উঠে দাঁড়ায়, গলা দিয়ে যেন শব্দ বেরুচ্ছে না আর। বুকের ভেতর কেমন যেন কম্পন শুরু হয় ওর। হাত পা কেমন অবশ হয়ে আসতে থাকে।

কি হল, অমন করছ কেন ?

কালী হঠাৎ শক্ত হয়ে তাকায়, মাছের টাকাগুলো নিয়ে এখনই তুই চলে যা হাসি। কে কখন দেখে ফেলবে।

হাসিও উঠে দাঁড়ায়, কালীর দিকে এগোয়, দেখুক গে, আমি আর কোথাও যাব না। এ রকম অবস্থা নিয়ে কোথায় যাব বলো ?

মানে! কালীর চোখদুটো যেন জ্বলতে শুরু করে, ছোট্ট করে একটু ধাক্কা দেয় হাসিকে, পাগলামী করিস না, এখন যা।

যাব মানে! হাসিও রুখে ওঠে।

মাথার ওপর যেন আকাশ ভেঙে পড়েছে দু'জনেরই। পায়ের নিচে যেটুকু মাটি ছিল তা যেন আশ্চর্য এক মন্ত্রে উবে গেছে।

হাসি শব্দ করে কেঁদে উঠল, আমার সর্বনাশ করে এখন তাড়িয়ে দিচ্ছ! আমার কি হবে ?

এই এই, কালী বাধা দেয়, কাঁদে না, এই।

হাসি কান্না থামায়, মুখে আঁচল চেপে ধরে বলে, আমার কি হবে?

ঠিক আছে, এখন কাঁদিস না তো, কি ব্যবস্থা করা যায় আমাকে ভাবতে দে?

কি ব্যবস্থা?

আহা, একটু ভাবতে সময় দিবি তো? হঠাৎ এসে অমনভাবে কাঁদতে শুরু করলে আমিই বা কি করি।

তাকিয়ে থাকে হাসি।

তুই বাড়ি যা এখন, পরে আসিস, আমি ভেবে দেখি।

না, আমি যাব না, আমাকে বিয়ে করবে বল?

বিয়ে!

হ্যাঁ, বিয়ে করতে হবে আমাকে। তুমি ছাড়া আর কে আছে আমার।

খানিকক্ষণ চুপ করে থাকে কালী, ঠিক আছে তাই না হয় করব। কিন্তু বিয়ে বললেই তো আর হয়ে যায় না। আমাকে একবার ক্যানিং গিয়ে মায়ের মতটা তো নিতে হবে। মা কখনো আপত্তি করবে না, তবু তো—

কবে যাবে তাহলে?

আহ্, দু'চারটে দিন সময় দিবি তো। এখানে কত টাকা এদিক ওদিক ছড়িয়ে রয়েছে, সেগুলি একটু গুছিয়ে রেখে যেতে হবে না!

হাসি কিছুটা যেন আশ্বস্ত হয়।

কালী বলে, আয় খানিকটা তোকে এগিয়ে দিয়ে আসি।

ঘর থেকে সন্তর্পণে বেরিয়ে পড়ে দু'জন।

সাত

পঞ্চায়েতের সদস্য হওয়াটা কাকতালীয় ব্যাপার। ভাবতেও বেশ লাগে প্রসন্নবাবুর। বিধানসভার জন্য বলরামবাবুর হয়ে খাটাখাটি করে কৃতিত্ব দেখিয়ে পঞ্চায়েতের টিকিট পাওয়া। হাটেবাজারে গরম

গরম বক্তৃতা দিয়ে বেড়ান। বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোটারদের বোঝান, ভোটে জেতার জন্য কি না করতে হয়েছিল ওকে।

এখন ভাবতেও বেশ রোমাঞ্চ হয়, কানাইবাবুর মতো একজন জাঁদরেল প্রার্থীকে কিভাবে কুপোকাত করলেন উনি! ভোট যেদিন গণনা হবে সে-দিন কি উত্তেজনা! এক-একটি ভোট যেন এক-একটি বুকের পাঁজরা। ভোট গণনার শেষে আশ্চর্য রকমের এক অবসাদ। কিন্তু এই অবসাদ ছিল ক্ষণিকের। পরমুহূর্তেই সমর্থকদের হাতে নিজেকে সঁপে দিয়েছিলেন উনি। শারীরিক ধকল পুষিয়ে উঠতে বেশ কয়েক দিন সময় লেগেছিল ওঁর।

দেখতে দেখতে আজ বছর দেড়েক পার হয়ে গেছে। জনপ্রতিনিধিত্ব করার মজা এখন হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছেন। সারাক্ষণ বাড়ির দরজায় কেউ না কেউ থাকবেই। কত অভিযোগ, কত সুপারিশ, কত উপদেশ! সারাক্ষণ এত ব্যস্ততার মধ্যে কাটাতে হয় যে, নাওয়া-খাওয়ারও সময় পাওয়া যায় না। এর ওপর এখন বাড়তি বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে জলকর। সময় কোথায়, জলকরে কি হচ্ছে দেখে বেড়াবেন। অক্ষয়বাবুদের অনুরোধে কান না লাগালেই ভাল ছিল দেখছি।

ভোটে জেতার মাস খানেকের মধ্যেই অক্ষয়বাবুরা চেপে ধরেছিলেন ওকে, দয়া করে আমাদের যদি কিছুটা উপকার করেন?

অক্ষয়বাবু টাকাওয়ালা লোক, শিক্ষিত। এসব লোকের কথা চট করে ফেলা যায় না। প্রসন্নবাবু জিজ্ঞেস করেছিলেন, কি করতে হবে বলুন? আমার সাধ্যে থাকলে নিশ্চয়ই করব।

আমাদের জলকরের হাল তো দেখছেন?

কেন, ভালই তো চলছে।

চলছে, তবে একা ওই মুহুরির ওপর দেখাশোনার সব ভার ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্তে থাকা যায়? কাঁচা পয়সার ব্যাপার।

ভাইদা তো ভালই চালাচ্ছে।

তা চালাচ্ছে। তবু মনে হচ্ছে, মাথার ওপর একজন কেউ থাকা দরকার। একজন ভাল লোক যদি ম্যানেজার করে বসিয়ে দেওয়া যেত।

ম্যানেজার। প্রসন্নবাবু বললেন, তা একজন ম্যানেজার বসিয়ে দিলেই তো পারেন।

হেসেছিলেন অক্ষয়বাবু, ম্যানেজার মানে বুঝতে পারছেন, খুব বিশ্বস্ত লোক না হলে চলে কি করে। তাছাড়া আমরা চাইছি স্থানীয় কাউকে ম্যানেজার করতে। একজন লোক দেখে দিন না।

অনেক ভেবে দেখেছেন প্রসন্নবাবু। তেমন বিশ্বাসী লোক কে আছে যে অক্ষয়বাবুকে বলতে পারেন, একে নিন। যাও বা দু'-একজনের কথা মনে পড়ছিল, তারা এই জলকরের আলায় পড়ে থাকার লোক নয়।

প্রসন্নবাবু বললেন, ঠিক আছে ভেবে দেখছি, তেমন লোক যদি পাই, জানাব।

অক্ষয়বাবু লোক চড়িয়ে খান। কিভাবে টোপ গেঁথে মাছ তুলতে হয়, তা তাঁর জানা। বললেন, আমরা কিন্তু একজনকে বেছে রেখেছিলাম। যদি কিছু মনে না করেন তো বলি।

কাকে ? কৌতূহলী চোখে তাকান প্রসন্নবাবু।

আপনিই যদি একটু দেখাশোনা করতেন।

আমি ! জলকরের ম্যানেজার ! হাঁ হাঁ করে হেসে উঠেছিলেন প্রসন্নবাবু। পঞ্চায়েতের ঠেলা সামলাতেই তো হিমশিম খাচ্ছি। এর উপর আবার জলকর !

না মানে, শুধু ম্যানেজার হিসেবে নামটা আপনার ব্যবহার করতে চাই। কাজকম্ম যা করার ওই ভাইদাই করবে।

কি লাভ তাতে ?

মানে, মাথার ওপর আপনি থাকলে কেউ ট্যাঁ-ফুঁ করতে পারবে না। আপনি যখন সময় পাবেন একবার একটু ঘুরে আসবেন ওখান থেকে। আর ব্যাঙ্কের লঞ্চ এলে ঠিক মতো টাকা জমা পড়ে কিনা একটু দেখবেন। মানে, ওপরে একটু খবরদারি করা এই আর কি ! যা করার ভাইদাই করবে।

প্রসন্নবাবু বুঝতে পারছিলেন না কি করবেন। সত্যি সত্যি সময়ের

বড় অভাব। তার ওপর বাড়তি আর একটা বোঝা চাপান কি উচিত হবে!

কিন্তু অক্ষয়বাবু প্রায় নাছোড়বান্দা! আমরা মাসে মাসে আপনাকে পাঁচশ করে দিতে পারব।

টাকা! প্রসন্নবাবু হাসলেন, এমনিতেই মশাই টাকা-পয়সা নিয়ে যত রাজ্যের বদনাম ছড়াতে শুরু করেছে আমার নামে। তারপর জলকরে কোন কাজ না করে যদি মাসে মাসে পাঁচ শ' টাকা নিতে থাকি, কি অবস্থা হবে বুঝেছেন?

টাকা না হয় পার্টির নাম করেই নেবেন।

প্রসন্নবাবু খানিকক্ষণ গুম হয়ে রইলেন, ঠিক আছে ভেবে দেখি।

ভাবাভাবি নয়, আমরা কিন্তু নিশ্চিন্ত হয়ে যাচ্ছি।

হেসেছিলেন প্রসন্নবাবু।

ভোটে জেতাটা যেমন কাকতালীয় ব্যাপার, জলকরের ম্যানেজার হওয়াও অনেকটা সে রকমই। মাসে মাসে পাঁচ শ' টাকা আয় বেড়ে গেল। প্রথম দিকে ঘনঘন যাতায়াত শুরু করে ছিলেন আলায়। ভাইদা থেকে শুরু করে সবারই সুবিধা অসুবিধা বোঝার চেষ্টা করে-ছিলেন। পরে সময়ের অভাবে যাওয়া কমিয়ে এনেছিলেন। বুঝতে পেরেছিলেন, গেলেও যা, না গেলেও তা। অক্ষয়বাবুরা বিন্দুমাত্র মাথা ঘামান না ও সব নিয়ে। আসলে প্রসন্নবাবুকে ম্যানেজার করার পিছনে অক্ষয়বাবুদের উদ্দেশ্য ছিল ভিন্ন। জলকরের মধ্যে বেশ কিছু সরকারি গোলমেলে জমি আত্মসাৎ করে ঢুকিয়ে রাখা হয়েছে, সে ব্যাপারে কোন রকম যাতে উচ্চবাচ্য না হয় তারই প্রয়োজনে স্থানীয় পঞ্চায়েতকে ওদের প্রয়োজন। প্রসন্নবাবু যদি ভোটে না জিতে কানাইবাবু জিততেন, তাহলে অক্ষয়বাবুরা কানাইবাবুর দিকেই ঝুঁকতেন। আসলে পঞ্চায়েত সদস্যকেই দরকার অক্ষয়বাবুদের। ধুরন্ধর অক্ষয়বাবুদের চিনতে বেশি দিন সময় লাগে নি প্রসন্নবাবুর। জলকরের জমির দলিল-পরচা ঘাঁটাঘাটি করতেই সব রহস্য উনি ধরে ফেলেছিলেন।

জলকরের মোট জমি একশ একরের কিছু বেশি। এর মধ্যে অক্ষয়-

বাবুদের খাস জমি ষাট থেকে সত্তর ভাগ। বাকি সবটাই তো গোল-মেলে। তাছাড়া গ্রামের কয়েক জনের জমিও লিজ নেওয়া হয়েছে। আরো নেওয়ার ধান্দা রয়েছে।

প্রসন্নবাবু ম্যানেজারি হাতে পেয়ে প্রথম দিকে জমি বাড়াবার দিকে একটু নজর দিয়েছিলেন। কিন্তু শেষটায় পিছিয়ে আসেন। জলকরের লাগোয়া সাবির আলির জমি রয়েছে চার বিঘার মতো। এখনো হাল বলদ নিয়ে চাষ করে খায় সাবির। জমিটা জলকরের জন্য চাইলে কেঁদে-কেটে একশা করে ফেলে লোকটা, মরে যাব বাবু, একদম মরে যাব।

সাবির রাজি না থাকলে অবশ্য ও জমি গায়ের জোরে নেওয়া যায় না। কিন্তু গায়ের জোরে না নিলেও সাবিরকে ক্যাঁচাকলে ফেলে নেওয়া যেত। কোনক্রমে জলকরের বাঁধ ফাঁক করে নোনা জল একবার ওর জমিতে ঢুকিয়ে দিলেই কেল্লা ফতে হয়ে যেত। ধানী জমিতে নোনাজল ঢুকে পড়লে তিন চার বছর আর ফসল নেই। বাপ বাপ করে তখন পেটের দায়েই জমি লিজ দেওয়ার কথা ভাবত সাবির।

যাই হোক, প্রসন্নবাবু আশ্বাস দিয়েছিলেন সাবিরকে, আহ্ কান্না থামা ব্যাটা। তুই নিজে না দিলে ও জমিতে কেউ হাত দেবে না। যা পালা।

সাবির সেই থেকে প্রসন্নবাবুর লোক হয়ে গেল। কখনো-সখনো লাউটা মূলাটা নিয়ে প্রসন্নবাবুর বাড়ি গিয়ে হাজির হত। তারপর ধীরে ধীরে প্রসন্নবাবুদের পার্টি অফিসেও যেতে লাগল। প্রসন্নবাবুর পার্টির লোক হয়ে গেল সাবির।

প্রসন্নবাবুর মাথায় ঢুকল, গাঁয়ের দুটো-একটা ছেলেকে জলকরের কাজে লাগিয়ে দিতে পারলে কেমন হয়। গাঁয়ের বেকার ছেলেদেরই তো জলকরে প্রথম কাজ পাওয়ার কথা। অনেক দিন ধরেই মাথার মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছিল বিষয়টা। কিন্তু ভাইদা লোকটা বড় বেয়াড়া। ওর জন্যই সুযোগ করে নেওয়া যাচ্ছে না। ভোটের সময় ওর হয়ে যারা খাটাখাটি করেছে তাদের জন্য কিছু করতে না পারাটা অপরাধ। প্রসন্নবাবু ভেবে দেখেছেন, উদ্দেশ্য সিদ্ধি করতে হলে ভাইদাকে বাগে

আনতে না পারলে অসম্ভব। কিন্তু ভাইদার পেছনে রয়েছে কানাই-বাবুর মদত। ব্যাপারটা আরো পরিষ্কার হয়ে গেল, ভরতের জমি নিয়ে। ভরত চার বিঘে লিজ দিয়েছিল জলকরে। বছরে পাঁচ শ' টাকা করে বিঘা। চার বিঘের জন্য বছরে দু' হাজার টাকা করে ওর পাওনা। টাকাটা ওর হাতে বুঝিয়ে দিতেও কোন অসুবিধা ছিল না। কিন্তু ভোটের সময় কানাইবাবুর ডান হাত ছিল ভরত হালদার। দাপট কি! গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে মিটিং করেছে পাড়ায় পাড়ায়। প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছে প্রসন্নবাবুকে ভোট দিলে কত বড় ক্ষতি হয়ে যাবে হরিণচকের। তখন কি ভরত ভেবেছিল, এই জলকরেরই একদিন ম্যানেজার হবেন প্রসন্নবাবু।

ভরতের পাওনা টাকাটা নিজের ঘরে রেখে এখন ওকে নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাচ্ছেন প্রসন্নবাবু। ঘোরাবার যথেষ্ট সুযোগও এসে গিয়েছিল ওর হাতে। ভরত হালদারের ভাই শিবু। ভাইয়ে ভাইয়ে ওদের মুখ দেখাদেখি বন্ধ। সম্পত্তির দাবিদার ওরা দু'জনেই। জল-করের লিজের জমিটা তাহলে কার? ভরতেরই তো, না শিবুর।

প্রসঙ্গটা মাথার মধ্যে ঘুরপাক খেতে শুরু করে প্রসন্নবাবুর। শিবুকে হাতে রাখতে পারলে ভরতকে টাইট দিতে কতক্ষণ।

এসব কথা মাথায় রেখেই একদিন শিবুকে উনি ডেকে পাঠালেন, নিজের বাড়িতে। হ্যাঁরে, তুই তো ভরত হালদারের ভাই।

শিবু মাথা নেড়েছিল, হ্যাঁ আজ্ঞে!

তা শুনলাম, ভরত নাকি আমার সম্পর্কে কি সব বলে বেড়ায়?

ওর সঙ্গে আমার কথা হয় না বাবু। তবে কানাইবাবুর সঙ্গেই ওর পীড়িত, আমি জানি। আমি ওর সঙ্গে নেই।

কানাইবাবুর সঙ্গে পীড়িত! ভোটে হেরে গিয়ে কানাইবাবু বুঝি আবার মাথা তুলতে চাইছে! তা শেষপর্যন্ত ভরতও ওদিকেই পা দিল। বলে দিস ওকে, পচা শামুকে পা কাটে।

শিবু চুপ করে থাকে।

প্রসন্নবাবু আবার বললেন, তা তোরা সাবধান করে দিতে পারিস না?

বললাম তো, আমার সঙ্গে কথা হয় না। আমার বউ বেঁচে থাকতেই আমাদের হাঁড়ি আলাদা হয়ে গিয়েছিল। ওদের সঙ্গে মুখ দেখাদেখি বন্ধ।

কেন?

ও আমাদের বাপের সম্পত্তি একা খেতে চায়। আসলে দাদা যত না তার চেয়ে বেশি বৌদিটাই পায়ে পা বাঁধিয়ে ঝগড়া করে। বড় কুচুটে মেয়েছেলে বাবু। আগুন জ্বালিয়ে রেখেছে সংসারে।

তাই বুঝি, তা তোর মেয়ে তো ওদের সঙ্গেই থাকে।

হুঁ। উপায় নেই বলে থাকে।

মেয়ের তো বিয়ে দিতে হবে?

হুঁ।

হুঁ কিরে! রোজগার বাড়াবার চেষ্টা কর। জলকর থেকে যা পাস, তা তো খেয়েই উড়ে যায়। মেয়ের বিয়ের জন্য দু'চার পয়সা আর কবে জমাবি?

শিবু চুপ করে থাকে। জলকরের মাইনে ছাড়া আর কোথা থেকে ও টাকা রোজগার করবে বুঝতে পারে না।

ঠিক আছে, মাঝেমাঝে আমাদের বাড়িতে এসে কাজ করে যাস। এই ধর মাটি কুপিয়ে দিয়ে গেলি, পুকুর থেকে কিছু মাছ তুলে দিলি, কিংবা চাষের সময় তো কত কাজ। আমাকে তো জন লাগিয়েই করাতে হয়। এবার থেকে না হয় তোকে দিয়েও করাব। তুই তো দু'চার পয়সা পাবিই, আলায় না খেয়ে এখানেই ভাল মন্দ যা রান্না হয়, খেয়ে যেতে পারবি। কি রে শুনছিস তো?

শিবুরও ভালই হল। ছোট নৌকোর মানুষ ও। বড় গাছে দড়ি বাঁধল। সেই থেকে মাঝেমাঝেই প্রসন্নবাবুর বাড়ি গিয়ে জন খেটে আসে। প্রথম দিকে দিনের শেষে আগ বাড়িয়ে মজুরি বুঝিয়ে দিতেন প্রসন্নবাবু। কিন্তু পরে দু'চার দিন কাজ করার পর এক দিন হয়তো

সামান্য কিছু হাতে গুঁজে দিতেন। বলতেন, রোজ রোজ পয়সা নিয়ে গেলে তো উড়িয়ে দিবি। বরং আমার কাছেই জমা রাখ, তোর মেয়ের বিয়ে ঠিক হলে নিয়ে যাস।

শিবু কেমন গোলোকধাঁধায় পড়ে যায়। প্রসন্নবাবুর মনোভাবটা ঠিক বুঝে উঠতে পারে না ও। তবু অসদভাবও করতে চায় না। শত হোক গণ্যমান্য মানুষ। বিপদেআপদে আর কে দেখার আছে ওর।

কিন্তু যত দিন যায়, কেমন ছন্নছাড়া হয়ে যায় শিবু। কেমন পাগলাটে পাগলাটে। কারণে অকারণে মাথা গরম করে বসে। পরে তাও কেটে গেল। কেউ মুখের ওপর দু'চার ঘা জুতো মেরে গেলেও আর রা করে না। নিজের খেয়াল মতোই চলে। ম্যানেজার প্রসন্নবাবুর বাড়িতে যখনতখন গিয়ে হাজির হয়। কাজের কথা কেউ বলুক আর নাই বলুক, নিজেই আগ বাড়িয়ে কাজ খুঁজে নিয়ে লেগে পড়ে। মজুরি পেলে ভাল, না পেলেও যেন আর আক্ষেপ করে না।

প্রসন্নবাবু বোঝান, তুই তাহলে বাড়িতে থাকা ছেড়েই দিলি শিবু? কাজটা কি ভাল করছিস? দেখবি তোর সম্পত্তির অংশ ভরতই গিলে খাবে।

শিবু হাসে, নিকগে। সম্পত্তি দিয়ে আমি কি করব!

নিক গে কিরে গাধা। একটা সম্পত্তি, তা যে রকম সম্পত্তিই হোক না কেন, বানাতে কত মেহন্নত জানিস?

ও সম্পত্তি তো আমি বানাই নি, বাপ বানিয়েছিল।

বাপের সম্পত্তি বাপ কি সঙ্গে নিয়ে যায়, ও তো ছেলেরা ভোগ করবে বলেই বানানো।

তা হোক গে, বউটা যদি বেঁচে থাকত তাহলে এক কথা ছিল। এখন আর ও সম্পত্তি দিয়ে আমি ছাই করব।

বউটা না হয় গেছে, কিন্তু মেয়েটা?

শিবুর মুখটা কেমন একটু অন্যরকম হয়ে যায়। মুখ দিয়ে আর কথা বেরয় না।

প্রসন্নবাবু সস্নেহে ওর পিঠে একটা চাপর মারেন, বোকা, নিজের

কথাও ভাবতে শিখলি না, চিরকাল কেবল ঠকেই মরবি।

মুখে বললেন বটে, কিন্তু প্রসন্নবাবু যেন এরকমটাই চেয়েছিলেন। শিবুটাকে দিয়ে ভরতের বিরুদ্ধে মামলা না করানো পর্যন্ত যেন ওর স্বস্তি নেই। হেসেছিলেন, যা রে বোকা, হেঁসেলে গিয়ে দেখ পান্তা-টান্তা কি আছে, খেয়ে আয়।

শিবু গুটিগুটি পায় হেঁসেলের দিকেই এগিয়ে গিয়েছিল।

আট

দুপুরের খাওয়াদাওয়া সারতে বেলা প্রায় শেষ হয়ে গেল। রোজই এমন হয়। শ্রীহরির রান্না বসাতে বসাতেই প্রায় এগারোটা বেজে যায়। রান্না অবশ্য ভাত ডাল আর মাছ। আজ মাছও রাঁধে নি রেঁধেছে কাঁকড়া। রোজ রোজ মাছ চলে না, মুখ বদলাতে হয়। ভাইদার মন মেজাজ ভাল থাকলে মাংস হয় কখনো সখনো।

আজ রান্নাটা বেশ করেছিল শ্রীহরি। প্রায় ডবল ভাত খেল ভাইদা। তারপর খাওয়ার পরিশ্রমটা কাটাবার জন্য ঘরে ঢুকে ক্যাম্প খাটে শুয়ে পড়ল, ভাতঘুমটা মারাত্মক, একটু সময় ওর জন্য ব্যয় না করলেই নয়।

এক দুপুর পর্যন্ত আজ বাঁধের পশ্চিম দিকে মাটি ফেলার কাজ হয়েছে। বাঁধের ওপারে অর্থাৎ জলকরের আওতার বাইরে চাষের জমি-গুলোর কি করুণ অবস্থা। অথচ এসব জমিতেই আগে চোদ্দ থেকে ষোল মণ ধান উঠত, এখন ছ'সাত ওঠে কিনা সন্দেহ। এক ফসলা জমি, ধানই যদি না হয় জমি রেখে লাভ কি!

একটু ঘুম ঘুম মতোই এসেছিল, হঠাৎ বজ্র এসে খবর দিল, ভরত আসছে।

কে?

আজ্ঞে শিবুর দাদা ভরত হালদার। আলার দিকেই আসছে।

কেন? কি হয়েছে?

ব্রজ বলল, কেন আর। টাকা চাইতে বোধহয়। ওর টাকাগুলো তো তোমরা গিলে রেখেছ, আসতেই পারে।

ভাইদা বলল, হুঁ। তুই যা। আসতে দে।

জিমনি ব্রজলালের ভঙ্গিটা কেমন যেন বেয়াড়া ঠেকল ভাইদার। ভরত হালদারকে টাকা দেওয়া হল কি হল না তাতে ওর কি! কেউ কি তবে কুমন্ত্র দিচ্ছে ওদের কানে।

ক্যাম্পখাট থেকে একটু উঁচু হয়ে দরজার ফাঁক দিয়ে বাইরে তাকায় ভাইদা। দরজা থেকেই নদীর বাঁকটা চোখে পড়ে। হ্যাঁ, বাঁকের উপর দিয়ে কে একজন আসছে বলে মনে হয় ওর। আসুক, আবার শুয়ে পড়ে ভাইদা। মনে মনে তৈরি হয়, কিছু বলতে এলে প্রসন্নবাবুকে দেখিয়ে দেওয়া যাবে, এ ছাড়া আর উপায় নেই।

মিনিট পাঁচেক কেটে যাওয়ার পর সত্যি সত্যি ভরতেরই গলা।

ভাইদা আছ নাকি গো?

কে! ও ভরত, এসো এসো। কি ব্যাপার? এই অসময়ে?

ভরতের পরনে একটা ধুলোমাখা ধুতি, গায়ে কলার-ছেঁড়া একটা শার্ট।

একটু কথা ছিল যে?

কি কথা? এসো, ভেতরে এসো। ক্যাম্পখাটে উঠে বসে ভাইদা। সামনেই টুল এগিয়ে ধরে, বোস।

চোখে পড়ল, দরজার সামনে জেলে-জিমনিরা অনেকেই ভিড় করে এসে দাঁড়িয়ে পড়েছে। ভরত একবার ওদের দিকে তাকাল, তোরা সামনে এসে ভিড় করে দাঁড়ালি কেন, ওদিকে যা। কথা বলতে দে।

একটু গুঞ্জরণ উঠল, একে একে সবাই মুখ চাওয়াচাইয়ী করে সরেও গেল। ভাইদা শুধাল, কি ব্যাপার? কি কথা?

কথা তো অনেক ছিল, কিন্তু কেবল কথাই সার হচ্ছে, কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না। ভরতের গলায় কেমন একটা হতাশা।

ভাইদা বুঝল, টাকা চাইতেই এসেছে ভরত। গত বারের দু'হাজার,

এবারের দু'হাজার। এর মধ্যে অন্তত হাজার খানেকও যদি দেওয়া যেত, ঠেকানো হত।

তুমি কি টাকার কথাই বলতে এসেছ?

টাকা তো বটেই। আরও কথা আছে।

কি?

আমার গুণধর ভাই শিবুকে দেখছি না?

ম্যানেজারবাবুর বাড়িতে হয়তো জন খাটতে গেছে। কেন, দরকার আছে কিছু?

শুনছি ও নাকি আজকাল রাতে আলায় থাকে না?

কে বললে? ও তো টং পাহারা দেয়। আলাতেই থাকে।

সারা রাত টং পাহারা দেয়! আবার সারাদিন জন খাটে, একটা মানুষের পক্ষে এও সম্ভব নাকি গো ভাইদা?

ভাইদা চুপ করে যায়। শিবু সম্পর্কে ভরত এত আগ্রহ দেখায় যে, কারণ কি! অথচ দু'জনে তো মুখ দেখাদেখি বন্ধ।

তুমি কি জানো ভাইদা, রাতে সত্যি সত্যি ও টং পাহারা দেয়?

পাহারা না দিয়ে ও থাকবে কোথায়! সারা রাত তো আর ঘুরে ঘুরে কাটাতে পারে না।

ও লঞ্চঘাটের মাগীদের কাছে গিয়ে রাত কাটায় সে খবর জানো?

ভাইদা কেমন যেন চমকে ওঠে। অসম্ভব। ভরত নিশ্চয়ই এটা রাগ থেকে বলছে। যতভাবে শিবুর নামে অপবাদ ছড়ান যায়, তারই কায়দা এটা।

ভাইদা বলল, শিবুকে আমি ভালই চিনি ভরত। বউটা মরে যাওয়ার পর ও একটু পাগলামি করে ঠিকই, কিন্তু লঞ্চঘাটে গিয়ে রাত কাটাবে না।

রাতে গিয়ে একবার খোঁজ নিও না, তাহলেই জানতে পারবে।

ভাইদা গম্ভীর হয়ে যায়। শিবু লঞ্চঘাটে গিয়ে রাত কাটাক, কি না কাটাক, ওর কিছু যায় আসে না! কিন্তু জলকরের নাম-বদনামের প্রশ্নটা আসে বলেই যা একটু অসুবিধা।

ওর চরিত্র তুমি কি বুঝবে ভাইদা। ও আমার ভাই, এক মায়ের পেটে জন্মেছি আমরা। জন্ম থেকেই আমি ওকে দেখে আসছি।

ভাইদা বলল, আসলে চোখের সামনে লঞ্চঘাটে মেয়েগুলোকে ওভাবে বসতে দেওয়াটাই উচিত হয় নি। ওটা বাধা দেওয়া উচিত ছিল তোমাদের।

কে বাধা দেবে! এদিকে এই বাদায় কি কোন মানুষ থাকে। সে যাক গে, যে কথা বলতে এসেছিলাম। শিবুকে আমার খুব জরুরি একটা কথা বলার আছে। ভাবলাম এখানে এলে দেখা পাব।

এমন কি কথা? আমাকে বলে যেতে পার, আমি বলে দেব।

তোমাকে। না। ওকেই বলতে হবে। সংসারে আমার কি অশান্তি যে বাঁধিয়ে রেখেছে, তা আর বলার নয়।

এটা ওদের পারিবারিক ব্যাপার। ভাইদার পক্ষে সেখানে নাক গলানো উচিত নয়। চুপ করে থাকে ভাইদা।

হতচ্ছাড়াটার একটা মেয়ে আছে জানো তো?

জানি।

মেয়েটার কোন খোঁজ-খবরও ও নেয় না। ওটা মরে গেল কি বেঁচে রইল একবার দেখতেও আসে না। কিরকম বাপ ভাবো।

ও তো তোমার কাছেই থাকে। তুমিই দেখাশোনা কর, তাই হয়তো আর মাথা ঘামায় না।

কেন, আমি দেখাশোনা করব কেন! আমার কি দায় পড়েছে? এক পয়সা দেয় আমাকে? দাঁতমুখ খিঁচিয়ে ওঠে ভরত। কেমন একটা বিরক্তি ঝরে পড়ে গলায়।

টাকাপয়সা চাইলেই তো পার।

আমার দায় পড়েছে চাইবার। তোর মেয়ে, তুই নিয়ে যা। তোর পাপের ফল তুই ভোগ করগে যা। আমার যথেষ্ট হয়েছে। আমি আর ওসবের মধ্যে নেই। আমার কি, বলো?

এসব কথার পর আর কথা চলে না। ভাইদা তাকিয়ে থাকে।

ভরত আর একটু ঝুঁকে পড়ে, আর মেয়েটাও যদি সে রকম হত,

কিছু বলার ছিল না। মানুষ কত গরিব-দুঃখীকেও তো খাওয়ায়।

কেন, কি করেছে ?

ভরত এবার এদিক-ওদিক তাকায়। দরজাটা ফাঁকা, কেউ নেই। তবু কথাটা বলতে গিয়েও বলতে পারল না। না থাক, ওসব থাক। ও সব না শোনাই ভাল।

শোনার জন্য কেমন অস্বস্তি হয় ভাইদার। শিবুর মেয়ে কি এমন করতে পারে! কি সেই গোপন কথা!

আমাকে বললে অবশ্য তা বাইরে বেরুবে না। আমি সে ধাতের মানুষই নই।

না থাক। আমার মুখ দিয়ে শোনার দরকার নেই, শোনার হলে এমনিই শুনবে।

কেমন হতাশ হয় ভাইদা। একটা মুখরোচক কিছু যেন হাতের মুঠোয় তুলেও খাওয়া হল না।

ভরত বলল, যাক গে, আমার টাকাটার ব্যাপার কি করলে ? মাত্র তো ওই কটা টাকা, তাও যদি তোমরা না দাও, আমার চলে কি করে ?

ভাইদা খাটের ওপর একটু নড়ে চড়ে বসল, তুমি আমার খাতা দেখবে ভরত, গতবারের টাকাটা কিন্তু আমি ম্যানেজারবাবুকে সেই কবে দিয়েছি, ও যদি তোমাকে না দেয়।

এটা একটা কথা হল, তুমি আদায় করে দাও। তুমিই তো বলেছিলে কলকাতায় গিয়ে বাবুদের সঙ্গে কথা বলবে।

আমি কি আর বলি নি, বলেছি।

তা হলে ?

অক্ষয়বাবু ওকে একটা চিঠিও দিয়েছেন।

তারপর ?

দেখি, ম্যানেজারবাবুর সঙ্গে দেখা হলে আমি আবার বলব। আর কি করতে পারি!

ওসব পারিটারি না। টাকাটা তাড়াতাড়ি আদায় করে না দিলে

আমিও জানি কি করে আদায় করতে হয়। চাইছিলাম কোন ঝামেলা না করতে, কিন্তু—

ভাইদার চুপ করে থাকা ছাড়া উপায় নেই। পাওনা টাকা তো ও চাইতেই পারে।

গতবারের টাকা না হয় ম্যানেজারবাবুর কাছে আছে, কিন্তু এবারের টাকা ?

এবারের টাকাটা আর ম্যানেজারবাবুর হাতে দেব না, তোমার হাতেই তুলে দেব। অক্ষয়বাবু একবার এই জলকরে আসবেন, তারপরই দেব।

কবে ?

বলেছেন তো আসবেন। আসা দরকারও হয়ে পড়েছে ওর। এ মাসেই আসতে পারেন কিংবা আগামী মাসে। আপাতত ভরতকে ঠাণ্ডা রাখার জন্যই যেন কথাগুলি বলে ভাইদা।

ভরত একটুক্ষণ চুপ করে থাকে, ঠিক আছে, আরো এক মাস আমি অপেক্ষা করব। তারপর কিন্তু একটা হেস্তনেস্ত হবে, এটা মনে রেখো।

হেস্তনেস্ত বলতে যে কি, ঠিক ধরতে পারে না ভাইদা। জিজ্ঞেস করতেও আর সাহস হয় না। বাদা অঞ্চলের এই মানুষগুলির মাথায় কখন কি ঘোরে কে বলবে? কোর্ট-কাছারি যদি করে, মালিকরা বুঝবে। কিন্তু লাঠিসোটা নিয়ে যদি দাঙ্গা করতে আসে, তাহলেই মরণ।

ভাইদা বলল, আসলে কি জান ভরত, দাঙ্গাহাঙ্গামা করলে দু'চারটে লোকের মাথাই ফাটে আর কি হয়।

তেমন অবস্থা দাঁড়ালে মাথাই ফাটবে। টাকা বেরয় কিনা দেখব।

ভরতের চোখমুখ কেমন হিংস্র মনে হয় ভাইদার। একটু ঠাণ্ডা করার জন্য বলল, কেন যে ওসব ভাবছ বুঝি না। অক্ষয়বাবু আসুন না, টাকা তুমি ঠিকই পেয়ে যাবে।

ভরত বলল, কিন্তু আমি যা শুনেছি, তাতে টাকা না দেওয়াই তোমাদের মতলব।

কি রকম? কেমন অবাক হয় ভাইদা।

শুনছি, শিবুকে দিয়ে নাকি আমার নামে মামলা করাবে তোমরা?

মামলা! শিবুকে দিয়ে! কিসের মামলা?

না শুনলে কি আমি বলি! জলকরে লিজ দেওয়া আমার জমিটা নাকি শিবুর প্রাপ্য, ও জমিতে নাকি আমার কোন অধিকার নেই?

এসব তুমি কি বলছ ভরত! বিশ্বাস কর, আমি কিন্তু কিছুই জানি না। কে তোমায় কি বলেছে তারাই জানে।

প্রসন্নবাবুই তো ওর মাথায় বুদ্ধি দিয়েছে, তোর বাপের জমির অংশ তুই বুঝে নে, আর যাই করিস জলকরের জমিটার অধিকার ছাড়িস না। বছরে দু'হাজার টাকা তুই ছাড়বি কেন।

প্রসন্নবাবু কি বলছে না বলছে আমি কি করে বলি! বিশ্বাস কর ভরত, মাকাল ঠাকুরের নামে বলছি, আমি কিন্তু কিচ্ছু শুনি নি। গতকালও প্রসন্নবাবু এসেছিল, আমায় কিচ্ছু বলেনি। আমার কিন্তু ওসব বিশ্বাস হয় না!

অথচ জলকরে শিবু রাতে থাকে না, জলকরের কোন কাজে ওকে তুমি লাগাও না। দিনরাত তোমাদের ম্যানেজারের হয়ে ও কাজ করবে, আর জলকর থেকে তুমি ওকে মাসের শেষে গুণে গুণে টাকা দেবে।

তা অবশ্য বলতে পার, এটা আমার অন্যায়। কিন্তু কি করি বল দেখি, আমিও তো চাকরি করি এখানে। আজ যদি শিবুকে ম্যানেজার-বাবুর বাড়িতে যাওয়া বন্ধ করে দেই, কালই লাঠালাঠি হবে। ম্যানেজারবাবু আমার পেছনে লাগবে।

ভরত একটু ঝুঁকে এল, লাগাও না। আমরা গাঁয়ের সব লোক তোমার পেছনে থাকব। পঞ্চায়েতের সদস্য বলে কি মাথা কিনে নিয়েছে নাকি! কতবড় নেতা হয়েছে আমরাও দেখতে জানি। তা ছাড়া আর একটা কথা জেন, তোমাকে সাহায্য করার জন্য কানাইবাবুও তৈরি। আমার সঙ্গে কথা হয়েছে।

ভাইদা চুপ করে থাকে।

ভরত বলল, পঞ্চায়েতের টাকায় নিজের আখের যে গোছাচ্ছে তা কি আমরা জানি না নাকি। টেস্ট রিলিফের অর্ধেক টাকার কোন হিসেব দিতে পারে নি জানো?

ম্যানেজার প্রসন্নবাবুর বিরুদ্ধে এ ধরনের অভিযোগ শুনতে খারাপ লাগে না ভাইদার। মনে মনে বেশ উৎসাহ পায়। কিন্তু মুখ ফুটে এর সমর্থন জানানোটা যে উচিত হবে না সেটাও বেশ ভালই বোঝে।

গাঁয়ের লোক কি রকম ওর ওপর ক্ষেপে আছে জানো?

ভাইদা তাকিয়েই থাকে।

সেদিন হাটখোলায় বিন্দার মা ওকে কি গালাগালি! গায়ের চামড়া থাকলে তো!

প্রসঙ্গটা ভাইদার জানা নেই। জিজ্ঞাসা করল কেন, কি হয়েছিল?

বিন্দার মা বন্ধকি ব্যবসা করে জানো নিশ্চয়ই? বলে কি না এ ব্যবসা গোটাতে হবে। বিন্দার মা বলে, বেশ তো গোটাব। কিন্তু আমাকে রোজগারের একটা পথ বলে দে। ও সব পথ বলাবলি নয়, সুদের কারবার কিছুতেই চলতে দেওয়া হবে না এখানে। ফের যদি কখনো শুনি— আর যায় কোথায়, বিন্দার মায়ের সে কি গালাগালি, খেতে দিবি না বেটা, কিল মারার গোঁসাই। পঞ্চায়েতগিরি ফোটাচ্ছিস, না? তোর জন্ম দেখেছি রে গু' খাকির বেটা, আরো কত কি!

ভাইদা বলল লোকটা সবাইকে চটাচ্ছে।

পাখা গজাচ্ছে নইলে আমার টাকাটা গিলে রাখে। ওর পেট চিরে আমি টাকা বার করব দেখ না। ভেবেছে কি!

দু'জনেই কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে।

একটু পরে ভরতই আবার কথা বলে, শিবুকে দিয়ে মামলা করাবে! দেখি কোন আঁটি ছেঁড়ে আমার। বুঝলে ভাইদা, শিবুকে তাই একটু দরকার ছিল। ওর মুখ থেকে আমি শুনতে চাই, ও মামলা করতে চায় কিনা।

ভাইদা হঠাৎ আবার প্রশ্ন করে, কিন্তু ওর মেয়েটা কি করেছে তা কিন্তু বললে না। আর কিছু না, আমার জানা থাকলে, সেইভাবে আমি ওর সঙ্গে ব্যবহার করতাম।

ভরত চোখে চোখে তাকাল ভাইদার, সে এক কেচ্ছা। বলতেও ঘেন্না হয়।

কি, বল না ?

যদি আর কাউকে না বল তো বলতে পারি।

আমার পেট থেকে কথা বেরয় না ভরত। তুমি নিশ্চিন্তে বলতে পার।

ভরত চাপা গলায় বলল, পেট বাঁধিয়ে বসেছে। কি কেলেঙ্কারি বল দেখি। ওইটুকু মেয়ে দিনরাত কোথায় কোথায় ঘোরে, কার সঙ্গে কি ফস্টিনস্টি করে। এখন সংসারের মুখে কালি লেপে দিল গো। মুখ দেখাবার জায়গা নেই আমাদের, ছিঃ ছিঃ—

ভাইদা কেমন বোকা হয়ে যায়। অবিবাহিত মেয়ে অন্তসত্ত্বা ! এর চেয়ে বড় বিস্ময়ের আর কি হতে পারে পৃথিবীতে ! কিন্তু বিষয়টা এমনই গুরুতর যে কথা বাড়াতেও আর সাহস হয় না।

ভরতই বিড়বিড় করতে থাকে, মেয়েটা দিনে দিনে ধিঙ্গি হয়ে উঠেছে, বাপ হয়ে কোথায় তুই ওর বিয়ে দেবার চেষ্টা করবি, তা না নিজেই লঞ্চঘাটে গিয়ে পড়ে থাকিস ! ওটা কি মানুষ ! তুমি বলো ভাইদা, কে সহ্য করতে পারে এ সব ?

ভাইদা আর কি বলবে ! চুপ করে থাকা ছাড়া উপায় নেই ওর।

ভরত বলল, ব্যাপারটা কিন্তু এখনো জানাজানি হয় নি। তুমি আবার বলতে যেও না কাউকে।

না না, কাকে বলব ! কাউকে বলব না।

শিবুকেও বলার দরকার নেই তোমার, যা বলার আমিই বলব। বুঝলে ?

ভাইদা মাথা নাড়ে, বুঝেছে।

নয়

দেখতে দেখতে আরো দিন পনের কেটে গেল। আজ রোববার। জলকরে ছুটির দিন বলে কিছুই নেই। তবু রোববারটা কিছু ঢিলে থাকে সব ব্যাপারে। ভাইদা-ই কিছু ঢিলে দেন সবাইকে। নেহাত প্রয়োজনীয় কিছু করার না থাকলে আর দরকার নেই।

রোববার বলেই আজ বলাইকে দিয়ে একটা খাসি আনান হল, খাসি কাটার ব্যাপারে মধুর জুড়ি নেই। ঝটপট মাংস কেটে, চামড়াটা ভাল করে ধুয়ে মুন জল লাগিয়ে একপাশে ঝুলিয়ে রাখা হল।

মাংস রান্না হচ্ছে বলে ভাইদা-ই সতীশ কাঁটাদারকে খাবার কথা বলে পাঠিয়েছিল। সতীশের সঙ্গেই এ জলকরের মূল ব্যবসা।

সতীশ এল বেশ বেলায়, আরে দাদা ঝামেলা কি কম! কাল একটা টেম্পো ছিনতাই হয়ে গেছে রাস্তায়, কয়েক হাজার টাকার মাল ছিল টেম্পোয়, এবার ভাবো।

তাই নাকি! ছিনতাই হল কি রকম?

ছিনতাইয়ের আবার রকম আছে নাকি! কলি যুগ চলছে যে। এরপরে আবার শাকের ওপর বোঝার আঁটি চাপিয়ে দিয়ে গেছে কালী।

কোন কালী? নতুন নতুন আজকাল অনেক কাঁটাদার গজিয়ে উঠেছে। ভাইদা ঠিক চিনতে পারল না।

সতীশ বলল, ক্যানিংয়ের দিকে থাকে, ওর বাবা নাকি ক্যানিং বাজারে নামকরা পাইকার ছিল। মাছেরই। বাপটা মরে যাওয়ার পর কালী বাপের কিছু টাকা ঢেলে কাঁটাদার হয়েছে। তা সেই কালী দু'দিনের নাম করে দেশে গেছে, আর ফেরার কোন লক্ষণই নেই। ওর টাকা পড়ে ছিল এদিক-সেদিক, সেগুলো কিছু কিছু আদায়ও করেছি, এখন টাকাগুলো কি করি বলো তো? যার টাকা তাকে দিতে পারলে বাঁচি।

রেখে দাও না। টাকা যদি ও না নিতে আসে তোমারই লাভ। হাসে ভাইদা।

না ভাই, ওসব কোনদিন করিনি। এই আলায় বসে বলছি, পরের টাকা কোনদিন হজম করিনি, কোনদিন করতেও চাই না।

ভাইদা বলল, যার টাকা সে ঠিক সময়মতো এসে নিয়ে যাবে। টাকা বলে কথা।

আসবে কিনা, আমার সন্দেহ হচ্ছে।

কেন?

ও নাকি মাছের ব্যবসা ছেড়ে দিয়েছে। কানাঘুষায় শুনতে পাচ্ছি, ও নাকি সাধু-সন্ন্যাসীদের সঙ্গে এখন ঘোরাঘুরি শুরু করেছে। বলো তো, কি ঝামেলা!

তাই নাকি! ভাইদার কেমন অবাক লাগে। মানুষের মধ্যে কার যে কখন কি হয় কে বলবে! নইলে কাঁচা টাকার ব্যবসা ছেড়ে কেউ সন্ন্যাসী হতে পারে। কিন্তু কালী কাঁটাদারটা যে কে, কিছুতেই মুখটা চোখের ওপর ভেসে উঠল না ভাইদার।

কালীর কথা বাদ দাও, টেম্পোটা যে কোথায় গেল! তাছাড়া টেম্পোতে যা মাছ গেছে, কিছু তার বরফ চাপা ছাড়াই, ফলে বুঝতে পারছ ব্যাপারটা? চিন্তারই কথা।

পুলিশ কি বলে?

থানা-পুলিশও তো আজকাল আর রক্ষক নয় রে দাদা। ওদের কেবল ধান্দা, কি করে টাকা হাতড়াব। মাসে মাসে কম টাকা নিয়ে যায় ওরা! তোমাকে আর কি বলব!

তা অবশ্য ঠিক।

দু-জনেই কিছুক্ষণ চুপ করে থাকে। পরে ভাইদা-ই বলে, সে যাক গে, যা হবার হবে। চলো এবার খেয়ে নেবে চল। রান্নাটান্না অনেকক্ষণ রেডি।

সবাই মিলে একসঙ্গে বসে খাওয়া সারে। খাসির মাংস আর ভাত। বেশ খানিকক্ষণ হৈ-হুল্লোড় হয়। সেই সঙ্গে অদ্ভুত অদ্ভুত

গল্প। আজকাল কেবল চিংড়িই না, ব্যাঙও প্রচুর চালান হয় জানো? সাহেবদের দেশে!

সাহেবরা ব্যাঙও খায় নাকি?

ব্যাঙ কেন, সাপও প্রচুর চালান হয়। সাহেবরা কি না খায়, ব্যাঙ, সাপ, মাকড়শা, আড়শোলা সব খায়।

আহ্ থামো থামো; খাওয়ার সময় ওসব গল্প জুড়লে বমি হয়ে যাবে। বাধা দেয় একজন। আর একজন বলে, ভাগ্যিস সাহেবরা খায়, নইলে আমাদের এই নিচু জমিতে কখনো কি জলকর হত! জলকরের কল্যাণে দশ-বিশটা লোক তবু খেয়ে বাঁচছে। বাজারের হাল কি হয়েছে ভাবা যায় না।

বাজারের হাল থেকে রাজনীতি আসে। প্রথমে দিল্লীর রাজনীতি, পরে চীন রাশিয়া আমেরিকা, সবার শেষে গ্রামের, পঞ্চায়েতের। পঞ্চায়েতের পক্ষে যেমন কথা ওঠে, তেমনি বিপক্ষেও। পঞ্চায়েতের কথায় একটু তর্ক মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে শুরু করলেই ভাইদা সেটাকে থামিয়ে দেয়, ওসব থাক। মানুষের ভাল হলেই ভাল, আমরা কেন মিছিমিছি তর্ক করে মরি।

এইভাবে এক দুপুর কেটে গেল। বিকেলে প্রসন্নবাবু এসে হাজির, এই যে সতীশবাবু ভালো?

সতীশ কাঁটাদার আর ভাইদা খাওয়াদাওয়ার পর জেলেদের বিছানাতেই শুয়ে গড়াগড়ি করছিল। প্রসন্নবাবু আসাতেই উঠে বসল, এই চলে যাচ্ছে এক রকম। আপনি ভালো তো?

একটা টুলের ওপর বসে পড়েন প্রসন্নবাবু, আমাদের আর ভালো, দশ ঝামেলার চাপে পড়ে মারা পড়লাম মশাই। সে যাক গে, আপনাদের একটা টেম্পোর নাকি খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না?

সেই কথাইতো ভাইদাকে বলছিলাম, কি দিনকাল পড়েছে বলুন, টেম্পোকে টেম্পোই লোপাট হয়ে যাচ্ছে। প্রায় কয়েক হাজার টাকার মাল ছিল টেম্পোতে।

তাই বুঝি! তা ওসব তো ইনসিওর করা থাকে।

ইনসিওর ফিনসিওর তো পরের কথা, কিন্তু মাছ নষ্ট হলো তো? টাটকা মাছ।

প্রসন্নবাবু হাসলেন, কিচ্ছু নষ্ট হবে না সতীশবাবু, টেম্পো যারা ছিনতাই করেছে, তারা জানে, মাছগুলোকে কি করতে হবে। চোরা পথে বাজারে ঠিক চলে আসবে মাছ।

সতীশ চুপ করে থাকে।

আসলে ওসব কাজে ক্ষতি যদি কারো হয়, সে হচ্ছে সরকারের।

কি রকম?

আপনারা তো ইনসিওরেন্স কোম্পানিকে ছেড়ে কথা বলবেন না, ঠিক টাকা আদায় করে নেবেন। ফলে, ইনসিওরেন্স কোম্পানিই তো মাঝখান থেকে চোট খাবে। ক্ষতিটা তা হলে হলো কার? সরকারের নয়? আপনি আপনার টাকা পেলেন, চোরেরা মাছ বাজারে বিক্রি করে ঘরে টাকা তুলল, ব্যাপারটা এবার বুঝুন।

ভাইদা কোন কথা বলছিল না। ও আদার ব্যাপারী, জাহাজের খবরে ওর দরকার নেই।

সতীশ হাসে, এক দিক দিয়ে কথাটা ঠিক। তবে এ সব ঠেকানোর জন্য সরকারের কোন মাথা ব্যথা আছে বলেও মনে হয় না। সত্যি কথা বলব, আমরা মশাই পুলিশের উৎপাতেই মরে গেলাম।

প্রসন্নবাবুও হাসেন, পুলিশের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেওয়া যায়। আসলে অসৎ লোকেই দেশটা ভরে যাচ্ছে, পুলিশই বা সৎ থাকে কি করে। আমরা আমাদের কোন দোষ দেখব না, কেবল পুলিশের দোষ দেখে বেড়াব, সেটাই বা কি রকম! সে যাক গে, অন্য প্রসঙ্গে আসেন প্রসন্নবাবু, বাজার কি বুঝছেন? দর আরো উঠবে মনে হয়?

চাহিদা যেমন আছে, তাতে তো ওঠারই কথা, দেখা যাক।

ভাইদা এতক্ষণ পর কথা বলে, বাজারের অবস্থা যাই থাক, আমাদের কিন্তু সুবিধা হচ্ছে না।

সতীশ বলল, তোমরা তো মাছই দিতে পারছ না। মাছ তোল, তবে না হবে।

প্রসন্নবাবু ভাইদার দিকে তাকান, গত মাসে তো বেশ টান গেছে আমাদের। এত দিনে অবশ্য সামলে ওঠার কথা।

এখন তবু কিছু কিছু উঠছে। বাগদার সাইজও বেশ বড় হয়ে উঠেছে। তুটো ঘেরের মাছ এবার তুলতে শুরু করব।

সব থেকে মাছ কে বেশি দিচ্ছে সতীশবাবু? জিজ্ঞেস করেন প্রসন্নবাবু।

পুঁইখালির যোগান ভাল। হাঁসুয়ায় যে নতুন জলকরটা হয়েছে ওদেরও ভাল।

শিবতলার হাটখোলা ছাড়িয়ে প্রায় তু' কিলোমিটার দূরে হাঁসুয়া। সবে বছর তুয়েক হল চিংড়ির চাষ শুরু হয়েছে ওখানে। হাঁসুয়া কো-অপারেটিভের সেক্রেটারি রাধা ঘোষের সঙ্গে অল্পসল্প আলাপ আছে প্রসন্নবাবুর। উৎসাহ নিয়ে বললেন, হাঁসুয়ায় ভাল হচ্ছে তাহলে?

বেশ ভালই বলব। মাঝখানে একদিন মাছ দিয়ে গেল, কি বলব প্রসন্নবাবু, প্রায় তুটো বাগদাতেই এক কেজি! এই এতখানি করে মোটা। মাথাগুলো ছোট ছোট।

কি রকম দর দিলেন?

অমন মাছ একশ' পঞ্চাশ দিতেও গায়ে লাগে না। তবে একশ' তিরিশেই রাজি করিয়েছিলাম।

একশ' তিরিশ! চমৎকার দাম।

ভাইদা বলল, ওদের ব্যাপার আলাদা।

কেন? আলাদা কেন? তাকিয়ে থাকেন প্রসন্নবাবু।

আলাদা নয়, ওরা কলকাতা থেকে পাশ করা ইঞ্জিনিয়ার আনিয়েছে। আর আমাদের ইঞ্জিনিয়ার ব্রজলাল। কোথায় আর কোথায়! ওরা মাছের গায়ে ইঞ্জেকসন দিয়ে প্রোডাকশন বাড়ায়, আমরা মাকাল ঠাকুরের পূজো দিয়ে মুখ চেয়ে বসে থাকি, কবে বাড়বে মাছ।

তা অবশ্য ঠিক। তবে মাঝেসাঝে ওখানে লোক পাঠিয়ে কায়দা কান্নুনগুলো একটু জেনে নিলেও তো হয়। যদি বলেন তো ওদের ইঞ্জিনিয়ারকে এখানে একদিন আনিয়ে দেখিয়ে নিয়ে যেতে পারি।

হাঁসুয়ার সেক্রেটারির সঙ্গে কথাও বলতে পারি।

ভাইদা বলে, আমি আর কি বলব। আপনি যে রকম বলবেন, সে রকমই হবে।

ঠিক আছে আমি দেখছি।

চারপাশে ততক্ষণে বিকেলের আলো প্রায় মরে এসেছিল। ঘরের মধ্যে বিন বিন করে নিশি পোকা ঘুরতে শুরু করেছে। এদিকে মশা কম, কিন্তু পোকাগুলো মশার বাড়া। গায়ে জ্বালা ধরিয়ে দেয়।

ভাইদা বলল, চলুন, আমরা বাইরে গিয়ে বসি। বড্ড পোকা কামড়াচ্ছে।

সতীশ বলে, আমি কিন্তু এবার উঠব ভাইদা। সারাটা দিনই তো কাটিয়েই গেলাম।

আরে বসুন বসুন! কি করবেন বাড়ি গিয়ে? কতদিন পর একটু সময় পেয়েছি, বসুন গল্প করি!

ঘরের ভিতর থেকে বাইরে এল ওরা। বাইরে খোলা আকাশ, আকাশের এক প্রান্তে সূর্যটাকে এখন লাল থালার মতো দেখাচ্ছে। সূর্যের খানিকটা অংশ গাছগাছালিতে ঢাকা পড়ে আছে। যত সময় যাবে, গ্রামের দিকে ওই গাছগাছালির ভিতর সূর্যটা ডুবে যাবে। পূবের দিকে নদীতে পুরো জোয়ার। নদী যে কানায় কানায় ভরে উঠেছে, আলার উঠোন থেকেই তা টের পাওয়া যাচ্ছে। খড় বোঝাই বড় বড় নৌকার ওপরের দিককার প্রায় তিনপোটাই এখান থেকে দেখা যাচ্ছে। ভাটা থাকলে নৌকাগুলিকে দেখা যেত না।

সবচেয়ে বড় কথা, বাইরে বসলে জলকরের ছড়ানো জল দেখতে কার না ভাল লাগে। বিশেষ করে যে জলের দানায় রয়েছে মাছ, যে মাছের সঙ্গে সম্পর্ক রয়েছে পয়সার।

আসুন বসি আর একটু। হ্যাঁরে, তোরা চা-ফা খাওয়াবি না?

বাইরে বাঁশের মাচা থেকে জায়গা ছেড়ে দিল বিনোদরা। সরে গেল।

নন্দ বলল, শ্রীহরি কোথায় বেরিয়েছে ভাইদা।

শ্রীহরি বেরিয়েছে তো কি! সামান্য একটু চা তোরা করতে পারবি না? চা চিনি আছে তো? জল ফোটা, আমিই না হয় বানিয়ে দিচ্ছি।

বলাই বলল, না না ম্যানেজারবাবু আপনি বসুন, আমরা করে দিচ্ছি।

মিনিট কয়েকের মধ্যেই গ্লাসে গ্লাসে চা এসে গেল। চা না চিনি গোলা জল, বোঝা যায় না। চায়ে চুমুক দিতে দিতে সতীশ বলল, নদীর ওপারে শিবতলায় আর একটা জলকর তৈরি হওয়ার তোড়জোড় চলছে, শুনেছেন?

তাই নাকি! কে বললে?

ওপারের লোকের মুখেই শুনেছি। দেখতে দেখতে এ তল্লাটে ক'টা জলকর হয়ে গেল ভাবা যায় না। চাষবাস ধীরে ধীরে উঠেই যাবে এবার থেকে।

ভালই তো! যত জলকর হয় তত ভাল। কিন্তু কারা আছে ওই জলকরের পেছনে? আবার প্রশ্ন করেন প্রসন্নবাবু।

সতীশ বলে, কানাইবাবুর নামটা শুনেছিলাম। অবশ্য শোনা কথাই।

কানাই! শেষ পর্যন্ত জলকরের ব্যবসায় নামছে নাকি কানাই! কিন্তু অত টাকা কোথায় ওর?

জলকর করতে আজকাল কি আর টাকা লাগে প্রসন্নবাবু! ব্যাঙ্কের কাছে লোন নেবে। আর যাদের জমি নেবে, তাদের তাদের শেয়ার দেবে।

কো-অপারেটিভ?

একটা কো-অপারেটিভ গড়ে রেজিস্ট্রি করে নিলে টাকার ভাবনা?

প্রসন্নবাবুর কানে কথাটা আগেও এসেছিল, কিন্তু নতুন কিছু যদি শোনা যায়, এই ভেবেই উনি না জানার ভান করলেন এতক্ষণ। বললেন, কানাই ছাড়া আর কে কে আছে? ঘর থেকে কিছু টাকা তো প্রথমে বার করতেই হবে।

সতীশ বলল, শুনি নি। আগে হোক তো, হলেই বোঝা যাবে।

চারপাশে বেশ অন্ধকার নেমে এসেছিল, সতীশ বলল, এবার আমি যাই প্রসন্নবাবু। মেলাই কাজ পড়ে আছে।

প্রসন্নবাবু বললেন, ঠিক আছে তাহলে চলুন, আমিও যাই। বাজারের দিকেই যাবেন তো?

দু'জনেই উঠে দাঁড়িয়েছিল, ভাইদা বলল, আপনার সঙ্গে একটু কথা ছিল প্রসন্নবাবু।

কি কথা?

একটু বসতে হবে!

প্রসন্নবাবু ভাইদার দিকে তাকালেন, ঠিক আছে, আপনি এগোন সতীশবাবু, আমি আসছি!

সতীশ দাঁড়ায় না। ভাইদা বলে, ঘরে আসুন। একটু সময় লাগবে।

ভাইদার ঘরেই ঢুকে পড়ে ওরা। ঘরে টেবিলল্যাম্পটা জ্বালিয়ে দিয়ে গিয়েছিল নন্দ। প্রসন্নবাবু ক্যাম্পখাটে বসতে বসতে বললেন, কি হয়েছে?

ভরত এসেছিল, ভরত হালদার।

কবে?

এই কয়েকদিন আগে, খুব চোটপাট করে গেছে আমার ওপর। ওর টাকার ব্যাপারে কিন্তু কিছুই করলেন না। না দিতে চান, ওকে বলে দিন না দেবেন না।

আমার সঙ্গে দেখা করে না কেন, আমার সঙ্গে দেখা করলেই তো উত্তরটা পেতে পারে। আমার কাছে পাঠিয়ে দিলেই তো ঝামেলা মেটে।

সে আমি বলেছি। ওর এক কথা, দরজায় দরজায় ঘুরতে পারবে না।

প্রসন্নবাবু বললেন, টাকাটা ওর হাতে দেওয়ায় কিছু অসুবিধা আছে। জলকরে ও জমিটা দিয়েছে, সেটা যে ওরই তা আগে প্রমাণ

চাই। ও জমিতে শিবুরও অংশ আছে। আজ ওকে টাকা দিয়ে দিলাম, কাল যদি শিবু টাকা চায়, তখন কি হবে? কোর্টে আগে ফয়সলা হোক ও জমি কার, তবে তো টাকা।

শিবুর সম্পর্কেও ও অনেক কথা বলে গেছে ভরত।

কি রকম?

সে অনেক কথা, ও নাকি কোথায় কোথায় যায়। আপনি ওকে দিয়ে ভরতের নামে মামলা করাতে চান। এই রকম আরো অনেক কথা।

আমার লাভ? ওদের ভাই-ভাইয়ের ব্যাপারের মধ্যে আমি যাব কেন? কি দরকার আমার?

শিবু ওর মেয়েটার দিকে তাকায় না। মেয়েটা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

সেটা শিবুর ব্যাপার আমি কি বলব? আমি যাই। এসব নিয়ে আপনার মাথা না ঘামালেও চলবে।

প্রসন্নবাবু ঘর থেকে বেরিয়ে পড়েন। বাইরে এতক্ষণে বেশ অন্ধকার জমেছে। বেরুবার সময় টর্চ নিয়ে বেরুতে ভুলে গেছেন প্রসন্নবাবু। অন্ধকারের রাস্তায় একটা টর্চ না হলে চলে না।

এই, একটা টর্চ দিবি কেউ? কাল সকালে গিয়ে নিয়ে আসিস।

ভাইদাও বাইরে বেরিয়ে এসেছিল, চোখমুখ একটু গম্ভীর। বলল, এই ব্রজ, একটা টর্চ এনে দে।

টর্চ নিয়ে ধীরে ধীরে ভেড়ির দিকে এগোতে শুরু করলেন প্রসন্নবাবু, আর এমন সময় উলটো দিক থেকে তিন চার জন লোক। হ্যাঁ আলার দিকেই আসছে। কেমন যেন মস্তানি করা ভঙ্গি। একজন টর্চের ফোকাস ফেলল সটান প্রসন্নবাবুর মুখে।

কে রে বাবা, সাহস তো কম নয়। থমকে দাঁড়ালেন প্রসন্নবাবু।

ওরা আরো কাছে এগিয়ে আসতেই চিনতে পারলেন, কি ব্যাপার? দলবল নিয়ে কোথায়?

লোকটার মাথায় সেই ভুমো ভুমো চুল, পরনে লুঙ্গি। দূর থেকে বিনোদরাও দেখেই চিনতে পেরেছিল, মামু। আলার দিকে যে ভাবে

ওরা আসছিল, ভঙ্গিটা ভাল নয়।

মামু বলল, চলো মেম্বরসাহেব, কথা আছে। আলায় চলো।

প্রসন্নবাবু খানিকটা যেন অস্বস্তিতে পড়েছেন, বললেন, কি হয়েছে ?

চলো না, আজ একটা ফয়সলা করে যাব।

আলা থেকে মাত্র সামান্য কয়েক পা এগিয়েছিলেন প্রসন্নবাবু, ধীরে ধীরে কয়েক পা আবার পিছিয়ে এলেন। ওদিকে ভাইদাও এগিয়ে এসেছিল। এসেছিল আলার অনেকেই।

মামুর সঙ্গে ফেউয়ের মতো আর তিনজন যারা রয়েছে তারা চোলাই মদের কারবার করে। প্রসন্নবাবু একটারও নাম মনে করতে পারলেন না, কিন্তু সব কটা মুখ চেনা।

কি হয়েছে, বল ?

মামু বলল, আমরা জানতে এসেছি, হাসিকে লোড করেছে কে ?

প্রসন্নবাবু কেমন ঘোলাটে চোখে তাকান, লোড করেছে মানে ?

লোড বোঝ না ? কে মাল ভরেছে ওর পেটে ?

এই যা ! কি বলছিস ? বাধা দেন প্রসন্নবাবু।

জেলে-জিমনি অনেকেই ঘিরে দাঁড়িয়েছিল, সবাই কেমন পাথরের মতো অনড়।

মামু দাঁতমুখ খিঁচিয়ে উঠল, আমি জানতে চাই, কে লোড করেছে ? তোমরা এখানে রোজ গাঁয়ের কচি কচি মেয়েগুলোকে ধরে এনে যে ফুর্তি করো, তা আমরা খবর রাখি না বলতে চাও ?

ভাইদা বাধা দিতে গেল। হুমকি দিয়ে তাকে থামিয়ে দিল মামু। চোপ শালা, তোর সঙ্গে কথা বলছি না, তোদের বাপ, ম্যানেজারের সঙ্গে কথা বলছি।

প্রসন্নবাবু কেমন অস্বস্তিতে পড়েন, মামু আর তাঁর দলের সব কটাই চোলাই টেনে এসেছে সন্দেহ নেই। নইলে এই মামু কখনো চোখের সামনে এসে দাঁড়াতে পারে !

আমাদের দুটো কথা। গাঁয়ের কোন মেয়েকে তোমরা ফুর্তি করে নষ্ট করবে, এ আমরা হতে দেব না। তোমাদের এখানে রাতের লীলা

বন্ধ করতে হবে। আর তুই হচ্ছে, লোড যখন হয়েই গেছে, এবার মাল খালাস করার টাকা ছাড়তে হবে।

প্রসন্নবাবু ভাইদার মুখের দিকে তাকান। ভাইদা সামাল দেওয়ার জন্য বলে, ব্যাপারটা কি হয়েছে আমাদের বুঝতে দিতে হবে তো! কিছু জানলাম না শুনলাম না, হুট করে—যার মেয়ে তাকে আগে ডাকি, তবে না।

তাকে কোথায় পাবে? তার মাথা খারাপ হয়ে গেছে।

শিবু কোথায়? জিজ্ঞেস করেন প্রসন্নবাবু।

ভাইদা বলে, দুপুরে আজ ভাত খেতেও আসেনি, কোথায় গেছে কে জানে!

লঞ্চঘাটে রয়েছে শিবু। মেয়ের জন্য কেঁদেকেটে ভাসিয়ে দিচ্ছে। মামু খিখি করে হাসে।

শিবু যে লঞ্চঘাটের মেয়েগুলোর কাছে আরো ঘনঘন যাতায়াত শুরু করেছে এটা প্রসন্নবাবুর অজানা নয়। বললেন, তাহলে আর এখন কথা হয় কিরে? যার মেয়ে সে এসে বলুক, তবে না।

জলকরের জলে যেখানে পইনা দিয়ে মাছ আটকে রাখা হয়েছে, সেখানে ফোকাস মারে মামু। তারপর টর্চের আলো ঘুরিয়ে বলে, তার মানে তোমরা এখন টাকা ছাড়বে না?

কিসের টাকা?

ওই যে বললাম মাল খালাস করতে হবে। সাত দিন সময় দিয়ে গেলাম, টাকা ছাড়ো তো ভালো, নইলে কিভাবে টাকা আদায় করতে হয় আমরাও জানি।

চুপ করে থাকেন প্রসন্নবাবু। মামুকে ওর ভালোই চেনা। না পারে হেন কাজ নেই। কিন্তু হঠাৎ এই জলকরের দিকে নজর পড়ল কেন! তবে কি কেউ পেছনে লাগাল!

খোঁজ করে দেখতে হবে ব্যাপারটা। প্রসন্নবাবু মনে মনে একটা প্ল্যান ছকে ফেলেন। যত রাতই হোক আজই একবার থানায় যেতে হবে। থানার দারোগা জীবনবাবুর সঙ্গেও অনেকদিন দেখা হচ্ছে

না। পঞ্চায়েতে জয়ী হওয়ার পর প্রসন্নবাবু কথা দিয়েছিলেন একদিন ওকে বাড়িতে নিয়ে গিয়ে পিঁড়ি পেতে বসিয়ে খাওয়াবেন। এখন যেন সেই সময়টাই এসে গেছে। পার্টির ছেলেদেরও গোপনে বলে রাখতে হবে। জলকরের পেছনে হঠাৎ ও লাগল কেন খবরটা যেন বার করে। প্রথমেই মনে পড়ে ভরতের কথা, ভরত নেই তো পেছনে? ভরত টাকা পায়নি, ওর রাগ থাকাই স্বাভাবিক। তাছাড়া কানাই-বাবুও থাকতে পারে। নিজের ভিতরকার জ্বালা বোধহয় ওইভাবে মেটাতে চায় লোকটা। ঠিক আছে দেখাই যাক। কোথাকার জল কোথায় দাঁড়ায়।

ভাইদা মামুর দিকে তাকাল, বলল, শিবু আসুক, শিবুকে জিজ্ঞেস করব, তারপর।

মামু ভাইদার মুখেও একবার টর্চের ফোকাস ফেলল, ঠিক আছে, আমরাও সাতদিন সময় দিয়ে গেলাম। আজ রোববার, আর এক রোববারের মধ্যে এক হাজার টাকা যেন রেডি থাকে।

ওরা যেমনি হুটপাট করে এসেছিল, তেমনি আবার চলেও গেল।

কিন্তু পরিবেশটা বেশ কিছুক্ষণ থমথমে হয়ে রইল।

ভাইদা প্রসন্নবাবুর দিকে তাকায়, আপনার সঙ্গে কি লোক দেব, পৌঁছে দিয়ে আসবে?

না। আমি একাই যেতে পারব। তবে একটা কথা বলে যাই, রাত পাহারাতে মনে হয় আরো লোক বাড়ান দরকার। হালচাল খুব ভাল মনে হচ্ছে না। একদিন দুম করে হামলা করতে এলে তখন কিন্তু তা ঠেকাতে হবে।

ভাইদা বলল, রোজ এখন চার জন করে টংয়ে থাকছে। আজ থেকে না হয় আরো দু'জন বাড়াব।

তাই ভাল। সাবধানের মার নেই।

ছ' জনের মধ্যে অবশ্য একজন থাকাও যা, না থাকাও তা।

কে, শিবু? ওকে আলায় টেনে নিয়ে ওর জায়গায় অন্য লোক দিলেই হয়। ওকে যে টং পাহারা দিতেই হবে এমন কি কথা।

ভাইদা একবার প্রসন্নবাবুর চোখের ভাষা বুঝবার চেষ্টা করল, একটু যেন ভয়ই পেয়েছে বলে মনে হয় ওর। বলল, ঠিক আছে, তাই করব এবার থেকে।

দশ

দিনকয়েক চাপা উত্তেজনা চলল জলকরে। রাতে কড়া পাহারা। প্রসন্নবাবুর কথা একেবারে উড়িয়েও দেওয়া যায় না। জলকরের ভেড়ি লুটের ঘটনা এর আগেও কয়েকবার খবরের কাগজে ছাপা হয়েছে। কাগজে তো মিথ্যে ছাপা হতে পারে না। ঘটেছে বলেই ছাপা হয়েছে। সেরকম ঘটনা যে এখানেও ঘটবে না, বিশ্বাস কি! বিশেষ করে সেদিন মামুর যা চোখমুখের অবস্থা দেখা গেল, তাতে কিছুই বিশ্বাস নেই।

প্রথম তিন চার দিন রাতপাহারা দিতে গিয়ে কারো ঘুম হয়েছে বলে মনে হয় না। প্রসন্নবাবুর সঙ্গে ঠিক হয়েছিল, রাতে ছ' জন থাকবে টংয়ে। কিন্তু ভাইদা কোন ঝুঁকিতে যেতে রাজি নয়, ছ' জনের জায়গায় ন' জনকেই পাহারায় লাগিয়ে দিল। ভাইদা-ই কেবল দু'জন জিমনি আর দু'জন জেলেকে নিয়ে আলা আগলে কাটাল।

ইতিমধ্যে পর পর দুটো চিঠিও লিখল ও কলকাতায় অক্ষয়বাবুর কাছে। আগেভাগে সব কিছু জানিয়ে রাখা ভাল। কিছু একটা হয়ে গেলে তখন যাতে জবাব দিতে সুবিধে হয়।

ভাইদা লিখল, হুজুর, দিনকয়েক হল, জলকরের আবহাওয়াটা বেশ ঘোরালো হয়ে উঠেছে। আপনাকে আগেও জানিয়েছি, এখনো জানাচ্ছি, ভরতের পাওনা টাকাটা ম্যানেজারবাবুর মিটিয়ে দেওয়া উচিত ছিল। এ ব্যাপারে ওর সঙ্গে আলোচনাও করেছি, কিন্তু ওর হাবভাব বোঝা দায়। উনি আমাকে জানিয়েছেন, ভরতকে টাকা দেওয়া সম্ভব নয়। কেননা, ভরত আর শিবু দু' ভাইয়ের মধ্যে বিরোধ শুরু হয়েছে। এই বিরোধ না মেটা পর্যন্ত উনি কাউকেই টাকা দিতে রাজি নন। বেশ,

উনি টাকা না হয় নাই দিলেন, কিন্তু জলকরের দু' হাজার টাকা উনি নিজের কাছেই বা রাখবেন কেন? আমার সন্দেহ উনি টাকটা সুদে খাটাচ্ছেন। এবং সুদের টাকা নিজেই পকেটে পুরছেন।

সে যাই হোক, ইতিমধ্যে ভরতের ভাই শিবু পরিস্থিতিটা আরো ঘোরালো করে তুলেছে। আপনি হয়ত শুনে থাকবেন শিবুর একটি কন্যা আছে। অবিবাহিতা কিন্তু মনে হয় নষ্ট চরিত্রের। এ সব ব্যাপার পত্রে লেখা যায় না। আপনি কবে আসবেন? আপনি সশরীরে উপস্থিত থাকলে অনেক সমস্যারই সমাধান হয়ে যেত এ বিশ্বাস আমার আছে। যত শীঘ্র সম্ভব আপনার এখানে একবার আসা প্রয়োজন।

কি করেন না করেন এই চিঠি টেলিগ্রাফ মনে করে জানালে বিশেষ ভাবে নিশ্চিন্ত থাকতে পারি। ইতিমধ্যে আমি একবার কলকাতায় আপনার সঙ্গে দেখা করতে যেতে পারতাম, কিন্তু বর্তমান অবস্থায় এখন আমার পক্ষে জলকরের বাইরে এক মুহূর্তও কোথাও থাকা উচিত নয়। স্থানীয় কিছু দুশ্চরিত্রের লোক নানাভাবে আমাদের শাসিয়ে যাচ্ছে, টাকার দাবি করছে। এইসময় প্রসন্নবাবুর যতখানি কঠোর হওয়া উচিত ছিল, তা তো উনি হচ্ছেনই না, বরং সবরকম ঝামেলা থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখারই চেষ্টা করছেন। প্রসন্নবাবুর প্রতিদিন অন্তত একবার করে জলকরে আসার কথা, কিন্তু উনি আসেন না। ফলে সমস্ত ঝক্কিটা আমারই।

হুজুর, আশা করি আমার এই চিঠির গুরুত্ব বুঝে সত্বর ব্যবস্থা নেবেন। আর বিশেষ কি লিখব। আপনি আমার প্রণাম নেবেন। আপনাদের মঙ্গল কামনা করি। ইতি, ভাইদা।

এই চিঠি নিজের হাতেই পোস্ট করেছে ভাইদা। পোস্ট করেও স্বস্তি নেই, ডাক বিভাগের ওপর পুরোপুরি ভরসা রাখা যায় না। ফলে দু' দিন পরেই আবার আর একটা চিঠি পোস্ট করে এসেছে। এখন উত্তরের অপেক্ষা ছাড়া আর কিই বা করার আছে ওর।

এরই মধ্যে গতকাল একটা বিশ্রী ব্যাপার হয়ে গেল, সন্ধ্যার সময়

আলার উঠোনে বসে গল্প হচ্ছিল। গল্প থেকে হঠাৎ প্রায় হাতাহাতি হওয়ার মতো অবস্থা।

প্রসঙ্গটা ভাইদাই তুলেছিল। হ্যাঁরে বলাই, তুই তো এদিক সেদিক ঘুরে বেড়াস। সেদিন যে মামু অত চোটপাট করে গেল, এর কারণ কিছু বুঝতে পরিস? কি মনে হয় তোর?

মামু ওরকমই। লোকে খেটে খায়, মামু খায় লুটপাট করে, ভয় দেখিয়ে।

কিন্তু আমাদের এখানে খুব তৈরি হয়েই এসেছিল মনে হল। হঠাৎ আমাদের দিকে অমন নজর পড়ার পেছনে নির্ঘাৎ কোন কারণ আছে। কেউ মামুকে নির্ঘাৎ তাতিয়েছে, তোর কি মনে হয়?

কি জানি, কে তাতাবে? ওসব ব্যাপারে আমি কি বলব।

কেউ না তাতালে হঠাৎ এদিকে নজর পড়বে কেন? কোনদিন তো লোকটা এদিকে মাড়ায়নি। সত্যি করে একটা কথার উত্তর দিবি?

কি কথা?

সেদিন মামু যে ওসব কথা বলে গেল, গাঁয়ের মেয়েদের এখানে এনে ফুর্তি করা হয়, হঠাৎ এসব কথা ও বলতে যাবে কেন! ব্যাপারটা কি?

কিছু সত্যি থাকতেও পারে। কথাটা বলেই চুপ করে গেল বলাই।

মানে! ভাইদার চোখদুটো কেমন ছোট ছোট হয়ে ওঠে।

বিনোদকে জিজ্ঞেস কর না, ওতো তোমারই লোক। তাছাড়া টংয়ে রোজ রাত জেগে পাহারা দেয়। ওই ভাল বলতে পারবে।

বিনোদ খানিকটা যেন লাফিয়ে ওঠে, আমি কি করে বলব। আমাকে আবার জড়ানো কেন!

বলাই বলল, শিবুর মেয়েটা সেদিন রাতে তোর টংয়ে এসেছিল।

আমার টংয়ে! আমার টংয়ে আসবে কেন! আমি কখনো ওকথা বলেছি? থর থর করে কাঁপতে শুরু করে বিনোদ।

বলাই নির্বিকার। বলল, তুই-ই তো সেদিন বললি, সারা রাত

তোর টংয়ে কাটিয়ে গেল ও।

ঝাঁ করে বিনোদের মাথায় রক্ত চড়ে গেল, ঝাঁপিয়ে পড়ল বলাইয়ের ওপর। খুনোখুনি হয় আর কি। ভাইদা-ই মাঝখানে পড়ে সরিয়ে দিল দু'জনকে।

বিনোদ কাঁপতে কাঁপতে বলল, ওরা সব টংয়ে শুয়ে ঘুমায় ভাইদা।

খবরদার, তুই দেখেছিস আমাদের ঘুমুতে?

দশ ডাকেও তো সাড়া পাই না তোদের।

আহ্, ওসব থাক না। টংয়ে কে ঘুমোয় না ঘুমোয় সেটা আমি বুঝব। ভাইদা থামাবার চেষ্টা করে। বলাই থামতে চায় না, তুই বুকে হাত দিয়ে বল, হাসি গভীর রাতে লুকিয়ে লুকিয়ে আসে না? তোর সঙ্গে কথা হয় না?

বিনোদ বলল, আমার কাছে আসে না। ও আসে ওর বাবার কাছে, শিবুর কাছে।

শিবু যখন টংয়ে থাকে না, তখন তুই কি করিস?

বিনোদ আবার লাফিয়ে উঠে ঘুসি চালাতে যায়। কিশোরী ওকে কোমর ধরে টান দিয়ে সরিয়ে দিল। নিজেদের মধ্যে মারামারি করে লাভ আছে?

শিবুর মেয়ে যে রাতে এখানে আসে এ কথা কিন্তু তোরা কেউ আমাকে বলিস নি। ভাইদা যেন নতুন কথা শুনছে।

বিনোদ বলল, মাঝে মাঝে আসে, শিবুর খোঁজ করতে। শিবু না থাকলে আবার চলে যায়। বলব বলব করে বলা হয় নি।

শিবুর কাছে কেন আসে জিজ্ঞেস করিস নি?

বিনোদ বলল, মেয়েটার সঙ্গে আমার কোন কথাই হয় নি। টংয়ে বসে বসেই ওকে আমি দেখেছি।

শিবুকেই তো জিজ্ঞেস করতে পারিস।

শিবুর মেজাজ দেখ না, কে জিজ্ঞেস করবে ওকে! জিজ্ঞেস করে বিপদ ডাকব?

তা অবশ্য ঠিক। অক্ষয়বাবুদের এই জলকরে যত ঝুট-ঝামেলা

শিবুই বাঁধিয়ে রেখেছে সন্দেহ নেই। ওকে নিয়েই যত গণ্ডগোল।

আজকাল তো কোন তোয়াক্কাই করে না কাউকে।

ভাইদাও ওর অবস্থা দেখে আর ঘাঁটায় না। এখন যা ইচ্ছে ও করে যাক, একদম কথা বলবে না ভাইদা। অক্ষয়বাবু একবার এই জলকরে এসে পা দিলেই আপদ বিদায় করা হবে। এখন প্রসন্নবাবুকেও কিছু বলার দরকার নেই।

ব্রজলাল এমনিতে খুব একটা কথা বলে না, সেও বলল, অত ভাবছ কেন ভাইদা, আমার মনে হয় কিছু হবে না। যারা যত গর্জায় তারা তত বর্ষায় না। মামু লোকটাকে কে না চেনে, ও ওরকমই।

তার মানে, ওরা আর ঝামেলা করবে না?

ঝামেলা করার হলে এত দিনে ঠিক করে যেত। আমার তো মনে হয়, হঠাৎ একদিন হয়তো চোলাই খাওয়ার টাকা কম পড়েছিল, খানিকটা ভয় দেখিয়ে গেল যদি কিছু আদায় করতে পারে।

ভাইদা কথাটাকে একেবারে উড়িয়ে দিতে পারে না। সাত দিনের সময় দিয়ে গিয়েছিল মামু। রবিতে রবিতে আট দিন পার হয়ে আজ মঙ্গলবার। অর্থাৎ আজ দশ দিন। লোকটার যদি হাঙ্গামা বাধাবারই ইচ্ছে থাকত, তাহলে এত দিনে কিছু না কিছু একটা করে বসতই।

ভোলা বলল, মামুর রাগটা কিন্তু তোমার ওপর নয় ভাইদা।

তবে? ভাইদা কেমন ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে।

সে দিন কথাবার্তা শুনলে না, ওর রাগটা জলকরের ওপরও নয়, ওর রাগ প্রসন্নবাবুর ওপর। দেখলে না, টাকাটা ও কিন্তু তোমার কাছে চায় নি, চেয়েছে প্রসন্নবাবুর কাছে। তুমি কিছু বলতে গেলেই কেমন খ্যাঁকখ্যাঁক করে উঠছিল দেখ নি?

টাকাটা প্রসন্নবাবু তো আর পকেট থেকে দেবে না। ওকে যদি দিতে হয়, সে টাকা ও জলকর থেকেই আদায় করে দেবে। আসলে আমার ভয়টা অন্য জায়গায়।

সবাই তাকিয়ে থাকে।

ওরা যদি বাঁধফাঁদ কেটে মাছ বার করে দিয়ে যায়, তা হলেই

পথে বসতে হবে। অক্ষয়বাবুকে তো আমি চিনি। ব্যবসা তুলে দেবে, তবু ঘর থেকে এক কানাকড়িও আর বার করবে না।

তার মানে জলকর উঠে যাবে বলছ?

তেমন হলে তো উঠেই যাবে। দিনের পর দিন কে অত লোকসান দেবে বল, তুই যদি এই জলকরের মালিক হতিস, তুই দিতি?

আবার চুপ করে যায় সবাই।

ভাইদা বলে, এখানকার হিসেব তো আমার জানা, অক্ষয়বাবু হঠাৎ এক সময় বললেই হল, দরকার নেই আর আমার জলকরে। এবার সব বিদেয় হও দেখি।

কথাটা শুনলে সত্যি একটু ভাবনা হয়। তবু এই জলকরটা আছে বলে রুজি রোজগার চলছে, হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেলে পথে বসতে হবে।

ব্রজলাল বলল, ব্যবসায় লাভ ক্ষতি সব সময়ই থাকে। বন্ধ হয়ে যাওয়া মুখের কথা নয়।

ভাইদা বলল, তেমন হয়তো হবে না। তবে চালাতে না পারলে বিক্রি হয়ে যাবে। অক্ষয়বাবুদের হাত থেকে আর কারো হাতে চলে যাবে।

অক্ষয়বাবুদের হাত থেকে আর কারো হাতে চলে গেলে ক্ষতি অবশ্য সামান্য জেলে-জিমনিদের কিছুই হবে না, তবে ভাইদা আর এখানে টিঁকতে পারবে কিনা সেটাই প্রশ্ন। হয়তো ভাইদার দুশ্চিন্তাটা সে জন্যই। চুপ করে থাকাই ভাল।

দেখতে দেখতে আরো দু'তিনটে দিন পার হয়ে গেল। জলকরে সবাই ভুলে যেতে শুরু করল মামুর শাসানির কথা। আবার স্বাভাবিক হয়ে উঠছিল সব। আট ন'জন করে লোক টংয়ে রাখলে অন্য কাজের কিছুই এগোয় না। ফলে রাত পাহারার লোক কমিয়ে আবার পাঁচজনে দাঁড় করিয়েছিল ভাইদা। ভেড়ি লুট করতে এলে পাঁচ জনও যা ন'জনও তা। যা হবার তা হবেই।

এর মধ্যে দিন চারেক আগে শেষ রাতে কাঁটাদারদের কাছে মাছও পাঠানো হয়েছে। দিন তিনেক ব্যাঙ্কের লঞ্চে টাকাও জমা দেওয়া

হয়েছে। গতকাল ভাইদা অক্ষয়বাবুর চিঠিও পেয়েছে। চিঠির মোদ্দা কথা, এই মাসের শেষের দিকে উনি জলকর দেখতে আসতে পারেন। এলে সপ্তাহ খানেক থাকবেন। থানায় জানিয়ে রাখার কথা লিখেছেন। প্রসন্নবাবুকে আলাদা চিঠি দিচ্ছেন, ইত্যাদি।

এই মাসের শেষে বলতে এখনও দিন পনেরর আগে নয়। তা হোক, আসছেন এই যথেষ্ট। অক্ষয়বাবু এলে অনেক কিছু পরিষ্কার করে নিতে হবে। শিবুর ব্যাপারটা তো বটেই, প্রসন্নবাবুর ব্যাপারেও একটা হেস্তনেস্ত করে নিতে হবে এবার। ভরত হালদারকে ডেকে এনে মুখোমুখি কথা বলিয়ে দিতে হবে অক্ষয়বাবুর সঙ্গে। কিছুটা যেন নিশ্চিন্তই লাগছিল ভাইদার।

সন্ধ্যের সময় সবাই যখন আলার উঠোনে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ঘুরছে, ভাইদা তখন বলল, অক্ষয়বাবু এ মাসের শেষে ভেড়ি দেখতে আসবেন। চিঠি দিয়েছেন।

অক্ষয়বাবু আসা মানে দিন কয়েক খাওয়া-দাওয়া ভালই হবে। ব্রজ জিজ্ঞেস করল, একা ?

একাও আসতে পারেন, সঙ্গে লোকও থাকতে পারে। সে সব কিছু লেখেন নি। তবে আসছেন যখন, আমাদের কিন্তু এরই মধ্যে আলার ঘরগুলো সব পরিষ্কার করে গুছিয়ে ফেলতে হবে। এসে যেন নোংরা বলে গালাগালি না করেন।

অক্ষয়বাবু এলে ভাইদার ঘরেই থাকবেন। ক্যাম্পখাটের নেয়ারগুলো একটু ঢিল হয়ে এসেছিল, ভাইদা মনে মনে ঠিক করে ফেলল, নতুন ফিতে কিনে খাটটাকে আবার ছাইয়ে নেবে। দু'একটা ফিনাইল আর কার্বলিক অ্যাসিডের বোতল আনিয়ে রাখতে হবে। ওগুলো নেই দেখলেই মাথা গরম হয়ে যাবে অক্ষয়বাবুর। ভাইদা একটা ফর্দও করে ফেলল আর কি কি আনতে হবে।

সন্ধ্যেটা খুব হালকাই লাগছিল ভাইদার। ওপাশে স্লুইস গেটের সামনে জলে নেমে মাছ গুছিয়ে রাখছিল কয়েকজন। আগামী কাল ভোরে মাছ পাঠাবার কথা। সতীশ কাঁটাদারকে খবর পাঠান

হয়েছে, মাছ যাবে।

নদীর ধারে ভেড়িতে ঘোরাঘুরি করছিল বিনোদরা।

আলার উঠোনে সেই বাঁশের বেঞ্চে হাত পা ছড়িয়ে বসেছিল ভাইদা, এমন সময় দূর থেকে ভেড়ি ধরে দু'একজনকে এগিয়ে আসতে দেখা গেল। হাতের টর্চটা একবার করে জ্বলছে আবার নিভে যাচ্ছে।

কে রে বিষ্টু? কারা যেন আসছে না?

উত্তর দেওয়ার কিছুই ছিল না, বিষ্টুও তাকিয়ে থাকে।

মাকাল ঠাকুরের ঝুপড়িটার পাশে আসতেই ওদের চেনা গেল। পিঠের শিরদাঁড়ায় একটা অদ্ভুত অনুভূতি শুরু হল ভাইদার। উঠে ভদ্র হয়ে বসল, কে রে?

জলজ্যান্ত তিনটে মেয়ে। আলায় মেয়েমানুষ আসবে, ভাবাই যায় না।

তাকিয়ে থাকা ছাড়া এখন আর কিছুই করার নেই যেন। কি চেহারা এক একটার। তার মধ্যে আবার সাজগোজের বাহার কত!

মোটা মতো একটা মেয়ে এগোতে এগোতে ভাইদার কাছাকাছি এসে বেঞ্চের ওপর বসে পড়ল। কাজল টানা চোখ। ঝিলিক দিয়ে হাসল, ভাইদা কে গো? প্রশ্ন করল ভাইদাকেই।

কেন? কি দরকার? কোথা থেকে আসা হচ্ছে?

ওমা গো! মেয়েটা ঠোঁট বাঁকা করে অদ্ভুত একটা ভঙ্গি করল, ও হিমি, বলে কি গো? কোথা থেকে আসা হচ্ছে!

ওপাশে মেয়েদুটো মাছ জিওনর কায়দা দেখার জন্য স্লুইস গেটের কাছেই হুমড়ি খেয়ে পড়েছিল। ওদের মধ্যে একজন উত্তর দিল, দেখে যা দিদি, কত মাছ! নাপাচ্ছে!

ততক্ষণে আলায় যারা এপাশওপাশ ঘুরছিল সবাই এসে ভিড় করে দাঁড়িয়েছে। এমন দৃশ্য এ আলায় কে কবে দেখেছে। গোগ্রাসে গিলছিল যেন সবাই মেয়েগুলোকে।

ভাইদা কে বল না গো? আর একটু এগিয়ে প্রায় ছুঁইছুঁই হয়ে বসে পড়ল মেয়েটা।

ভাইদা বলল, আমিই। কিন্তু কেন?

আমাদের শিবুদা পাঠিয়েছে। আমার নাম বেলা, রাত হয়ে গেছে বলে আর একা এলুম না, ওদেরও নিয়ে এলাম। এই হিমি, এদিকে আয় না।

ওপাশের মেয়েদুটো পাখির মতো হালকা ডানায় ভর দিয়ে যেন উড়তে উড়তে এল। কি বল না, মাছ দেখছিলুম।

শিবু পাঠিয়েছে মানে? কেন?

পঞ্চাশটা টাকা চেয়েছে। ওর মাইনে থেকে পরে কেটে নিও।

মাথায় যেন রক্ত উঠে এল ভাইদার। তবু নিজেকে সামলে নিয়ে বলল, টাকার গাছ আছে নাকি এখানে? একটু ঝাঁকলেই ঝুরঝুর করে পড়বে নাকি! শিবু টাকার কথা বলেছে, শিবুর কাছ থেকেই নাও গে যাও। এখানে কিছু হবে না।

শোন লো হিমি, কি বলে? আমরা লঞ্চঘাটে থাকি বলে কি মানুষ নই। ওভাবে কথা বলছ কেন গো? শিবুদার কথা না হয় ছেড়ে দিচ্ছি, আমরা চাইছি, দাও।

ভাইদা গম্ভীর গলায় বলল, টাকাফাকা কিচ্ছু হবে না। আমার কাছে এখন কিচ্ছু নেই।

হিমি মেয়েটা ছিপছিপে, পাতলা। সঙ্গে আর একটা মেয়ে মাথায় যেন তাল গাছ। নামটা ওর জানা হয় নি। জানার জন্যে জিজ্ঞেসও করা যায় না।

হিমিই বলল, টাকা না দাও মাছ দিতে তো আর পয়সা লাগবে না। দাও না বাপু, বাগদা তো আর কিনে খাওয়া হয় না, তবু ভালবেসে একটু যদি খাওয়াও।

না, মাছও হবে না। শিবু কোথায়? ওকে পাঠিয়ে দাও, ও নিজের হাতে নিয়ে যাক, আমাদের কিছু বলার থাকবে না।

ওরে বাবা, এযে বিশ্বামিত্র মুনি গো! টাকাও দেবে না, মাছও দেবে না।

না। ভাইদা উঠে দাঁড়ায়, কিচ্ছু দেব না। এটা দানসত্র নয় যে

দিতে হবে।

আ মর! একটু হেসেও কথা বলতে শেখনি নাকি! আমরা কুকুর বেড়াল নাকি, যে অমন করে কথা বলছ!

ভাইদা বুঝতে পারে, ওর বলার ভঙ্গিটা বোধহয় একটু কড়াই হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু তাই বলে এদের সঙ্গে হেসে মস্করাও করা যায় না।

চল রে হিমি, দেবে না।

হিমি হেসে ওঠে, পাদুটো জড়িয়ে ধর না, ঠিক দেবে।

ঢ্যাঙ্গা সেই মেয়েটা এবার কথা বলে, টাকা না হয় নাই দিলে গো, মাছও না হয় না দিলে, কিন্তু এই প্রথম আলায় এলাম, একেবারে খালি হাতে যাব? এক খিলি পানই না হয় খাওয়াও।

আমরা পান খাই না।

অ! পান খাও না। তালে বিড়ি খাওয়াও।

ভাইদা এদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যই যেন বলল, এই বিনোদ, বিড়িফিড়ি কি আছে দিয়ে বিদেয় কর দেখি।

বিড়ি দেবার জন্য তিন-চারটে হাত এগিয়ে আসে।

বেলা, হিমি আর সেই ঢ্যাঙ্গা মেয়েটা যে কটা পারল তুলে নিল। তারপর ফসফস করে ধরিয়ে বলল, চলরে হিমি, শিবুদাকেই ধরি গে চল। জেনেশুনে আমাদের এখানে কেউ পাঠায়।

মেয়ে তিনটে ভালয় ভালয় টর্চের ফোকাস মারতে মারতে ভেড়ির দিকে আবার এগোতে শুরু করে।

হাঁ করে তাকিয়ে থাকে আলার জেলে-জিমনিরা।

এগারো

শিবুর মাথার যেন সারাক্ষণ আগুন ছুটোছুটি করছে। শিবু ভাবতেই পারে না. কালী কাঁটাদার ওদের অমন সর্বনাশ করে পালাতে পারে। ছোঁড়াটার সঙ্গে শিবুর যে খুব একটা মাখামাখি ছিল এমন নয়। চিনত সামান্যই। যে কবার ওর সঙ্গে কথা হয়েছে, তাতে ওর একটা

ধারণা হয়ে গিয়েছিল, কালী চোরাই মাছও কিনে নিতে পিছপা নয়। বলত, মাছের ব্যবসাটা দাঁড়িয়েই আছে নাকি চুরির ওপর। আমরা চুরি করলে দু' চার কেজি করতে পারি কিন্তু নাম বলতে চাই না, অনেক বড় বড় কাঁটাদার পুকুর চুরি করে নাকি লাল হয়ে যাচ্ছে।

এ সব কথায় বেশ উৎসাহ পেয়েছিল শিবু। তা দু' চার কেজি করে মাছ যদি আমি পাঠাই, নেবে ?

কালী হেসেছিল, শিবুদা, ধরা পড়লে কিন্তু ঠ্যাঙানির চোটে হাড় ভাঙবে। খুব গোপনে যদি পাঠাতে পারো, তাহলে দেখতে পারি।

শিবু বলেছিল মাছ যদি পাঠাই, আমার মেয়েকে দিয়ে পাঠাব। আপত্তি নেই তো ?

আপত্তির কি! তবে তোমার মেয়েকে বলে রেখ, ধরা পড়লে যেন আমার নাম না করে।

সে বলতে! শিবু হাসিকে পাঠিয়েছিল কালীর কাছে। একবারও তখন মাথায় আসে নি আগুনের কাছে ঘি পৌঁছে দিচ্ছে ও। যেন মতিভ্রমই হয়েছিল ওর।

রাগে এখন মাথার ভেতর কেমন দপদপ করে। নিজের ভুল, নিজেকেই খেসারত দিতে হচ্ছে যেন।

আশ্চর্য, কালী কাঁটাদার যে পালিয়ে যেতে পারে এটা ওর মাথাতেই আসে নি কোনদিন। হাসির পেটে তোর বাচ্চা, আর তুই সেই বাচ্চাকে ফেলে পালিয়ে যাবি! রাগে চোয়াল শক্ত হয়ে ওঠে আবার। শিবু বিড়বিড় করে বলে, ওকে পেলে আমি দু' টুকরো করে ছাড়ব। শালা—

শিউরে উঠেছিল হাসি, না বাবা, অমন বলো না।

বলব না! শালার যদি আমার হাতে মৃত্যু না হয়েছে তো কি বললাম।

হাসি মুখ চেপে ধরে শিবুর, হয়তো সত্যি সত্যি ও কোন কাজে আটকে গেছে গো, কিংবা অসুখ বিসুখও তো হতে পারে।

শিবু রাগে মোচড়াতে থাকে। আর তোকেও বলি, বদমাসটার

হাতে তুই নিজের সব কিছু দিলি? একবার বিচার করে দেখলি না ছোঁড়াটাকে!

বারে, আমার কি দোষ। তুমিই তো বললে ওর কাছে যা।

আমি কি তোকে ওভাবে যেতে বলেছিলাম। যা, আমার চোখের সামনে থেকে যা। সারা হরিণচকে ঢি ঢি পড়ে গেছে তোর নামে, বুঝিস না?

হাসি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে।

শিবু হাত পা ছুঁড়ে আরো কিছু কথা শোনায় হাসিকে। তারপর একসময় কেমন ঝিমিয়ে পড়ে। একটা বিড়ি ধরায়।

বাপ বেটিতে ওইভাবে অনেকক্ষণ কেটে যায়। একসময় হাসিই আবার বলে, একবার আমাকে ক্যানিং নিয়ে চল না বাবা। ক্যানিং গিয়ে ওই নামে খোঁজ করলে কি পাওয়া যাবে না ওকে। ক্যানিংয়ে ওর বাবা নাকি এককালে খুব বড় কাঁটাদার ছিল। ওখানে চল না ওদের খোঁজ করি।

শিবু হাসির দিকে তাকায়, ক্যানিং কি এখানে? জানা নেই শোনা নেই ওখানে তোকে নিয়ে কোথায় উঠব! যাব বললেই যাওয়া যায় না।

হাসি কাঁদো কাঁদো গলায় বলল, আমি একবার ওর মুখোমুখি দাঁড়াতে পারলে কিন্তু আর ও পালাতে পারবে না।

শিবু বলল, ঠিক আছে আমিই যাব। বলছিস যখন আমি একাই একবার ঘুরে আসব।

আমাকেও নিয়ে চল না বাবা?

মাথা খারাপ, কোথায় হরিণচক আর কোথায় ক্যানিং। আমি যেখানে-সেখানে দরকার হলে রাস্তাঘাটেও পড়ে থাকতে পারি, কিন্তু তোর এই শরীর নিয়ে কোথাও যাওয়া ঠিক হবে না। আমি যদি পাই ওকে, ঘাড় ধরে নিয়ে আসব।

শিবু বলল বটে, তবে এই হরিণচকের বাইরে খুব বেশি একটা বেরয় নি ও। ক্যানিং শহরে সেই ছেলেবেলায় একবার গিয়েছিল, সেই ক্যানিং কি এখনো সে রকমই আছে! কে জানে!

শেষটায় ক্যানিংয়ে যাবে বলেই ও লঞ্চঘাটে এসে হাজির হল।

না, ঝুপড়িগুলোতেও আর ঢুকতে ইচ্ছে করল না। কি হবে ওখানে ঢুকে! ওরা কেউ বুঝবে না শিবুর মাথার ভেতরে কি রকম ফাঁকা মাঠের মতো শূন্য হয়ে আছে। সবাই কেমন নিজেদের নিয়েই ব্যস্ত। কেবল নিজেরটা হলেই হল।

লঞ্চঘাটের বাঁশের জেটিতে অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে রইল শিবু। জেটির গায়ে বড় বড় দু' তিনটে নৌকো বাঁধা। বিকেলের আগে লঞ্চ আসার কথা নয়। নৌকোগুলোরও তাই যেন দুশ্চিন্তা নেই। লঞ্চ এলে যাত্রী নামার জন্য জায়গা ফাঁকা করে দিতে হবে ওদের।

একটু অন্যমনস্কই হয়ে পড়েছিল শিবু। হঠাৎ চমকে উঠল, হিমির গলা, ও মাগো, ওখানে দাঁড়িয়ে কি করছ গো শিবুদা?

শিবু তাকাল। ঝুপড়ি ছেড়ে প্রায় জেটির নিচ অবধি এগিয়ে এসেছে মেয়েটা। কপালে ডগডগ করছে সিঁদুর। পরনে আকাশি রংয়ের নাইলন শাড়ি।

শিবু বলল, এমনি দাঁড়িয়ে আছি। দেখছি।

কি দেখছ শিবুদা? অমন শুকনো শুকনো লাগছে কেন গো তোমাকে?

শিবু বলল, মন ভাল নেই, এমনি দাঁড়িয়ে আছি।

মন ভাল নেই তো, ওখানে কেন, ঘরে এসো। একটু গপ্পসপ্প করে যাও না, ভাল লাগবে।

ততক্ষণে ঝুপড়ির পাশ থেকে উঁকি মেরেছে ময়না। ও মাগো এই দুপুরে শিবুদা নাকি গো! ও হিমি, কি হয়েছে লা?

শিবু দেখল ময়নাকে। ভাল গান গায়। চন্দ্রমুখী সিনেমা হলে যত হিন্দি বই হয়েছে, সবগুলোর গান ও দারুণ নকল করে শোনাতে পারে। কিন্তু এ সময় কাউকেই ভাল লাগছিল না শিবুর।

ও শিবুদা, একটু এসো না। তোমার মন খারাপের কথা শুনলে আমাদেরও মন খারাপ হয়ে যায় গো।

মেয়েগুলো নছল্লা জানে। প্রথম দিকে যত আকর্ষণীয় মনে হত

ওদের, এখন আর তা হয় না। তবু এমন করে কেই বা ওকে ডাকে। বউটা যদি বেঁচে থাকত, তাহলে সুখদুঃখের দুটো-চারটে কথা বলে সময় কাটান যেত। বউটা যদি বেঁচে থাকত, তাহলে হাসির কি এমন হয়! সবই ওর কপাল।

কিন্তু কি আশ্চর্য, ঝুপড়িগুলোয় ঢুকব না ঢুকব না করেও শেষটায় জেটি থেকে নেমে ও হিমির ঘরে ঢুকে পড়ল।

কি হয়েছে গো শিবুদা? বস তো একটু।

শিবু বলল, কি আর হবে, কপালে কিছু দুর্ভোগ লেখা ছিল তাই ভোগ করতে হচ্ছে।

স্বল্প পরিসর ঘরে আসবাব বলতে প্রায় কিছুই নেই। বেড়ায় দড়ি ঝোলানো, তাতে খানকয়েক শাড়ি আর সায়া ঝুলছে। ওদিকে দেয়ালে গোজা ছোট একটা আয়না। উলটো দিকে মেঝেতে হোগলার ওপর একখানা বিছানা পাতা। তেলচিটে বালিশ গোটা কয়েক।

হিমি এগিয়ে এসে হাত ধরল শিবুর, বস না শিবুদা। কি হয়েছে বলবে তো?

ততক্ষণে আরো কয়েকজন ঢুকে পড়েছে হিমির ঘরে। অ্যাঁ, কি হয়েছে রে হিমি?

কি জানি, কিছুই বলছে না। হিমি গা ঘেঁষে বসে শিবুর।

শিবু বলল, আমার মেয়েটা একটা কেলেঙ্কারি করে বসেছে। কথাটা শুনে অবধি মাথা ঘুরছে আমার।

কি কেলেঙ্কারি? মাসিও এগিয়ে এসে বিছানায় বসে পড়ে।

পেট বাঁধিয়ে বসেছে।

ও মাগো, তাই নাকি! তা, হীরের টুকরো মানুষটা কে গো?

শিবু একবার মাসির দিকে তাকায়, ওদের মুখেই ও রকম কথা শোভা পায়। অন্য কেউ হলে ঠাস করে গালে একটা চড় বসিয়ে দিত।

তোমার জানাশোনা কেউ? জানাশোনা হলে গলায় ঝুলিয়ে দাও না, আমরা একদিন ভালমন্দ খাই।

শিবু বলল, বাজারেরই একজন। সে শালা কম্ম করে দিয়ে বাজার

ছেড়ে পালিয়েছে।

ও মাগো, কোথায় পালাল? হিমির চোখে বিস্ময়।

শিবু একবার ভাবল, কালী কাঁটাদারের নামটাই বলে দেয়, কিন্তু পরক্ষণেই মনে হল, না এখুনি সব ফাঁস করা ঠিক হবে না। কালী কাঁটাদারের কাছে গভীর রাতে হাসি যে চোরাই মাছ বিক্রি করতে যেত, সেটা তাহলে এখনি ফাঁস হয়ে যাবে। আর তার ফলে আরো এক ঝামেলায় পড়তে হবে ওকে।

ঝেড়ে কাশছ না কেন গো? বেলা এগিয়ে এসে একবারে প্রায় ওর কোলের ওপরই বসে পড়ে। মেয়েটার পরনে কেবল সায়া আর ব্লাউজ। হয়তো দুপুরে পেটপুরে খেয়ে ঘুম লাগিয়েছিল। দিনে না ঘুমুলে তোবড়ান গাল ফুলে নিটোল হয় না।

শিবু একটু সরে বসে। ঝেড়ে কাশার কি আছে, মেয়েটাকে নিয়ে ঝামেলায় পড়েছি, তাই বললাম।

তা অত বড় ধিঙ্গি মেয়ে পরের কাছে রাখবে, হবে না? মাসি খানিকটা অভিভাবকের মতো কথা বলে।

শিবু আবার মাসির দিকে তাকায়। গোলগাল ভারী চেহারা। মুখের চামড়ায় অসংখ্য ভাঁজ, গলায় কিতকিত করছে ঘাম।

মেয়েকে কেন দাদার কাছে রেখেছি, তা আমিই জানি। পড়ে পাওয়া জমিতে ঘর তুলেছ, তোমরা বুঝবে কি করে!

হিমি হাসে, তা যা বলেছ গো শিবুদা। তবু এই আঘাটায় এসে বসেছিলাম বলে না তোমাদের সঙ্গে আলাপ হল।

শিবু বুঝতে পারে না, হিমি ঠাট্টা করছে কিনা! বলল, আসলে মেয়েটাকে যদি ওখানে না রাখি, তাহলে আমার সব যেত। আমার দাদাকে আমিই চিনি।

বেলা একটা হাত তুলে দিল শিবুর পিঠে, একবার বল না গো, তোমার দাদাকে এক হাত দেখে আসি।

শিবু হাতটাকে ঝটকা দিয়ে সরিয়ে দেয়, কি দেখবে?

পুরুষ মানুষের আমরা যা যা দেখি, সব দেখব। আদেশ কর

না একবার, দেখে আসি কত বড় হিম্মতদার মানুষ !

মাসি ধমকে ওঠে, তুই থামবি। তুই কেন ঘুম থেকে উঠে এলি না ? কেবল বকবক করা স্বভাব।

শিবু বলল, দাদার পেছনে লাগতে যেও না, তোমাদের এখান থেকে উঠিয়ে ছাড়বে।

তাই নাকি গো শিবুদা, অনেককেই তো ওঠাতে দেখলাম। এখন বাকি বুঝি তোমার দাদা !

শিবু বলে, আমি উঠি। ওঠবার চেষ্টা করে শিবু। কিন্তু উঠব বললেই যে এখান থেকে ওঠা যায় না, শিবু তা ভালই জানে। হিমি ওকে একরকম প্রায় জড়িয়েই ধরে, মাথা গরম করো না তো শিবুদা। তুমি বস।

তারপর মাসির দিকে তাকিয়ে একরকম প্রায় খেঁকিয়ে উঠল, তোমরা যাবে ? শিবুদাকে আমি ঘরে এনেছি, তোমরা ফোটো দেখি।

ও মাগো, কত রস মেয়ের ! এই চলরে, শিবুদাকে ও ঘরে এনেছে, চল।

বলতে বলতে উঠে দাঁড়ায় বেলা। চোখে চিকচিক করে রসিকতা।

হ্যাঁ, তোমরা বিদেয় হও দেখি, শিবুদার সঙ্গে আমার কথা আছে।

মাসিও উঠে দাঁড়ায়। সেই ভালো, শিবুবাবুকে একটু আলাদা থাকতে দে, তোরা চল। এই সোনা, কি দেখছিস, ওঠ।

ওরা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে। হিমি উঠে গিয়ে দরজায় ঝাঁপ লাগায়। না লাগালেও চলে এসময়, তবু এমন ভাব দেখায় যেন ওর সম্পত্তিতে আর কেউ যাতে হাত লাগাতে না পারে সেই ভেবে ও ঝাঁপ লাগাল।

শিবু পাথরের মতো জমে বসেছিল। লঙ্কাঘাটার এই ঝুপড়ি ওর বড় নিশ্চিন্তের জায়গা। কত রাত এই ঝুপড়িতে এসে কাটিয়ে গেছে ও, তার হিসেব নেই। ঘরটা ফাঁকা হয়ে যেতেই একটা বালিশ টেনে নিয়ে কাত হয়ে পড়ে ও।

হিমি এগিয়ে আসে। ঠিক ওর পাশটিতেই বসে পড়ে, হাত

বিছিয়ে দেয় ওর গায়ের ওপর, বেলার কথায় তুমি রাগ করনি তো শিবুদা? ওটা অমনি। ধরাকে আজকাল ও সরা জ্ঞান করছে।

শিবু হাসে, না-না মনে করার কি আছে। আমি কি চিনি না নাকি?

বুকের কাছে কয়েকটা ঘামাচির মতো। হিমি নখ দিয়ে গেলে দেবার চেষ্টা করে, একটা কথা শুনবে শিবুদা?

কি?

আমাকে সব ভেঙে বলবে?

কি বলব?

শিবুর চুলে আঙুল বোলাতে বোলাতে হঠাৎ একটা পাকা চুল তুলে আনে হিমি।

তোমার মেয়ের কথা শুনে সত্যি সত্যি মন খারাপ হয়ে গেল। আমরা তো কোনদিন স্বামীর সুখ পাব না, আমাদের কি! কিন্তু তোমার মেয়ের কেন অমন হল গো?

শিবুর বুকে যেন পাথর ভাঙে কেউ। শিবুর এসব কথা শুনলে কান্না পায়। হাঁ করে তাকিয়ে থাকে ও হিমির দিকে। হিমির চোখে সত্যি সত্যি কি যেন এক যাদু আছে।

বল না গো, সত্যি সত্যি কি হয়েছে?

বললাম তো, মেয়েটাকে নিয়ে মহা বিপদেই পড়ে গেছি। আর কি বলব?

হিমি নিজের নরম বুক চেপে রাখে শিবুর গায়ে, লোকটা কে গো? তুমি একবার বলে দেখ না, কেমন হিড়হিড় করে টেনে আনি।

শিবু হাসে, সেটা আমিই পারতাম, কিন্তু পাখি পালিয়েছে। একটু আগে যদি টের পেতাম, তাহলে কিছু ব্যবস্থা করা যেত।

হিমি বোঝে, লোকটার নাম বলবে না শিবুদা। কি জানি, কেন বলবে না! কিছুক্ষণ নীরবতার মধ্যে কেটে যায়। আরো দুটো পাকা চুল খুঁজে খুঁজে বার করে হিমি। তারপর শিবুর বাহুর ওপর নিজের গালটা পেতে রেখে বলে, আসলে কি জানো শিবুদা, গোড়াতেই তুমি

ভুল করে বসেছ।

শিবু কিছুটা যেন চমকে ওঠে, কি ?

তোমার উচিত ছিল আর একটা বিয়ে করা। মেয়েটাকে তাহলে নজরে রাখতে পারত।

কি উত্তর দেবে ভেবে পেল না শিবু। গা হাত পা এলিয়ে পুরোপুরি শুয়ে পড়ল বিছানায়।

শুয়ে পড়ল হিমিও।

শিবু একটা হাত তুলে দিল হিমির গায়ে, কে মেয়ে দেবে আমাকে ?

হিমি ওর হাতটা টেনে নেয়, মেয়ের অভাব নাকি গো শিবুদা। ভাত ছড়ালে কাকের অভাব হয় ?

শিবু হাসে, হয়। কাকেদেরও জ্ঞানগম্যি হয়েছে আজকাল।

হিমি স্তব্ধ হয়ে থাকে। বেশ কিছুক্ষণ দুজনেই কেমন অনড় পুতুল। পরে শিবুই এক সময় বলে, একটু জল খাওয়াতে পারো ?

হিমি উঠল, ঘরের এক কোণে কুঁজো। গ্লাসে জল ঢালল হিমি। গ্লাসটা এগিয়ে আনতে আনতে বলল, সত্যি বলছি শিবুদা, তুমি একা থাক বলেই অত ভেবে মর। তোমার ভাবনাটা আমাকেও ভাবতে দাও না গো।

কথাটা শুনতে খারাপ লাগে না শিবুর। কিন্তু—

হিমি আবার ওর বুক ঘেঁষে এগিয়ে আসে, গায়ে ওর হাত বোলাতে শুরু করে। শিবু বোঝে, ওর বুকের ভেতরটা যেন জুড়িয়ে যাচ্ছে। আর নড়তে পারে না ও।

বারো

রাত তিনটে বাজতে না বাজতেই ভাইদার ডাকাডাকি শুরু হয়ে গেল। বাজারে আজ মাছ পাঠাবার কথা। শতীশ কাঁটাদারকে সে রকমই বলে রাখা হয়েছে। কিন্তু মাছ পাঠাব বললেই তো আর পাঠান

যায় না। মাছ পাঠাবার হেপা অনেক। স্লুইস গেটের কাছে সরু খালের মতো, তার মুখে পইনা বসিয়ে রাখা আছে। জলের টানে একই মাপের বাগদা এসে সারা রাত জমা হবে ওখানে। জড় হওয়া সেই মাছ তুলতে হবে। সাইজ করতে হবে। তারপর চাঙারিতে তুলে পাঠাবার ব্যবস্থা করতে হবে।

পইনার মুখ থেকে মাছ তোলার কাজ জিমনিদের। তাই জিমনি ব্রজলাল আর কিশোরীরই সবচেয়ে আগে ওঠা দরকার। ভাইদা একরকম প্রায় টানাটানি করেই ওদের তুলে দিল, আরে এই নবাব-পুত্তুর উঠবি না?

ভাইদার চেঁচামেচিতে না উঠে আর উপায় কি! উঠতেই হল ওদের।

বিষ্টু, ভোলা আর বিনোদের ওপর দায়িত্ব পড়েছে বাজারে মাছ পৌঁছে দেওয়ার। ফলে আজ আর ওদের টং পাহারায় রাখা হয় নি। সারা রাত প্রাণ ভরে ঘুমুতে পেরেছে বিনোদ। কিন্তু ঘুমের রেশটা এখনো চোখ থেকে পুরোপুরি উবে যায় নি। তবু উঠে পড়তে হল। উঠে ঘরের বাইরে বাঁশের মাচায় একটু বসল। হালকা শির-শিরে বাতাসটা ভারী মিষ্টি লাগল ওর।

ততক্ষণে ব্রজ আর কিশোরী স্লুইস গেটের কাছে এগিয়ে গেছে। এ সময় টর্চ না হলে চলে না। মাঝেমাঝে সাপ এসে ভিড় করে ওখানটায়। মাছ খেয়ে পেট ফুলিয়ে পড়ে থাকে। অবশ্য সবই নির্বিষ জলঢোঁড়া। কামড়ালে মানুষ মরে না। তবু, জলে নামবার আগে একটু সাবধানে দেখে নিতে হয়।

বিষ্টু ঘুম থেকে উঠেই গত রাতের মেয়েগুলোর প্রসঙ্গ তুলে বসল, হ্যাঁরে ভোলা, রাতে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখিস নি তো ওদের?

কাদের?

সেই যে হিমি, বেলা আর লম্বুটা। কেমন পাছা দোলাচ্ছিল বল?

মনে লেগেছে দেখছি। হাসে ভোলা।

মনে লাগার কথা না, আচ্ছা কোত্থেকে ওরা এখানে এসে জুড়ে বসল বল দেখি!

জিজ্ঞেস করলেই তো পারিস। যা না, খুব আদর করবে তোকে। কোলে বসাবে।

ধ্যাত! যাওয়া না যাওয়া তো পরের কথা। কিন্তু ভাবতে কেমন লাগে না, কোত্থেকে হঠাৎ এসে ওরা জুড়ে বসল।

ভাইদা আবার তাড়া লাগায়, কিরে তোদের হ'ল? এরপর ভোর হলে যাবি নাকি? পাঁচটা বাজতে না বাজতেই কিন্তু শেষ লরি ছেড়ে যাবে। তখন মাছ কিন্তু তোদের মাথায় ঢালব।

আবার গা ঝাড়া দিয়ে ওঠে ওরা। চাঙ্গারি বিড়ে আর দড়িদড়া নিয়ে এগিয়ে যায় ব্রজর কাছে। জাল টেনে মাছ তুলে চাঙ্গারি বোঝাই করতে আর কতক্ষণ।

দুটো চাঙ্গারি পুরো বোঝাই হতেই ভোলা বলল, এ যা তোলা হয়েছে, এতেই পাঁচ মণ ছাড়িয়ে যাবে গো।

তোর মাথা খারাপ। বড় জোর আড়াই তিন মণ হতে পারে। এর মধ্যে সবই যে বাগদা তাতো নয়, পার্সি-ট্যাংরাও কম নেই।

অনুমানেই একটা ওজন ঠিক করে নেয় ওরা। তারপর তিন চাঙ্গারিতে মোটামুটি প্রায় সমান করে ভাগ করে ফেলে।

ভাইদা বলে, সকালে একবার আমি সতীশের কাছে যাব, বলে দিস। আর মাছের ওজনটা যেন লিখে দেয়।

ভোলা বলল, ও তোমায় ভাবতে হবে না গো। আমি ঠিক নিয়ে আসব।

দুর্গা দুর্গা করে ওরা বেরিয়ে পড়ে। হঠাৎ ওপাশের টং থেকে টর্চের আলো ছিটকে আসতেই বিনোদ বুঝল, বলাইয়ের টর্চ। সঙ্গে সঙ্গে হাঁক পাড়ল, ঘুমিয়ে টর্চ মারছ নাকি গো?

ওপাশ থেকে উত্তর আসে, হ্যাঁ রে সম্বুদ্ধি। সাবধানে যাস।

মাছের ঝুরি মাথায় চাপাতেই ঝরঝর করে গায়ে জল পড়ল বিনোদের। বাজারে মাছ পৌঁছে দেওয়ার পর সারা গায়ে মাছের গন্ধ

হয়ে যাবে। ফিরে এসে জলে ডুবিয়ে ডুবিয়ে গায়ের গন্ধ ছাড়াতে হবে।

জোরে জোরে পা ফেলতে শুরু করে ও। ভোলা আর বিষ্টু পেছনে। খানিকক্ষণের মধ্যেই হাত পঞ্চাশেক পিছনে পড়ে গেল ওরা। মাথার বোঝাটা যেন বিরাট একটা পাথরের মতো চেপে বসেছে। ঘাড় ঘোরাবার উপায় নেই বিনোদের। অথচ ভেড়ি থেকে নদীর দিকটা এখন দেখার মতো। চাঁদের আলোয় নদী যেন ঢেউ খাওয়া রূপোলি পাত।

দৌড়তে দৌড়তে আলা ছাড়িয়ে ওরা অনেক দূর অবধি এগিয়ে এল। নদীর উল্টো দিকের ঢালে ফাঁকা মাঠের একপাশে কুণ্ডুদের ইটের পাঁজা। কুণ্ডুরা বাড়ি করবে বলে মাটি কেটে ইট পুড়িয়েছিল। কিন্তু মাঝপথে কেন যে তা বন্ধ হয়ে গেল, কেউ জানে না। জায়গাটা খানা খন্দে ভরা। কিছু পোড়া, কিছু আধ পোড়া ইটের স্তূপ। আবছা অন্ধকার আর চাঁদের আলোয় ভারি অদ্ভুত দেখাচ্ছিল সব। অবহেলায় পড়ে থাকা জমিতে কাঁটা ঝোপঝাড়েরও অভাব নেই।

বিনোদের চোখে পড়ল জায়গাটা। পিছন দিকে তাকালে ও দেখতে পেত, জলকরের আলাটা এখন চোখের বাইরে চলে গেছে। দেখা যায় কি যায় না, এমন ভাব।

আরো কিছুদূর হাঁটল, তারপর একবার একটু গলা তুলে ভোলার নাম ধরে ডাকল, কি রে ভোলা, আসছিস তো?

কিন্তু সাড়া নেই। ওরা কি অনেক পিছিয়ে পড়ল! অত পেছবার তো কথা নয়, কেমন একটু সন্দেহ হয় বিনোদের। আবার ডাকল, কি রে বিষ্টু? আসছিস তো?

নাহ্, এবারও সাড়া নেই। ফলে একটু দাঁড়াতেই হল ওকে। এই নির্জন বাঁধের ওপর এই রাতে একা একা চলাটা ঠিক নয়। ধীরে ধীরে একটু পেছন ঘোরার চেষ্টা করল, আর ঠিক এই সময় তীব্র টর্চের আলো পড়ল ওর চোখে। ধাঁধিয়ে গেল চোখ।

কে? আঁতকে উঠল বিনোদ।

তোর বাপ রে হারামজাদা, মাল নামা আগে।

বিনোদের পা কাঁপতে শুরু করল। চিৎকার করে উঠল বিষ্টুর নাম ধরে, বিষ্টুরে—

চোপ শালা। কে যেন একটা লাঠি দিয়ে খোঁচা মারল ওর পেটে। আর সঙ্গে সঙ্গে ওর মাথায় বসানো ঝুড়িটা টলে উঠল, প্রায় পড়েই যাচ্ছিল। এমন সময় ঝট করে পেছন থেকে দু'জনে ওটাকে ধরে নামিয়ে ফেলল।

এটা কি হচ্ছে? বাধা দেয় বিনোদ।

ভাগ শালা। ঘুরে পেটে একটা লাথি কষিয়ে দিল একজন।

লাথি খেয়ে উলটে পড়তে পড়তে বিনোদ দেখল, ঝুড়িটা ততক্ষণে ওদের মাথায়।

কিন্তু এভাবে কিছুতেই ছেড়ে দেওয়া যায় না। আবার উঠে এগিয়ে আসে বিনোদ। আর ঠিক এই সময় দড়াম করে ওর মাথার ওপর একটা লাঠির ঘা। লাঠি, না আকাশ থেকে একটা বাজ পড়ল ওর মাথায়। চাঁদিটা যেন ফেটে চৌচির হয়ে গেল।

বাঁধ থেকে নদীর দিকে আছড়ে পড়ল বিনোদ। মুহূর্তের মধ্যেই চোখের ওপর ভেসে উঠল অসংখ্য লাল লাল বিন্দু। ফুলঝুরির মতো। জলকরের জলে টর্চের ফোকাস মারলে চিংড়ির চোখগুলি যেমন চাক ভাঙ্গা মৌমাছির মতো ছড়িয়ে পড়ে, ঠিক তেমনি। চারপাশে যেন অসংখ্য বিন্দু বিন্দু আলোর কণা ছড়িয়ে পড়েছে।

আরো কিছুক্ষণ পর ও টের পেল, ওর লোহা-পাথরের মতো শরীরটা যেন নদীর ঢালে নরম কাদার মধ্যে ধীরে ধীরে ডুবে যাচ্ছে। আর ধারেকাছে তখন এমন একজনও নেই যে ওকে খানিকটা উঠতে সাহায্য করে। ধীরে ধীরে চৈতন্য হারিয়ে ফেলল বিনোদ।

আর ওদিকে তিনটে মাছের ঝুড়িই তখন বাঁধের ওপর থেকে নামিয়ে মাথায় তুলে নিয়েছে জনা চারেক লোক। ইটের পাঁজার কাছাকাছি আরও দু'একজনকে দেখা গেল। হ্যাঁ, সেই ডুমো ডুমো তামাটে চুল, মামু ছাড়া কারই বা অমন চেহারা।

মামুই চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলছিল, এদিকে আয়, এদিকে। মামুই নির্দেশ দিচ্ছিল সবাইকে।

গোটা কয়েক ইটের পাঁজার ধার ঘেঁষে ওরা মাছের ঝুড়িগুলোকে ধপাস করে নামাল।

তারপর এপাশ-ওপাশ একবার ভাল করে তাকিয়ে নিল মামু। সবাই এসেছে তো? এই দেবু, পচা এসেছে, পচা?

দেবু বলল, হ্যাঁ, ওই তো! কিন্তু আমাদের সাড়া পেয়েই পেছনের লোকদুটো মাছের ঝুড়ি ফেলে পালিয়েছে। খবর হয়ে যাবে গো।

কোন দিকে পালাল, পা ভেঙ্গে দিতে পারলি না? রাগে গড়গড় করতে থাকে মামু।

ভেড়ি ধরে ওরা এমন ছুট লাগাল যে, কিছু করার আগেই মুঠোর বাইরে চলে গেল। আর একটা যে ছিল, সেটাকে তো গাঙের দিকে ছিটকে পড়তে দেখলাম গো। হিঁ হিঁ করে হেসে উঠল পচা।

দেবু বলল, ওটা বোধহয় শেষই হয়ে গেছে। ওর মাথা যদি চার টুকরো না হয়ে থাকে তো কি বললাম। এয়সা ঘা লাগিয়েছি, যদি বেঁচে থাকে সারাজীবন মনে রাখবে!

তোদের চিনতে পারে নি তো?

মাথা খারাপ, কার বাপের সাধ্যি চিনবে। ও তুমি কিছু ভেব না মামু।

মাছের ঝুড়ি একপাশে সরিয়ে রাখে ওরা। জব্বর বাগদা। বিড়ি ধরায় পচা।

ফস ফস করে দেশলাই জ্বালাবার কি হল? যতক্ষণ না এগুলো পাচার হচ্ছে ততক্ষণ বিড়ি না খেলে চলে না? মামুর গলায় ঝাঁজ।

দেবু হাসে, বিড়িটা একবার এদিকে দিস রে পচা। ধরিয়েই যখন ফেলেছিস।

মামুর অস্থির ভাবটা কাটতে চাইছে না। এদিক-ওদিক পায়চারি করল কয়েকবার। মাছ তো এখন হাতের মুঠোয় কিন্তু শালা রাম সিংই না শেষপর্যন্ত ডোবায়।

লরি ড্রাইভার রাম সিংয়ের সঙ্গে কথা হয়ে আছে, জঙ্গলের ধারে এসে লরি থামিয়ে মাছ তুলে নেবে। বখরা সমান সমান।

দেবু শুধাল, রাম সিং আসবে কিনা সন্দেহ আছে। সেদিন কিন্তু ওর কথা আমার ভাল লাগেনি মামু?

কেন?

কেন কি! চোরাই মালের কথা শুনে কেমন নছল্লা শুরু করেছিল দেখনি?

মামু একটু গম্ভীর হয়। দে, আমাকে একটা বিড়ি দে। দেশলাই জ্বালিয়ে মামুও বিড়ি ধরায়। মনে পড়ে, রাম সিংকে নিয়ে ওরা নদীর ধারে এসে কথা সেরে নিয়েছিল, এ রামু ভাই, রোজ রোজ তো মাছ নিয়ে কলকাতা যাও, আমার কিছু মাছ নিয়ে যাবে?

রাম সিং চোখ বাঁকা করে তাকিয়েছিল, কা মছলি?

মাছ বলতে তো একটাই। বাগদা।

আচ্ছা! বিস্ময়ে তাকিয়েছিল রাম সিং।

বিক্রি করতে পারলে যা পাবে তিন ভাগ আমার, একভাগ তোমার।

চোরাই মালে তো ওরকম রেট হয় না বাবুজী। আধা তোমার, আধা আমার।

চোরাই মাল কে বললে?

চোরাই না হলে কাঁটাদারকে দাও। পুরা মিলেগা, বখরা কেন?

মামু ওকে চা খাইয়ে তোয়াজ করল, ঠিক আছে আধাই দেব।

কব মিলে গা?

কালই। শেষ রাতে মাল নিয়ে আমরা জঙ্গলের ধারে থাকব। তোমার হর্ন শুনলেই মাল তুলে দেব লরিতে। পাক্কা কথা তো?

পাক্কা। হাতে হাত মিলিয়েছিল রাম সিং।

কিন্তু এতক্ষণেও শালার দেখা নেই। ডোবাবে না তো?

দেবু বলল, আমি একবার পাত্তা নিয়ে আসব মামু?

যাবি ? যা। অন্তত ব্যাপারটা বুঝে আয়। তারপর যা হোক কিছু করা যাবে।

দেবু সঙ্গে সঙ্গে জঙ্গলের মধ্য ঢুকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

মামু আবার একটা বিড়ি ধরায়। ভেতরে কেমন একটা অস্বস্তি। মাছের ঝুড়ি তিনটের কাছে উঠে এল, মাছের ঝুড়ি না টাকার ঝুড়ি! মুঠোর মধ্যে একটা বাগদা তুলে নিল, কয়েকটা মাছ সরিয়ে রাখতে হবে। সন্ধ্যায় খাওয়া যাবে। তাছাড়া ঘাটের মেয়েগুলোও মাছ-মাছ করে, ওদেরও খাওয়ানো যাবে।

চারপাশে ঝিমঝিম করছে অন্ধকার। বহুদূরে কোথায় যেন একটা কুকুর চেঁচাচ্ছে। কুকুর চেঁচায় কেন! কেমন সন্দেহ হয় মামুর। না, ঘাবড়ালে চলবে না। দেখাই যাক না কি হয়।

মাছগুলি নদীর ধারে নিয়ে গিয়ে কোন একটা নৌকায় তুলে ফেললে ভাল হত মামু।

কার নৌকোয় ?

আগে থেকে একটা নৌকা ঠিক করে রাখলে ভাল হত।

মামু দাঁত খিঁচিয়ে ওঠে, আগে তো বলিস নি, এখন বলে লাভ কি !

না মানে, তুমিই তো বললে লরি রেডি থাকবে। তাই আর নৌকার কথা বলি নি।

লরি তো রেডি আছেই। দেবু আসুক, দেখতে পাবি। তাছাড়া নৌকায় মাছ তুলে লাভটা কি হত ?

লাভ কি মানে! এই ভাবে দুশ্চিন্তায় কাটাতে হ'ত না। এতক্ষণে আমরা পালিয়ে যেতে পারতাম।

শোন কথা। মাছ নিয়ে না হয় পালালাম, কিন্তু ঝাড়বি কোথায়? এ মাছ তো দুপুরের পরেই পচতে শুরু করবে, তখন ? মাছ না হয় তোলা হয়েছে কিন্তু বরফ কোথায় পাবি ?

আবার কি একটা বলতে যাচ্ছিল পচা।

মামু বলল, বকবক না করে চুপ করে বসে থাক। দেবু এলেই একটা ব্যবস্থা হবে।

জঙ্গলের ভিতরে যে দিক দিয়ে দেবুর আসার কথা, সেদিকে খানিকটা এগিয়ে দেখল মামু। সামনে জঙ্গল আর নিস্তব্ধতা ছাড়া কিছুই নেই।

আবার ফিরে এল।

পচাই অনেকক্ষণ পর আবার কথা বলল, বুঝলে মামু, শিবু কিন্তু ঠিক খবরই দিয়েছিল।

কি ?

আজ ভোরে ওরা মাছ পাঠাবে কাঁটাদারের কাছে।

মামু ছোট্ট করে একটা শব্দ করে, হুঁ।

শিবুর মেয়েটাকে বাঁচাবার জন্য আমাদের কিছু দেওয়া উচিত মামু। বড় বিপদে আছে ও।

উচিত অনুচিত পরে ভাবিস। বললাম না, চুপ করে বসে থাক এখন। বকবক করিস না।

উত্তেজনায় আবার বিড়ি ধরায় মামু।

দূরে আবার কুকুর চেঁচাচ্ছে। কান পেতে থাকে ওরা।

আর এ সময় মনে হয়, কেবল কুকুরের চিৎকারই নয়, বহু দূর থেকে চাপা হৈ চৈয়ের শব্দও যেন ভেসে আসছে। একটু উঠে দাঁড়ায় মামু, এই—শুনছিস ?

সবাই কেমন ঝুঁকে এগিয়ে আসে।

হৈ চৈ হচ্ছে না ? শুনতে পাচ্ছিস ?

দেবুটা কি করছে কে জানে ! কারো ওপর যদি এতটুকু আর ভরসা রাখা যায়। এই পচা, একটু এগিয়ে দেখে আয়, কিছু বুঝতে পারিস কিনা।

পচা দু'এক পা করে ভেড়ির দিকে এগোয়। খানিকদূর এগিয়েই আবার দ্রুত ফিরে এল, যা ভেবেছিলাম তাই-ই।

কি ? মামুর মুখটা শুকিয়ে ওঠে।

পচা বলল, মশালফশাল জ্বালিয়ে ওরা এদিকেই ছুটে আসছে। জানাজানি হয়ে গেছে সব।

আমাদের এখানে তাহলে আর থাকা ঠিক হবে না। বুঝলে মামু, আমাদের গা ঢাকা দেওয়া উচিত।

চিৎকারটা ক্রমশ যেন বাড়তে থাকে।

মামু বলল, মাছগুলো কি হবে! ওই ঝুড়ি নিয়ে কোথায় যাবি?

বলো তো, রাম সিংয়ের লরির কাছে নিয়ে যেতে পারি।

যেমন বুদ্ধি। লরির কাছে এখন কত লোক জানিস?

তাহলে একটা কিছু তো করতে হবে! এভাবে দাঁড়িয়ে থাকলে ধরা পড়ে যাব যে।

চিৎকারটা অনেক কাছাকাছি এগিয়ে এসেছে। খানিকক্ষণের মধ্যেই ওরা এই জঙ্গলেও ঢুকে পড়তে পারে।

মামু ফ্যালফ্যাল করে তাকায়, আর সময় নেই, শেষপর্যন্ত দেবুটাই গোলমাল করে ফেলল দেখছি। এতক্ষণ হয়ে গেল, এর মধ্যে ওর আসা উচিত। রাম সিংয়ের দেখা না পাস, ফিরে আসবি তো। এইসব লোক নিয়ে কাজ হয়।

হঠাৎ বেশ দূরে ভেড়ির ওপর একটা লোককে মশাল হাতে ছুটে যেতে দেখা যেতেই সঙ্গে সঙ্গে শক্ত হয়ে উঠে দাঁড়ায় মামু।

এই পচা, এদিকে আয়, চাঙ্গারি ধর।

কি হবে?

এদিককার এই গর্তটায় ফেলে মাটি চাপা দিবি আয়। ঝুড়ি সমেতই মাটি চাপা দে। দাঁড়িয়ে রইলি কেন?

নষ্ট হয়ে যাবে যে?

শালা, এরপর তোকে যখন মাটিতে পুঁতে রাখবো তখন বুঝবি। আয়, হাত লাগা বলছি।

ঝুড়ি তিনটে টানতে টানতে একটা গর্তের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলল ওরা। তারপর ঝাপাঝপ মাটি ফেলতে লাগল ওপরে। শালা, আমাদের যখন ভোগে লাগবে না, কাউকেই দেব না।

একসঙ্গে সবাই মিলে মাটি, ইট ছুঁড়ে ছুঁড়ে চাঙ্গারিগুলোকে মাছ সমেত ঢেকে ফেলল। যেন কবর দিল বাগদাগুলিকে।

যা শালা, এবার কে খাবি খা! চল বে, পালা এবার।

তিন চারটে মশাল তখন একসঙ্গে ভেড়ি থেকে ইটের পাঁজার দিকে নামতে শুরু করেছে।

মামু এক চাপ থুতু ছেটাল কবর দেওয়া জায়গাটায়। তারপর আবার একটা হুমকি ছাড়ল, চল। দাঁড়াস না।

গভীর জঙ্গলের মধ্যে সাঁ সাঁ করে মিলিয়ে গেল ওরা।

তের

ওদিকে সারি-বাঁধা কাঁটাদারদের ঝুপড়িগুলোকে ঘিরে তখন মেলাই লোক, মেলাই ব্যাপারী। সোনার চেয়ে দামী বাগদা চিংড়ি নিয়ে তখন দক্ষযজ্ঞ শুরু হয়ে গেছে। আশপাশের জলকর থেকে মদ্দ জোয়ানরা চাঙ্গারি বোঝাই মাছ মাথায় চাপিয়ে ছুটতে ছুটতে আসছে। এদিক সেদিক ফড়ে-দালালের অভাব নেই। কাঁটায় তোলার জন্য চাঙ্গারি নিয়ে টানাটানি হুড়োহুড়ি। শেষরাতের এই কাঁটাদারদের বাজারের নিয়মকানুন সবই একটু আলাদা রকমের। সূর্য ওঠার আগেই 'টু-পাইস' কামিয়ে নিতে না পারলে চলে না কারো।

শেষরাতের ফুরফুরে বাতাসটা মাছের আঁশটে গন্ধে ভরে উঠেছিল। বাজারময় পায়ের নিচে ভিজে ভিজে মাটি। হাঁটতে চলতে পায়ের সঙ্গে চাপ চাপ মাটি উঠে আসে। কিন্তু কাদার কথা তখন কে ভাবে। কাঠের প্যাকিং বাক্সে বরফ চাপা দিয়ে মাছ ভরা হচ্ছে। হাতুড়ি পেরেকের শব্দ না বাঁশ পেটাপেটি, ঠিক বোঝা যায় না। ওদিকে বাজার থেকে শ'খানেক হাত দূরে সুরেশবাবুর বরফ কলের জেনারেটরের একটানা শব্দ ভেসে আসছে। কাঠের ভুষি জড়ানো বরফের চাঁই হুড়োহুড়ি করে এনে ফেলা হচ্ছে বাজারের মধ্যে। সব ব্যাপারেই কেমন ব্যস্ততা, কেমন যেন ঘোড়ায় জিন লাগিয়ে ছোটা।

এরই মধ্যে সতীশ কাঁটাদার বার বার ঘড়ি দেখছিল। অক্ষয়-বাবুদের জলকর থেকেও মাছ আসার কথা। অন্তত ভাইদা ওকে

কাল বিকেলে সেরকমই খবর পাঠিয়েছিল। কিন্তু কোথায় মাছ! ভোর হতে চলল, কোন খবরই নেই ওদের। মাছ যদি না পাঠাতে পারে খবরটা দিয়ে যাবে তো! মনে মনে বেশ বিরক্ত হতে থাকে সতীশ। কতক্ষণ আর লরিঅলাদের আটকে রাখা যায়! ড্রাইভার রাম সিং দু'বার এসে তাড়া লাগিয়ে গেছে, কা বাত সতীশবাবু? আর কতক্ষণ দাঁড়াব? জলদি কিজিয়ে না।

সতীশ কাঁটাদার ভুজুংভাজুং দিয়ে ঠেকিয়েছে ওকে। আরে সর্দারজী, এই তো হয়ে এল। চা-ফা খাও না, চা খেতে খেতেই বাকি মাল এসে যাবে।

রাম সিং বাধা দেয়, চায়ে তো বহুৎ পি লিয়া বাবুজী, আউর নেহি। আউর কিতনা পেটি হোগা?

কত আর, দু' তিন পেটি হতে পারে। আসলে কি জানো সর্দারজী, অক্ষয়বাবুদের মাল বলেই একটু দাঁড়াতে বলছি, নইলে আর—সতীশ জিগরী দোস্তের মতো হাসে।

রাম সিংহও সবই বোঝে। কার যে কোথায় নাড়া বাঁধা থাকে, সবই ওর জানা। একটানা বছরখানেক ধরে এ বাজারের সঙ্গে ওর যোগাযোগ। সব কাঁটাদারই ওর ভালরকম চেনা। ফলে আর কথা বাড়ায় না। তুলসী দাসের কাঁটার পাশে এসে একটা বেঞ্চিতে বসে পড়ে। এখান থেকে দূরে দীঘির পাড়ে ওর লরিটাকে দেখতে পায় ও। পাশেই একটা টেম্পো। টেম্পোতেও মাল তোলা হচ্ছে। বাগদা নয়, নানা জাতের পাঁচ মিশেলি মাছ। ও মাছে বরফ চাপাতে হয় না।

কিন্তু রাম সিংয়ের লরিতে উঠবে বাগদার পেটি। মাছের রাজা বাগদা। জলকর থেকে তুলেও ও মাছের তোয়াজ কত! কাঁটায় ফেলে ওজন করলেই কেবল চলে না। কাঠের বাক্সে ভর, বরফ চাপা দাও। প্যাকিং বাক্সের গায়ে আলতা তুলি দিয়ে লেখ, ওমুকের মাছ, অত ওজন, আরো কত কি! তারপর সেই প্যাকিং বাক্স নিয়ে রাম সিংকে ছুটতে হবে কলকাতার দিকে। সটান একেবারে বেলেঘাটার

কারখানায়। কারখানার গেটে এসে পৌঁছলেও ওর রেহাই নেই। মাল খালাস করে কাগজপত্র বুঝে নিয়ে বেরুতে বেরুতে আরো ঘণ্টা খানেক। অর্থাৎ দেড়টা তুটোর আগে কোনদিন যদি ও মুক্তি পায়!

ফলে এ বাজার থেকে মাছের পেটি যত তাড়াতাড়ি তোলা যায় ততই ওর সুবিধে। সকাল দশটার মধ্যে বেলেঘাটায় মাল নিয়ে পৌঁছতে না পারলে উপায় থাকে না। তার মানে, ভোর পাঁচটার মধ্যেই এই হরিণচক থেকে লরি স্টার্ট না করলে চলে না ওর।

বসে বসে একটা সিগারেট শেষ করে রাম সিং। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে ধীরে ধীরে নিজের লরির দিকে আবার এগোতে শুরু করে। আর এ সময় মামুর কথা মনে পড়ে। জঙ্গলের ধারে মাছ নিয়ে অপেক্ষা করবে বলেছিল। কি জানি সত্যি সত্যি যদি ওখানে দাঁড়িয়ে থাকে ওরা। চারপাশে একবার তাকাল, কিন্তু এদিকে কাঁটাদাররা ওর লরি না ছাড়লে ও যায়ই বা কি করে। মামুর মাছ আজ না হয় কাল নেওয়া যাবে কিন্তু কাঁটাদারদের সঙ্গে ওর রোজকার ব্যাপার।

এরই মধ্যে তুলসী দাসের কাঁটার সামনে আরো তু'-তিন চাঙ্গারি মাছ এল। মাছের চাঙ্গারি নামার সঙ্গে সঙ্গেই বেশ ভিড় হয়ে গেল জায়গাটায়। হবেই। চমৎকার সাইজের বাগদা। দেখলেই চোখ জুড়োয়। চার-পাঁচটাতেই এক কেজি না হয়ে যায় না।

এ মাছ যে হাঁসুয়া থেকে এলো তা বোঝাই যায়। হ্যাঁ, হাঁসুয়া থেকেই। হাঁসুয়ার সেক্রেটারি রাধা ঘোষকেও দেখা যাচ্ছিল। মাছের ফলনের জন্য একটা চাপা গর্বে যেন ফুলে ফুলে উঠছিলেন। ভাবখানা এরকম, আর কটা দিন যাক না, দেখিয়ে দেওয়া যাবে চিংড়ি কাকে বলে।

হাঁসুয়ার ব্যাপার-স্যাপারই আলাদা। মাছের ফলন বাড়াবার জন্য কলকাতা থেকে ইঞ্জিনিয়ার আনিয়েছে। ইঞ্জিনিয়ারদের তোয়াজ কত! আলাদা কোয়ার্টার, মোটা মাইনে, টি-এ, ডি-এ আরো কত সব।

সতীশ ভাবে, রাধা ঘোষের সঙ্গে একটু লাইন করে না নিতে পারলে আর চলছে না। অক্ষয়বাবুদের জলকরের যা হাল, তাতে

আরো দু-একটা নতুন ঘর না বাড়ালেই চলছে না ওর। কিন্তু লাইনটা যে কিভাবে করা যায় মাথাতেই আসছিল না। খানিকটা হতাশভাবেই সতীশ বাজারের পেছনে দেয়ালের মতো দাঁড়িয়ে থাকা নদীর বাঁধের দিকে তাকাল। ইরিগেশন ডিপার্টমেন্টের বাঁধ। এই বাঁধ ধরেই অক্ষয়বাবুদের জেলেদের আসার কথা। কতটুকুই বা পথ। এর মধ্যে কি এসে পড়া উচিত ছিল না ওদের! কেমন একটা দুশ্চিন্তাই হতে থাকে সতীশের। অন্য কোন জলকর হলে হয়তো অত মাথা ঘামাত নাও, নেহাত ভাইদার ব্যাপার বলেই। ভাইদার সঙ্গে মাখামাখিটা যেন একটু বেশিই হয়ে গেছে।

সতীশ একবার আড়মোড়া ভাঙে। আর এ সময় দেখতে পায়, চায়ের কেটলি হাতে ঢুলতে ঢুলতে এগিয়ে আসছে মুলো। প্যাঁকাটি চেহারা। একটা পা একটু ছোট। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে ঢেঁকির মতো হাঁটে বলেই ওর আসল নামটা কোথায় যেন হারিয়ে গেছে।

মুলোর অবশ্য সেজন্য কোন আক্ষেপ নেই। মিষ্টিমিষ্টি হাসে। হাসতে হাসতেই কাঁধে ঝোলান কাপড়ের ব্যাগ থেকে একটা মাটির ভাঁড় বার করে ফুঁ দিয়ে তার ধুলো ঝেড়ে নেয়, চা দেই? জিজ্ঞেস করে সতীশকে।

আমাকে নয় রে বেটা। রাম সিংকে দিয়ে আয়।

রাম সিং কোথায়? এপাশ-ওপাশ তাকায় মুলো। কিন্তু রাম সিংয়ের টিকিও চোখে পড়ে না।

সতীশও এপাশ-ওপাশ তাকাল। রাম সিংকে না দেখে বলল, চা দিতে হবে না। একটু কাজ করে দে দেখি। ভেড়ির ওপর উঠে একটু দেখে আয়, ওদের দেখা যায় কিনা।

কেমন অবাক হয় মুলো, কাদের গো? কাদের কথা বলছ?

ভাইদাকে চিনিস তো? অক্ষয়বাবুদের জলকরের ভাইদা।

মুলো বলল, ভাইদাকে না চেনার কি আছে! সবাই চেনে।

সেই ভাইদা মাছ পাঠাবে বলেছিল, কিন্তু এখনো ওরা আসছে না কেন, দেখে আয় না!

মুলো একটু এদিক-ওদিক তাকায়, আজ না পাঠায়, কাল পাঠাবে। এসব হচ্ছে কাজ এড়ানো কথা। সতীশ গলার স্বর পাল্টালো, তুই যাবি কিনা বল? না যাবি তো ভাগ এখান থেকে।

ফাই ফরমাস এটা সেটা খাটতেই হয় মুলোকে। নইলে কে খাবে ওর চা। বলল, ঠিক আছে, বলছ যখন দেখছি। চায়ের কেটলিটা তোমার এখানেই রেখে যাচ্ছি, একটু দেখ কিন্তু।

সতীশ বলল, যা।

মুলো ঢেকির মতো খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে পা ফেলে ভেড়ির দিকে এগিয়ে গেল। খানিকটা এগোতেই একটা নোংরা ফেলার জায়গা। একটা মরা কুকুর পড়ে আছে, বিটকেল গন্ধ। গ্রাহ্য করল না। আরো একটু এগিয়ে ভেড়ির গায়ে পা রাখতেই বুঝল, মাটি পেছল হয়ে আছে। প্রায় দশ পনের হাত উঁচু ভেড়ি। পিছলে না হাড়গোড় ভাঙে ওর। কোন-রকমে ঘাসের চাবড়া ধরে ধরে উপরে উঠে এল মুলো।

এ যেন আলাদা এক পৃথিবী। নদীর চেহারাটা যেন ছবির মতো। চোখ ফেরানো যায় না। আকাশে যে এই ভোর-রাতেও চাঁদ জ্বলজ্বল করছে টের পেল ও। নদীর জলে চাঁদের আলো সাঁতার কাটছে। নদীতে এখন ভাঁটা। জল অনেক নিচ অবধি নেমে রয়েছে। আর বাঁধের ঢালে থিকথিক করছে কাদা। সেই কাদায় কয়েকটা নৌকো কাত হয়ে পড়ে আছে। গেরাফি গাঁথা। ফলে জোয়ারে জল বাড়লেও নৌকোগুলো ভেসে যাবার উপায় নেই।

মুলো যতদূর চোখ যায়, ভাল করে একবার দেখে নিল। মানুষ-জন তো দূরের কথা, কাকপক্ষীরও চিহ্ন নেই।

ভেড়ি ধরে জলকরের দিকে এগিয়ে গেলে মাঝামাঝি পথে ডান দিকে বেশ জঙ্গল। জঙ্গলের দিকেই বেশ খানিকক্ষণ হাঁ করে তাকিয়ে থাকে মুলো। জঙ্গলটা বড় রহস্যময়। সাপ শেয়ালের আস্তানা। তেমন কিছু প্রয়োজন না পড়লে কেউ ওদিকে বড় একটা ঢোকে না। কিন্তু ওই জঙ্গলের মধ্যেই কুণ্ডুবাবুদের কয়েকটা ইটের পাঁজা এখনো পড়ে আছে। এতদিনে হয়তো ওসব পাঁজার গা ফুঁড়ে গাছও গজিয়ে গেছে।

নুলোর মনে পড়ে, বহুকাল আগে কুণ্ডুবাবুরা বাড়ি তৈরি করার জন্য ইট পুড়িয়েছিল ওখানে। বাড়ি তৈরির কাজও শুরু হয়েছিল। সবে ভিত তৈরি হয়েছে, এমন দিনে কুণ্ডুবাবু সাপের ঘায়ে মারা গেলেন। দৃশ্যটা এখনো ওর চোখের ওপর ভাসে। ছুটতে ছুটতে সাপে কাটা মড়া দেখতে গিয়েছিল নুলো। কত ওঝাবদ্যি, ঝাঁড়ফুঁক, হলুদপোড়া লঙ্কাপোড়া, মা মনসার গান, কিন্তু কুণ্ডুবাবু আর চোখ খুলে তাকান নি। শেষটায় তাঁকে কোরা ধুতি পরিয়ে কলার ভেলায় চাপিয়ে ঘটা করে নদীতে ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছিল। সেই কুণ্ডুবাবু কি এখনো ধূপধুনো জ্বলা কলার ভেলায় শুয়ে ভেসে ভেসে স্বর্গনরক করে বেড়াচ্ছে! কে জানে!

চোখ ফেরাল নুলো। নাহ্, এই ফাঁকা বাঁধের ওপর দাঁড়িয়ে থাকার মানে হয় না। এতক্ষণে ওর কেটলির চা বোধহয় জুড়িয়ে জলই হয়ে গেল। নুলো ভেড়ি থেকে নামার জন্য খানিকটা এগোতেই সরসর করে কি যেন একটা শব্দ।

চমকে উঠল নুলো। নদীর ঢালের দিকেই কি যেন একটা ছুটে যাচ্ছে বলে মনে হল ওর। কিরে বাবা! কি হতে পারে কুকুর শেয়াল হওয়া অসম্ভব নয়। কিন্তু যাই হোক, কৌতূহল মেটাবার জন্যই আবার ও একটু ঝুঁকে নদীর ঢালের দিকে তাকাল।

সামান্য দু-এক মুহূর্তের ব্যাপার। কাদায় আটকে থাকা ছই ঢাকা নৌকোটার দিকে চোখ আটকে গেল ওর। নৌকোটার পেছনে চকিতেই কে যেন গা ঢাকা দিল। কে রে বাবা, মাঝিফাঝি নয় তো! কিন্তু লুকোবে কেন!

নুলো একটু গলা তুলে জিজ্ঞেস করল, কে গো ওখানে? অ্যাঁ, শুনতে পাচ্ছ?

উত্তর নেই।

কি আশ্চর্য! স্বচক্ষে দেখলাম একটা মানুষ। উত্তর দেয় না কেন! আবার জিজ্ঞেস করে নুলো, নৌকার পেছনে কে গো? অ্যাঁ?

কিন্তু এবারও কোন উত্তর এল না।

তবে কি চোর ডাকাত নাকি! নুলোর সারা গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। এই নির্জনে ওর মতো একজন পঙ্গু মানুষের কি আর এগনো উচিত!

না বাপু, বাহাদুরি না দেখানই ভালো। নুলো বাজারের দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে চিৎকার শুরু করে দিল, সতীশদাগো, চোর, চোর। ও সতীশদা, চোর চোর।

চিৎকার করতে করতেই আবার থেমে গেল। নিজের চোখকেই যেন বিশ্বাস করা যায় না। নৌকার পেছন দিক থেকে একটা ছায়া মূর্তি হঠাৎ বেরিয়ে পড়ে কাদার ওপর দিয়ে ছুটতে শুরু করেছে। গায়ে মাথায় কাপড় জড়ানো। মেয়েমানুষ নাকি রে বাবা! কেমন গোল-মালে পড়ে যায় ও।

চোর চোর! আবার চেঁচাতে শুরু করে নুলো। ছায়া মূর্তিটা তীরের বেগে ছুটছে। আবছা আলো আর কুয়াশায় কেমন যেন দৃষ্টি-ভ্রম ঘটিয়ে দিচ্ছে। মাঝে মাঝে যেন চোখ থেকে হারিয়ে যাচ্ছে, আবার ভেসে উঠছে। ওই তো, ওই—চোর চোর।

উত্তেজনায় কাঁপতে শুরু করে নুলো। মূর্তিটা যেন শেষবারের মতো আবার একটু দেখা দিয়েই হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। আশ্চর্য! বেটা ছেলে না মেয়ে কিছুই বোঝা গেল না। লঞ্চঘাটের কোন অপ্সরা নয় তো! কিন্তু লঞ্চঘাটের মাগীই যদি হবে তবে ওদিকে ছুটবে কেন? লঞ্চ ঘাট তো উলটো দিকে।

হাঁ করে দাঁড়িয়ে কাঁপতে থাকে ও। আর এ সময় পেছন দিক থেকে সতীশের গলা পায় নুলো।

কি রে বুদ্ধু, কি হয়েছে?

নুলো আঙুল তুলে দেখায় ওই দিকে।

কি ওদিকে? আতিপাঁতি করে চারপাশে তাকায় সতীশ। কিছুই বোঝা যায় না।

মেয়েমানুষ সতীশদা। নুলোর গলার স্বর কেঁপে কেঁপে ওঠে।

'মেয়েমানুষ কি রে! গাঁজা ফাঁজা খাস নি তো।'

বিশ্বাস কর সতীশদা, ওই যে ছই ঢাকা নৌকোটা দেখছ, ওর পেছনে লুকিয়ে ছিল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, কে? কে ওখানে? আর অমনি ছুট লাগাল।

সতীশের মাথায়ও সন্দেহ দানা বাঁধে। জিজ্ঞেস করল, কেমন দেখতে?

ভাল করে দেখতে পেয়েছি নাকি, এমন পড়িমরি ছুট লাগাল যে কি বলব।

তোর চোখের সামনে ছুটে পালাল, বুঝতে পারলি না গাধা?

ফ্যালফ্যাল করে বোকার মতো তাকিয়ে থাকে নুলো। যেন স্বীকার করে নিল ও গাধাই।

মেয়েমানুষ যে বুঝলি কি করে?

ঘোমটা দেওয়া ছিল সতীশদা, গায়ে মাথায় চাদর জড়ানো।

ঘোমটা দেওয়া আবার চাদর জড়ানো, শালা মারব ঝাপ্পর।

নুলো প্রায় কাঁদো কাঁদো গলায় ককিয়ে ওঠে, আমি মিথ্যে বলছি না গো, সত্যি দেখেছি। এই ভেড়ির নিচ দিয়ে ও ছুটতে ছুটতে চোখের বাইরে মিলিয়ে গেল।

সতীশ ভেড়ির দিয়ে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। নির্জন ভেড়ি। বেশ খানিকটা দূরে ডান দিকে শুরু হয়েছে জঙ্গল। জঙ্গলের দিকটায় কেমন জমাট বাধা অন্ধকার। জঙ্গলের সীমা পার হয়ে আরো এগোলে অক্ষয়বাবুদের জলকর। এখান থেকে তা চোখে পড়া সম্ভব নয়।

নুলোকে সঙ্গে নিয়ে খানিকটা এগিয়ে দেখবে কিনা ভাবল সতীশ। কিন্তু বাজারে কাঁটা খোলা রয়েছে। এই সকালে কাঁটা ফেলে কোথাও যাওয়া কি উচিত হবে! চুলোয় যাক, সতীশ নুলোর দিকে তাকাল, কিরে বুদ্ধু হাঁ করে কি দেখছিস? চল কাঁটা বন্ধ করে আসি। তারপর চল, কোথায় তোর মেয়েমানুষ খুঁজে দেখি।

নুলো ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে।

কি হল? চল বে! মুলোর কাঁধ ধরে একটা ঝাঁকি মারে সতীশ। তারপর বাঁধের ঢাল বেয়ে ওরা বাজারের দিকে নামতে শুরু করে।

চোদ্দ

চতুর্দিকে ছড়িয়ে গেল অক্ষয়বাবুদের জলকরে ডাকাত পড়েছে। এসব কথা হাওয়ায় ভাসে। সঙ্গে সঙ্গে উত্তেজনা ছড়ায়। ভাইদারা লাঠি— সোটা নিয়ে দু তিনটে মশাল জ্বালিয়ে হা হা করে বেরিয়ে পড়েছিল। ভেড়ি ধরে ছুটতে ছুটতে এগিয়ে এসে জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে পড়েছিল।

এর আগেই বিনোদকে কাঁধে তুলে আলায় নিয়ে আসা হয়েছে। ডাক্তারকে ডেকে আনার জন্য শ্রীহরিকে পাঠান হয়েছে। কিন্তু ডাক্তারের জন্য এখন আর আলায় বসে সময় নষ্ট করা যায় না। মাছ যারা লুঠ করেছে তাদের আগে ধাওয়া করা দরকার।

জঙ্গলের ধারে আসতেই ভোলা বলল, জঙ্গলে ঢুকেছে ওরা। আমার মনে হয় জঙ্গলেই এখনো ঘাপটি মেরে রয়েছে।

বিষ্টুর হাতে একটা মশাল। বাঁশের মাথায় ন্যাকড়া জড়িয়ে তেলে ডুবিয়ে আগুন ধরিয়ে নেওয়া হয়েছে। মশালের আলোয় কেমন দগ দগ করছে ওর মুখ।

ব্রজ বলল, ডাকাতরা এখনো জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে বসে থাকবে মনে হয় না। আর তোদেরও বলি, তোরা তো তিন জন ছিলি? রুখে দাঁড়াতে পারলি না।

বিষ্টু ঘুরে দাঁড়াল, আমরা কি একসঙ্গে ছিলাম নাকি! ঝুড়ি মাথায় তুলেই বিনোদটা দৌড়তে দৌড়তে অনেক এগিয়ে গেল। ওদিকে ভোলাও আমার অনেক পিছনে পড়ে গেল। বিনোদের দিকেই ওরা প্রথম এগিয়ে আসে। বিনোদ বাধা দিতে গিয়েছিল, দড়াম করে ওর মাথায় একটা লাঠি।

ব্রজ বলল, তাই দেখে তোরাও মাছ-ফাছ ফেলে পালালি?

বিষ্টু চেঁচিয়ে ওঠে, পালিয়ে ছিলাম বলেই প্রাণে বেঁচেছি, নইলে আমাদেরও বিনোদের মত অবস্থা হত। তোমরা টেরই পেতে না কি হয়েছে।

কিন্তু কাউকে চিনতে পারলি না? আশ্চর্য!

মুখে কালি মাখা ছিল গো। একে এই অন্ধকার তায় কালি মাখা মুখ চেনা যায়।

জঙ্গলের ভিতরে ঢুকে খোঁজাখুঁজি শুরু করে ওরা। বন বিছুটি আশ শেওড়া আর হরেক রকম কাঁটাগাছের ঝোপ। পা ছড়ে যায়, গা ছড়ে যায়। তা ছাড়া কোথায় কোন কাল কেউটে শুয়ে আছে কে জানে!

ভাইদা বলল, জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে কোথায় যেতে পারে? আমার তো মনে হয় তোরা ভুল দেখেছিস।

জঙ্গল পেরিয়ে ওদিকে গেলেই তো সড়ক। টেম্পো পেতে পারে। টেম্পো লরি লাইন করে রেখেছে কিনা কে বলবে।

নন্দ বলল, লঞ্চ ঘাটের দিক দিয়েও ওরা মাল পাচার করতে পারে। বাজার এড়াবার জন্য ওরা জঙ্গলের ভিতর দিয়ে ঘুরে লঞ্চ ঘাটের দিকে যেতে পারে।

ব্রজ সায় দেয়, লঞ্চ ঘাটের দিকে এগোলে অবশ্য ওদের নৌকোর অভাব হবে না।

লঞ্চঘাটের কথায় কেমন যেন একটু টনক নড়ে ভাইদার। লঞ্চ ঘাটের মাগীগুলোর হাত নেই তো! সেদিন আলায় এসে যে নছল্লা করে গেল তা কি এমনি-এমনি।

নন্দ কেমন ফ্যালফ্যাল করে তাকায়।

ভাইদা বলে, চল যাবি লঞ্চ ঘাটে?

ব্রজ পিছন ফিরে তাকায়, যেতে তো আপত্তি নেই। তবে বিনোদ একা রয়েছে। ডাক্তার এলো কিনা কে জানে!

কিন্তু এই জঙ্গলে আর কত ঘুরবি। এখানে লুকিয়ে আছে বলে মনে হয় না।

ঠিক আছে চল, লঞ্চ ঘাটেই যাই।

ভাইদা বলল, সবার যেতে হবে না। আয় ব্রজ তুই আর আমিই ঘুরে আসি। বাকি সব আলায় যা। হ্যাঁ, প্রসন্নবাবুকেও খবরটা দিস। থানা পুলিশ যা করার এখনি যেন করে ও। তাছাড়া আমরা ঘাটে আছি খবর দিস।

ব্রজও মাথা নাড়ল, ঠিক আছে তোরা যা। আমি আর ভাইদা ঘুরে আসি। চলো ভাইদা।

ভেড়ি ধরে এগোলে তাড়াতাড়ি পৌঁছন যেত। কিন্তু ভাইদাই বলল, জঙ্গলের ভিতর দিয়েই চল। ঘুর পথেই যাই চল।

ওরা জঙ্গলের আরো গভীরে ঢুকে পড়ল।

ততক্ষণে চারপাশ বেশ ফর্সা হয়ে উঠেছে। ভোরের প্রথম সূর্য উঠল বলে।

খানিকটা দূর এগিয়ে ভাইদা আবার ব্রজর দিকে তাকাল, সতীশকে খবরটা দিয়ে গেলে হত। ও হয়তো এখনো আমাদের মাছের জন্য অপেক্ষা করছে।

ব্রজ বলল, লঞ্চ ঘাটেই চল, ওরা ঠিক খবর পেয়ে যাবে।

জঙ্গলের কাঁটা ঝোপ লাঠি দিয়ে এড়িয়ে এড়িয়ে এগোতে শুরু করে ওরা। কোথাও স্যাঁতসেঁতে কাদা। কোথাও বিশ্রীভাবে ছড়ানো ভাঙা খোয়া। কিন্তু সেদিকে তখন নজর দেবার সময় নেই। এক-রকম প্রায় ছুটতে ছুটতেই ওরা সড়কের দিকে এগিয়ে এল।

একটা গরুর গাড়ি যাচ্ছে। ব্রজ চেঁচিয়ে উঠল, কে যায়?

ছই ঢাকা গাড়ি নয়, গাড়িতে কোন মালপত্র নেই যে সন্দেহ হবে। তবু উত্তেজনাতেই যেন ও চেঁচিয়ে উঠেছে।

গাড়িতে হিলহিলে একটা লোক। ব্রজদের দিকে তাকাল, কি হয়েছে?

ভাইদা এগিয়ে এল, একটু আগে এ রাস্তায় কাউকে যেতে দেখেছ? মাছের ঝুড়ি নিয়ে?

লোকটা বোকার মতো তাকিয়েই থাকে। মাছের ঝুড়ি নিয়ে? কৈ নাতো? কি হয়েছে?

ডাকাতি।

ডাকাতি! জলকরে?

জলকরে না। বাজার যাওয়ার পথে।

ব্রজ শুধোল, কাউকে দেখ নি তা হলে?

না গো বাবু! দেখলে বলব না কেন?

ঠিক আছে। ভাইদা ব্রজকে টানল, চল! সময় নষ্ট করে লাভ নেই।

ওরা উল্টোপথে বাজারের দিকে ছুটতে শুরু করে এবার।

গাড়ির লোকটা হাঁ করে তাকিয়েই থাকে।

লঞ্চ ঘাটে এসে পড়তেও সময় লাগল না। ভেড়ির ওপর দাঁড়াতেই ওরা দেখতে পেল, নিচে ঢালের দিকে মাগীগুলোর ঝুপরি। ওদিকে ঘাটে বেশ কয়েকটা নৌকো।

হঠাৎ চোখে পড়ল ঝুপড়ির পাশেই দাঁড়িয়ে একটা বেঁটে মতো মেয়ে দাঁতন করছে। কুত কুত করে কৌতুকে ব্রজদের দিকে তাকাল মেয়েটা। তারপর পিচ করে একবার থুতু ফেলে রসিকতার ঢংয়ে বলল, ওমা গো, জলকরের বাবুরা না? লাঠি হাতে এই সকালে, কী ব্যাপার?

মাথায় যেন চিরিক করে রক্ত খেলে গেল ভাইদার। চিৎকার করে উঠল, খানকি রসিকতা মারাচ্ছ?

মেয়েটা কেমন থমকে গেল। বুকে জড়ান গামছা, পরনে একটা সায়া। কিন্তু ঐ পোষাকেও লজ্জা নেই।

ওমা গো, ও কি কথা! দেখলো হিমি, বুড়ো শেয়াল কেমন দাঁত বার করে।

কি? আমি বুড়ো শেয়াল! চিৎকার শুরু করে দিল ভাইদা। পারলে যেন ছিঁড়ে খায়।

কিন্তু ওদিকে ওরাও কম যায় না। ঝুপরিগুলোর ভেতর থেকে বেরিয়ে এল বাকি মেয়েগুলো। ষোল থেকে পঞ্চাশ সব বয়সেরই। ওরাও যেন পারলে দা বটি নিয়ে আসে, এটা কি মগের মুল্লুক, সকাল বেলা এসে আমাদের গালি-গালাজ শুরু করেছ? অ্যাঁ?

ভাইদা চেঁচায়, এটা তোদের বাপের জমি যে ঘর বানিয়েছিস ?

কি ? বাপ তোলে ! হিলহিলে পাতলা মেয়েটা লাফিয়ে তু'পা এগিয়ে এল, আমাদের বাপের জমি না হোক, এটা তো তোদেরও বাপের জমি নয়। এটা গরমিণ্টের জমি।

গরমিণ্টের জমি। দাঁড়া বার করব তোদের গরমিণ্টের জমি।

ভাইদাকেও ধরে রাখা যায় না। বুড়ো হাড়ে যে এত জোর আগে জানা যায় নি।

ব্রজ তু'হাতে আটকে রাখে ভাইদাকে, আহা থামো না ভাইদা। ওদের সঙ্গে চেঁচিয়ে লাভ আছে !

কী ভাবে কথা বলছে দেখছিস না ? কানা নাকি তোরা ?

আহা প্রসন্নবাবুকে তো খবর পাঠান হয়েছে, ওকে আসতে দাও না।

ভাইদা বিড়বিড় করে একটা খিস্তি করল, ওই লোকটার আস্কারা পেয়েই তো মাথায় উঠছে সব, জানি না নাকি ?

কৌতূহলী ভিড় ক্রমশই বাড়তে শুরু করেছে। খেয়া নৌকার মানুষরাও মজা দেখার জন্য ছুটে ছুটে আসছে। কি হয়েছে ? অ্যা, কি হয়েছে গো ?

ডাকাতি ?

ডাকাতি ! কোথায় ডাকাতি ?

কাঁটাদারদের বাজারে মাছ আসছিল, পথে ডাকাতি হয়েছে। মাছ নিয়ে পালিয়েছে।

পালিয়েছে, কারা গো কারা ?

কারা করেছে দেখেছি নাকি ! তবে যেই করুক এই মাগীগুলোর সঙ্গে সাঁট আছে। ঝুপড়িগুলোর ভেতর ঢুকলেই হয়তো সব বোঝা যাবে।

ঘটনাটা সত্যি সত্যি রোমাঞ্চকর। শত কাজ থাকলেও কেউ আর ভেড়ির ওপর থেকে নড়তে পারে না। মেয়েগুলোর নাচন কোঁদন দেখতে কার না ভাল লাগে।

ব্রজ ভাইদাকে টেনে ভেড়ির ওপর বসিয়ে দিল, ভাইদা তুমি একটু বোস। ওদের সঙ্গে চেঁচামেচি করে লাভ নেই, দেখছ না কেমন সব ভঙ্গি করছে। ওরা না পারে হেন কাজ নেই ভাইদা।

কিন্তু বিনোদের মাথা ফাটিয়েছে। মাছ তো যা যাবার গেছেই, আমি অক্ষয়বাবুদের কি বলব ?

আমরা সবাই মিলে অক্ষয়বাবুদের বোঝাব। তা ছাড়া ওরাই যে করেছে এমন তো প্রমাণ নেই। প্রসন্নবাবু আসুক না।

ভাইদা গজগজ করতে করতে এদিক-ওদিক তাকায়। আর ঠিক এই সময়ই চোখে পড়ে সতীশ কাঁটাদারকে। হন্তদন্ত হয়ে এগিয়ে আসছিল সতীশ।

ভাইদা আবার উত্তেজনায় উঠে দাঁড়ায়, ও সতীশ, শোন শোন। আমাদের কি সর্বনাশ করে গেছে শুনে যাও।

সতীশ এগিয়ে এল, সব শুনেছি ভাইদা। এই তো আলা থেকে ফিরছি, সব শুনে এসেছি। বিনোদ বেচারির মাথায় তিনটে শেলাই করতে হয়েছে।

তাহলে ভেবে দেখ, কি যুগ চলেছে। হরিণচকে মানুষ থাকে ? বল, তুমিই বল ?

সতীশ চুপ করে থাকে।

ভাইদা দাঁত মুখ খিঁচিয়ে উঠল, মানুষ যদি থাকবে, তাহলে এই মাগীগুলোকে এখানে কেউ এভাবে বসতে দেয় ! আবার বলে কিনা, এটা কি আমাদের বাপের জমি যে ওদের উঠে যেতে বলব।

ওদের সঙ্গে কথায় পারবে না ভাইদা। গ্রামের সবাই যতদিন না এক হচ্ছে ততদিন ওদের ওঠাতে পারবে না। তোমরা প্রসন্নবাবুকে বল না কেন, পঞ্চায়েতের একজন মেম্বারই তো তোমাদের লোক।

বেশ বললে যা হোক। চেন না প্রসন্নবাবুকে ? এতবড় একটা ঘটনা ঘটল, দেখতে পাচ্ছ ওকে ?

খবর পেয়েছে তো ?

খবর পায় নি? তুনিয়ার লোক জেনে লোক, আর খবর পায় নি বলতে চাও?

আবার চুপ করে যায় সতীশ।

ব্রজ বলল, ডাকাতি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই লোক পাঠানো হয়েছে ওর কাছে। থানাতেও ওকেই লোক পাঠাতে বলা হয়েছে।

ভাইদা বলল, আমাদের জানানোর কাজ আমরা জানিয়েছি, এবার উনি বুঝবেন।

সতীশ এপাশ-ওপাশ তাকাল, ওদিকে ভেড়ির নিচে মেয়েগুলো ততক্ষণে কিছুটা থিতিয়ে পড়েছে। যেন ঝুপড়িগুলো আগলে সব বসে পড়েছে। যেন ঝুপড়ি থেকে ভেড়ি, মাঝখানে কিছুটা ফাঁকা জায়গা। যেন নো ম্যানস ল্যাণ্ড।

ব্রজ বলল, আসলে একটা কথা আমার মাথায় কিছুতেই আসছে না, যারা মাছ লুঠ করল, তারা এত তাড়াতাড়ি কোথায় যেতে পারে। তিন চাঙারি মাছ তো সোজা কথা নয়।

ভাইদা বলল, শয়তানের বুদ্ধির অভাব হয় না। যারা মাছ লুঠ করেছে তারা অত কাঁচা নয়। কি করে মাল পাচার করতে হয়, তা তারা জানে।

এখান থেকে কলকাতায় মাছ নিয়ে যেতে হলে লরি টেম্পো ছাড়া অসম্ভব। সতীশ বলল।

আর ঠিক এই সময় রাম সিংয়ের কথা মনে পড়ল সতীশের। লোকটা আজ বার বার করে তাড়া লাগাচ্ছিল ওকে। অন্যদিন তো এমন করে না। তবে কি ওরই সঙ্গে কোন সাঁট ছিল ডাকাতদের! কিছুই অসম্ভব নয়। কিন্তু এখন আর এসব নিয়ে কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। চুপ করে গেল সতীশ।

ভাইদা বলল, তুমি যাই ভাব না সতীশ। আমার ধারণা, এই মাগীগুলোর কোন কারসাজি আছে পিছনে।

ওরা ডাকাতি করেছে?

ওরা না করতে পারে, কিন্তু ওদের চক্রান্ত আছে। মাগীগুলো না হলে আমাদের দেখেই অমন চেঁচাতে শুরু করে! বোঝ না?

সতীশের কাছে কেমন গোলমেলে মনে হতে থাকে ব্যাপারটা, ঘাটের এই মেয়েগুলোর উৎপাত বেড়েছে ঠিকই, কিন্তু ওরা ডাকাতিতেও মদত দেবে মনে হয় না। প্রাণের ভয় নেই। একবার প্রমাণ হয়ে গেলে কি এই ঝুপড়িগুলো একটাও আস্ত থাকবে। কি জানি কিছুই ঠিক বুঝতে পারে না সতীশ।

ভাইদা বলল, তোমাকে বলেছিলাম, মাছ পাঠাব। সেই মতো তিন চাঙারি মাছ পাঠিয়েছিলাম। কিন্তু কি কপাল বলো! হাজার কয়েক টাকা চোট!

সতীশ আবার এপাশ-ওপাশ তাকায়, মজা দেখার জন্য অনেকেই এসে ভিড় করে দাঁড়িয়েছে ভেড়ির ওপর। সবার চোখেই কেমন কৌতুক। ওদিকে মেয়েগুলো কেমন নির্বিকার। যেন থোড়াই কেয়ার করে ওরা ভাইদাদের।

কিন্তু চকিতেই মেয়েগুলো হঠাৎ উঠে দাঁড়াল। কেমন একটা গুঞ্জনও উঠল ওদের মধ্যে। কি ব্যাপার!

মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে সতীশরা। ব্রজ আঙুল দেখায় ও ভাইদা মামু আসছে।

হ্যাঁ মামুই। পরনে লুঙ্গি, খালি গা, খালি পা। হাতে একটা লম্বা দাঁতন কাঠি। যেন সদ্য ঘুম থেকে উঠে দাঁতন করতে বেরিয়েছে।

ভাইদা ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল। এই লোকটাকে ওর একদম বরদাস্ত হয় না। দুদিন আগে এই মামুই ওদের আলায় দলবল নিয়ে হম্বিতম্বি করে এসেছিল। মাল খেয়ে চুর হয়ে ছিল ওরা। শিবুর মেয়েটার জন্য কি দরদ!

মামু এদিক-ওদিক তাকিয়ে সরাসরি ভাইদার কাছেই এগিয়ে এল, কী ব্যাপার? ভাইদা শুকনো গলায় জবাব দিল, জানো না কি ব্যাপার?

এই দেখ! রাস্তায় আসতে আসতে শুনলাম, তোমাদের ওখানে নাকি ডাকাতি হয়েছে?

ভাইদা বলল, আলায় নয়, রাস্তায়। মাছের ঝুড়ি নিয়ে বাজারে যাচ্ছিল, রাস্তায় ডাণ্ডাফাণ্ডা মেরে মাছ লুঠ করে নিয়ে পালিয়েছে।

তাই নাকি! এ সব তো ভাল কথা নয়। হরিণচকের মধ্যে ডাকাতি হবে, এটা তো ঠিক নয়।

ভাইদা বুঝতে পারল না মামুর ওপর কতখানি নির্ভর করা যায়! লোকটার চোখদুটো করমচার গুলির মতো লাল। যেন রাতে যা নেশা করেছিল তার খোঁয়াড়ি এখনো কাটেনি। বলল, এখন তো রাস্তায় ডাকাতি হল, এরপর বাড়ি বাড়ি ঢুকে হবে।

মামু আরো দু'পা এগিয়ে এল, তা এখানে তোমরা কি করছ? থানায় খবর দিয়েছ?

মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে সতীশ আর ভাইদা। মামুর কথা বলার ভঙ্গিটা কেমন যেন অন্যরকম।

ব্রজ বলল, থানায় লোক পাঠান হয়েছে।

মামু দাঁতনকাঠি চিবোতে শুরু করল, তাহলে তোমরা এই লঞ্চ ঘাটে কি করছ? পুলিশ কি এখানে আসবে, না আলায় যাবে?

সতীশ বলল, ভাইদার সন্দেহ যারা ডাকাতি করেছে তাদের সঙ্গে ওই মেয়েগুলোর কোন সম্পর্ক আছে!

তাই বুঝি! ঝুপড়ির মধ্যে লুকিয়ে সেই তো ওরা? চল না একবার দেখে আসি।

আবার মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে ওরা।

মামু আরো এগিয়ে এসে ঝট করে ভাইদার একটা হাত চেপে ধরল, চল না ভাইদা, আমরা দু'জনে একবার ঘরগুলো দেখে আসি।

ভাইদা বলে, পুলিশ আসুক।

ধুত্, নিকুচি করেছে পুলিশের। তুমি এসো তো আমার সঙ্গে। মেয়েগুলো এখানে ব্যবসা চালাচ্ছে চালাক। কিন্তু তাই বলে চোর ডাকাত লুকিয়ে রাখবে, এ আমরা হতে দেব না।

ভাইদা আরো গুটিয়ে গেল। মামুর ওপর কতখানি ভরসা করা চলে বুঝতে পারে না। অসহায় ভাবে তাকায় ভাইদা।

সতীশ বলল, যাওনা গো। তোমরা দু'জনে একবার দেখে এসো না। সবাই মিলে গিয়ে তো লাভ নেই, তোমরা দু'জনেই যাও।

তুমিও এসো না সতীশ।

মামু এসময় ভাইদার হাত ধরে একটা হ্যাঁচকা মারল, আরে এসো না। তোমার মাছ, তোমাকেই দেখতে হবে। আর কারো যাওয়ার দরকার নেই তুমি এসো।

একরকম প্রায় টানতে টানতেই ভাইদাকে নিয়ে মামু ভেড়ির ওপর থেকে নেমে এল নিচে। সঙ্গে সঙ্গে ওদিকে মেয়েগুলোও আবার উঠে দাঁড়িয়েছে। যুদ্ধ শুরু হওয়ার পূর্ব-মুহূর্ত যেন।

মামু হঠাৎ এটা নেকড়ে বাঘের মতো দাঁত মুখ খিঁচিয়ে উঠল, এই, চল তোদের ঘর সার্চ করব।

মেয়েগুলো যে মামুকে ভয় পায়, বুঝতে অসুবিধা হল না। ঢ্যাঙা মেয়েটা আমতা আমতা করে উঠল, কি দেখবে?

একদম কথা বাড়াবি না বলছি, মুণ্ডু এদিক থেকে ওদিকে ঘুরিয়ে দেব। চল, ভেতরে ঢোক। ঢোক বলছি।

ভাইদার একটা হাত তখনো মুঠোর মধ্যে ধরা রয়েছে মামুর। বলল, গুরু, ভয় করো না, এসো।

স্যাঁতসেতে একটা ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ে ওরা। ঘর না পাখির বাসা বোঝা যায় না। মেঝের একপাশে চটের ওপর বিছানা পাতা। টুকিটাকি কিছু জিনিস। রং চটা টিনের সুটকেস, সামান্য কিছু থালা বাসন। বেড়ার গায়ে মেয়েগুলোর শাড়ি সায়া ব্লাউজ।

মামু ভাইদার দিকে তাকায়।

একটা বেঁটে মতো মেয়ে অঙ্গ-ভঙ্গি করে ওঠে, কাপড় খুলে দেখবে নাকি গো বাবু?

এই! ঝট করে দাঁড়ায় মামু। তারপর একটা থাপ্পড় কষিয়ে দেয় মেয়েটার গালে, নাগর পেয়েছিস তোর?

ভাইদা কেমন অপ্রস্তুত।

মেয়েটা গালে হাত দিয়ে বসে পড়ে। একটা থাপ্পড়েই যে এমন কাজ হবে ভাবা যায় না। মেয়েগুলো সব গায়-গায় জড়াজড়ি করে জমে যায়।

মামু বলে, চলো গুরু বাকি ঘরগুলো দেখি। এই, কোন ঘরে লুকিয়ে রেখেছিস বল? যদি বাঁচতে চাস তো বলে ফেল?

মোটা মতো বয়স্ক মেয়েটা করুণ গলায় বলার চেষ্টা করে, ধম্মত বলছি গো বাবু, কেউ নেই এখানে। কেউ আসে নি। কাল সারা রাত কোন লোকই ঢোকে নি গো বাবু।

তা হলে আমরা যা খবর পেয়েছি সব মিথ্যে? মামুই পাল্টা প্রশ্ন করে।

ধম্মত বলছি গো বাবু, কেউ আসে নি। প্রায় কাঁদো কাঁদো শোনায় মেয়েটার গলা।

মামু আবার ভাইদার দিকে তাকায়, তাহলে? কি করবে বল? ঘরে তো কেউ নেই দেখছি। তাছাড়া তোমাদের মাছের ঝুড়ি-ফুড়িও তো দেখছি না।

কেমন এক অস্বস্তিতে পড়ে ভাইদা। বলল, তাহলে পালিয়েছে। আমরা ভুল খবর পাই নি।

কে খবর চালাল গুরু?

ভাইদা বলল, যেই চালাক আমরা ভুল খবর পাই নি।

নাম বলতে আপত্তি আছে?

ভাইদা অবস্থাটা সামাল দেবার জন্য বলল, নাম পুলিশের কাছে বলা হয়েছে।

বটে! মামু অদ্ভুতভাবে হেসে উঠল, বিড়ি খাওয়া কালো ঠোঁট-দুটো অনেকখানি ছড়িয়ে পড়ল। তারপর হঠাৎই হাসিটা গিলে নিয়ে বলল, তুমি মাইরি আমাকে এতটুকু বিশ্বাস করতে পারছ না। তা গুরু, একটা কথা বলব?

ভাইদা ফ্যালফ্যাল করে তাকায়।

কাঁটা তুলতে কাঁটার দরকার হয় জানো?

কি বলতে চাও?

তোমার গলায় যে কাঁটা ফুটে আছে সেটা কিন্তু আমরাই বার করে দিতে পারি।

মানে ?

মামু আবার অদ্ভুতভাবে হেসে উঠল, সে সব কথা কি এখানে হয় গুরু। যদি কথা বলতে চাও তো আলায় গিয়ে তোমার সঙ্গে দেখা করতে পারি।

ভাইদার বুকের ভিতর ঢিবঢিব করে উঠল। এক ঝামেলা কাটাতে যেন আর এক ঝামেলায় জড়িয়ে পড়তে হচ্ছে। তাড়াতাড়ি এই ঝুপড়ি থেকে এখন পালাতে পারলে যেন বাঁচা যায়।

কি হল, কবে যাব বল ?

ভাইদা বলল, আমার ঝামেলা আমিই বুঝব, তোমাকে মাথা ঘামাতে হবে না।

এই দেখ মাইরি। তুমি এমন পরপর ভাবছ আমাকে !

ভাইদা হাত ছাড়িয়ে নিল ওর, ছাড়া।

তারপর আর দাঁড়ায় না। ঝুপড়ির ভেতর থেকে একরকম প্রায় ছুটেই বেরিয়ে আসে।

আর এ সময় শুনতে পায় মামু দাঁত চেপে কি যেন খিস্তি করছে ওকে। হাসিকে জড়িয়ে কি যেন বলতে চাইছে মামুগুণ্ডা। চোখ-মুখ লাল হয়ে ওঠে ভাইদার।

পনের

বিনোদের জ্ঞান ফিরল অনেক বেলায়। যেন এতক্ষণ ও অতল এক সমুদ্রের নিচে তলিয়ে ছিল। ধীরে ধীরে ডুবুরির মতো উপরে ভেসে উঠছে শরীরটা। অসম্ভব রকম হালকা, গা-হাত-পা-মাথা কোন কিছুই ওর নিয়ন্ত্রণে নেই। দেহের গ্রন্থিগুলো যেন আলগা হয়ে সব খুলে পড়তে চাইছে। কিন্তু এ অবস্থার মধ্যেই বিনোদ বুঝতে পারে কে যেন ওর গায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। কে !

চোখ খুলল বিনোদ। না ওর বউ নয়। পার্বতী জানেই না ও এখন মাথা ফাটিয়ে ঝিলখালি থেকে কত দূরে এই এক আঘাটায় পড়ে

আছে। জানার কোন উপায়ও নেই। বিনোদ বেঁচে রইল কি মরে গেল কে জানাবে ওর পরিবারকে।

কিরে বিনোদ, খুব কষ্ট হচ্ছে?

বিনোদ চমকে উঠল। বুঝতে পারল আলাঘরেই শুয়ে আছে ও। সেই পুরনো বাঁশের মাচায় বিছানা পাতা। ওকে ঘিরে বসে আছে কয়েকজন।

কি গো? কথা বলছ না কেন?

বিনোদ অল্প করে হাতটাকে একটু তুলল। মাথা-জোড়া একটা ব্যাণ্ডেজ। কতটা কেটেছে মাথায়, বোঝার উপায় নেই। আবার হাতটা নামিয়ে আনে, ভাইদা কোথায় গো?

ভোলা ওর বুকে হাত বুলিয়ে দিচ্ছিল, বলল, এখনি আসবে। শালাদের পাত্তা নিতে গেছে।

কথাটা কেমন দুর্বোদ্ধ ঠেকে বিনোদের, কোথায়?

লঞ্চঘাটে। মাছ লুট করার পিছনে ওখানকার মাগীগুলোর হাত আছে। একটা হেস্তনেস্ত করতে গেছে ভাইদা।

বিষ্টু বলল, আর তোকেও বলিহারি, মাথায় মাছের ঝুড়ি তুলেই দৌড়তে শুরু করলি। এক সঙ্গে হাঁটবি তো!

বিনোদ কথা বলে না। রাতের ঘটনাটা এমন আকস্মিক যে পূর্বাপর ভেবে ওঠাই মুস্কিল। কিন্তু বিষ্টু আর ভোলা দুজনেই যে অক্ষত রয়েছে বুঝতে অসুবিধা হয় না ওর। ঘোলাটে চোখে তাকিয়ে থাকে।

তুই যে প্রাণে বেঁচেছিস এই বেশি। ডাক্তারবাবু তোর মাথায় ওষুধ লাগিয়ে ব্যাণ্ডেজ করে দিয়েছে। কোন ভয় নেই, তাড়াতাড়ি ভাল হয়ে যাবি।

বলাই বলল, পান্তাটান্তা কিছু খাবি তো বল, এনে দেই।

বিনোদ বলাইয়ের দিকে একপলক তাকায়, এই বলাইয়ের সঙ্গেই সেদিন ওর খটামটি হয়েছিল, এখন অন্যরকম।

কি রে পান্তা খাবি, না মুড়ি খাবি?

বিনোদ কোন উত্তর দেয় না। শরীরের অবসন্নভাবটা যেন কিছুতেই কাটার নয়। এ সময় খাওয়ার কোন ইচ্ছেই নেই। বলল, না, কিছু না।

না কি রে! উঠে মুখটা ধুয়ে কিছু খেয়ে নে। তোর জন্য গাঁয়ে দুধ আনতে গেছে হরি। গরম এক গ্লাস দুধ খেলেই দেখবি সব ঠিক হয়ে যাবে। এখন কিছু খা না।

বিনোদ বিড়বিড় করে উঠল, কি ঠিক হয়ে যাবে?

ভোলা বলল, তুই ভীষণ ঘাবড়ে গেছিস বিনোদ। ভয় কিরে, আমরা তো আছি। ওঠ, উঠে বোস।

বিনোদ আবার চোখ বোজে। জলকরের সবাই ওকে ভালবাসে সন্দেহ নেই। নইলে এ সময় ওকে ঘিরে ওরা এভাবে বসে থাকবে কেন! মনে মনে বেশ কিছুটা উত্তেজনা বোধ করে ও, কিন্তু পরক্ষণেই আবার পার্বতীর কথা মনে আসে। আজ কতদিন পার হয়ে গেছে, পার্বতীর কাছে যাওয়ার আর সময়ই পেল না ও। কি ভাবছে বউটা কে জানে। কি ভাবে দিন চালাচ্ছে কে জানে। অথচ ও ঝিলখালি ছেড়ে এখানে আসার সময় কথা দিয়ে এসেছিল, মাসে একবার তো আসবেই, পারলে মাঝেমাঝেই আসবে। মনে পড়ল, প্রায় আড়াই মাস পার হতে চলল, অথচ এখনো ও ভাইদার কাছ থেকে ওর মাইনে-করি কিছুই নেয় নি। ভাইদাই বলেছিল, টাকাপয়সা নিয়ে রাখবি কোথায়, ও আমার কাছে আছে থাক। যখন বাড়ি যাবি, একসঙ্গে নিয়ে যাবি।

বিনোদ আপত্তি করে নি। ওর টাকা ওর কাছে থাকাও যা, ভাইদার কাছে থাকাও তা। কিন্তু আর নয়, এবার ওকে ঝিলখালি যেতেই হবে। এবার ওকে দু'মাসের টাকা বুঝে নিতে হবে ভাইদার কাছ থেকে।

কেমন একটু উত্তেজিতই হয়ে পড়ে ও। ভাইদা কখন আসবে রে? প্রশ্ন করে ও।

ভোলা বলল, এই এক্ষুনি আসবে। ব্রজ আর ভাইদা একসঙ্গে

গেছে। একটা হেস্তনেস্ত করে ফিরবে ওরা।

কি হেস্তনেস্ত ?

হেস্তনেস্ত করতে হবে না। তিন চাঙারি মাছ কি কম কথা! তাছাড়া রাস্তা থেকে যদি মাছ লুট হয়, এরপর তো আলায় এসেও লুট হবে।

বিনোদ আবার চোখ বোজে। আবার কেমন অবসাদটা ওকে ঘিরে ধরতে শুরু করে। কালিমাখা তিন চারটে মুখ যেন আবার চোখের ওপর ভেসে ওঠে ওর। জ্বলজ্বল করছে চোখ। মাথার ওপর থেকে চাঙারিটা কি অদ্ভুত কৌশলে ওরা তুলে নিল নিজেদের মাথায়। বিনোদের হাতে কোন অস্ত্র ছিল না, থাকলে একবার দেখে নিত। ওর মাথায় ডাণ্ডা মারার আগেই ও একটাকে খতম করে বসতে পারত। কিন্তু, কি যে হয়ে গেল, কেমন বোকার মতো লাঠির ঘা খেয়ে ও কাদার মধ্যে ছিটকে পড়ল।

বিনোদ শুধায়, লঞ্চঘাটের মাগীগুলোই যে করিয়েছে, বুঝল কি করে ?

ভোলা বলল, ওরা না পারে হেন কাজ নেই। ভাইদার সন্দেহ ওরাই করিয়েছে।

বলাই ততক্ষণে সানকি ভরে মুড়ি আর এক ডেলা গুড় নিয়ে এসে হাজির। নে, এটুকু খেয়ে নে দেখি।

বিনোদ অবসন্নচোখে তাকায়, তোরা খা, আমার ক্ষিধে নেই।

আমরা পান্তা খেয়েছি, তুই ওঠ, খেয়ে নে।

বিনোদকে খানিকটা টেনেই তুলে দেয় বলাই, নে ওঠ। আগে খেয়ে নে তারপর কথা।

বিনোদ উঠে বসে। সমস্ত শরীরটা কেমন হাল্কা। মাথার ভিতরে এখনো কেমন একটা ঝিমঝিমে ভাব। হাত বাড়িয়ে মুড়ি তুলে নিল মুঠোয়। মুখে পুরল।

ভোলা বলল, এরপর থেকে বাজারে মাছ নিতে হলে সবাই কিন্তু একসঙ্গে হাঁটব। সঙ্গে বাড়তি দু'একজনকে দিতে বলব।

বিনোদ মুড়ি চিবোতে গিয়ে বুঝল, ওর চোয়ালেও কেমন ব্যথা। হয়তো লাঠির ঘা খেয়ে পড়ে যাওয়ার সময় চোয়ালেও কিছুটা লেগেছে। তখন টের পায় নি, এখন বুঝতে পারছে।

কি হল?

বিনোদ বলল, কিছু না, জল খাব।

ভোলা জলের ঘটি এগিয়ে দেয় ওর দিকে। ধীরে ধীরে খা। সব মুড়িটুকুন খেলে গায়ে জোর পাবি।

আবার মুড়ি চিবোতে শুরু করে বিনোদ। আর এসময় বাইরে যেন কারা এল। হ্যাঁ, গলার শব্দ পাওয়া যাচ্ছে।

হুমড়ি খেয়ে ঘরের বাইরে বেরিয়ে এল বলাইরা। বেরিয়েই কেমন থমকে গেল, জীবন দারোগা। কেবল দারোগাই নয়, সঙ্গে একজন চৌকিদার আর প্রসন্নবাবু।

প্রসন্নবাবুই তড়িঘড়ি এগিয়ে এলেন, কই, ভাইদা কোথায়?

আজ্ঞে ভাইদা তো লঞ্চঘাটে। ভাইদা আর ব্রজ লঞ্চঘাটে গেছে।

লঞ্চঘাটে! লঞ্চঘাটে কেন?

আজ্ঞে, ওখানকার মেয়েগুলোই নাকি লোক লাগিয়ে ডাকাতি করিয়েছে।

প্রসন্নবাবু জীবনদারোগার দিকে তাকালেন।

জীবনদারোগা পুরো দারোগার পোষাকে। হাতে একটা ছড়ি। বলাইয়ের দিকে তাকালেন, কার মাথা ফেটেছে শুনলাম।

হ্যাঁ হুজুর, বিনোদের। আসুন না ঘরে আছে বিনোদ। এতক্ষণ তো কথাই বলতে পারে নি, এখন একটু উঠে বসেছে।

দারোগা বললেন, চল, দেখি।

ভেতরে ঢুকলেন ওরা। মুড়ির সানকি থেকে হাত সরাল বিনোদ। চোখদুটো কেমন ওর সজল হয়ে উঠল।

তোমার মাথায় লাঠি মেরেছে?

আজ্ঞে হ্যাঁ হুজুর। আমার মাথায় চাঙারি ছিল, সেটা টান দিয়ে সরিয়ে ফেলেই পেছন থেকে একটা লাঠি মেরে আমাকে ফেলে দিয়েছে।

তোমার সঙ্গে আর কে ছিল ?

আজ্ঞে হুজুর, ভোলা ছিল, বিষ্টু ছিল।

কই, কোথায় তারা ?

ভোলা আর বিষ্টু ভয়ে ভয়ে এগিয়ে আসে।

আর কেউ ছিল না ?

আজ্ঞে না হুজুর। তিন চাঙারি মাছ, তাই আমরা তিনজন ছিলাম।

প্রসন্নবাবু বললেন, আপনি এই টুলটায় বসুন না জীবনবাবু, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা হয় না।

দারোগাবাবুর পাশেই একটা খালি টুল। টুলটার দিকে তাকালেন, তারপর বসে পড়লেন।

চা খাবেন তো ? চা বানাতে বলি।

চা, তা একটু খেতে পারি। কিন্তু বেশি দেরি করা যাবে না, লঞ্চঘাটেও যাওয়া দরকার।

প্রসন্নবাবু ইঙ্গিত করলেন নন্দকে, হ্যাঁ করে দেখছিস কি ? চা-টা করে দে তাড়াতাড়ি।

নন্দরা কেমন থতমত খেয়ে ঘরের বাইরে বেরিয়ে গেল। দারোগাবাবু ততক্ষণে আবার ভোলার দিকে তাকিয়েছেন, তোমবা তিনজন ছিলে, তা কেবল ওর মাথাতেই লাঠি মারল, তোমাদের ছেড়ে দিল ?

বলাই বলে উঠল, আজ্ঞে হুজুর ওরা একসঙ্গে ছিল না। বিনোদটা মাছ মাথায় তুলেই দৌড়তে শুরু করেছিল, আর ওরা দু'জন বেশ পিছিয়ে পড়েছিল। তাছাড়া বিনোদের মাথায় ডাণ্ডা মারতে দেখেই ওরা ভয়ে পালিয়ে এসেছে হুজুর।

কি যেন একটা আপত্তি করতে যাচ্ছিল ভোলা, দারোগাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, ডাকাতরা কজন ছিল ?

আজ্ঞে জনা চার পাঁচ। উত্তর দিল বলাই-ই।

তুমি কে ? হঠাৎই প্রশ্নটা করে বলাইয়ের দিকে তাকালেন দারোগাবাবু।

বলাই একটু গুটিয়ে গিয়ে বলল, আজ্ঞে রাতে আমি টং পাহারায় ছিলাম। আমার নাম বলাই।

টংয়ে বসে বসে তুমি দেখেছ ডাকাতদের?

আজ্ঞে না হুজুর। অন্ধকার রাতে অতদূর দেখা যায় না।

তাহলে চুপ করে থাক। যারা দেখেছে তাদের বলতে দাও। আবার ভোলার দিকে তাকালেন, ক'জন ছিল ওরা?

আজ্ঞে তিন চার জনকে দেখেছি, জঙ্গলের দিকে আর কেউ লুকিয়ে ছিল কিনা বলতে পারব না হুজুর।

চিনতে পেরেছ কাউকে?

না আজ্ঞে। মুখে কালি মাখা ছিল, কেমন ভূতভূত দেখাচ্ছিল।

রুখে দাঁড়িয়ে ওদের একটাকে আটকাতে পারলি না? প্রসন্নবাবু বললেন এবার।

বিষ্টু বলল, কি করে আটকাব ম্যানেজারবাবু, ওদের হাতে লাঠি দা, আর আমরা খালি হাতে। হুট বলতে ওদের মুখে পড়ে গেছি।

বিনোদ বলল, আমি আটকাতে গিয়েছিলাম ম্যানেজারবাবু। কিন্তু কিছু বুঝবার আগেই ওদের একজন দড়াম করে আমার পেটে একটা লাথি বসিয়ে দিল। লাথি খেয়ে মাছের ঝুড়িটা টাল খেয়ে পড়ে যাচ্ছিল, তখন মাছের ঝুড়ি সামলাব না ওদের আটকাব।

হুম। একটু গম্ভীর হলেন দারোগাবাবু। তারপর আবার জিজ্ঞেস করলেন, মাছ নিয়ে ওরা কোন দিকে পালাল, নদীর দিকে?

আজ্ঞে না হুজুর, জঙ্গলের দিকে পালাতে দেখেছি। পরে আমরা আলায় ফিরে এসে লাঠিসোটা নিয়ে সবাই বেরিয়ে পড়েছিলাম। সারা জঙ্গল খুঁজেছি, কিন্তু কোথাও পাই নি।

চায়ের গ্লাস নিয়ে নন্দকে ঢুকতে দেখা গেল। প্রসন্নবাবুই চায়ের গ্লাস হাতে তুলে দারোগাবাবুর দিকে এগিয়ে দিলেন, নিন, চা-টা খেয়ে নিন। পাউডার মিল্কের চা, কেমন করেছে দেখুন।

চায়ের গ্লাসে ঠোঁট ছোঁয়ালেন দারোগাবাবু, তারপর উঠে দাঁড়ালেন, চলুন বাইরে যাই। যা দিনকাল পড়েছে, চুরি-ডাকাতি আরো

বাড়বে। ঘরের তালা এবার থেকে আরো মজবুত করে লাগান প্রসন্নবাবু।

প্রসন্নবাবু হাসলেন, তা যা বলেছেন। আসলে আমি আর কতটুকু সময় পাই জীবনবাবু, জলকরের সব ব্যাপারটাই ভাইদার ওপর। দেখি, ভাইদার সঙ্গে বসে কথা বলব।

ওরা ঘরের বাইরে বেরিয়ে এল। ঝকঝকে রোদ বিছিয়ে পড়েছে সামনে ছড়ান জলরাশির ওপর। পায়ের নিচে ভেজাভেজা মাটি। কেমন একটা আঁশটেআঁশটে গন্ধ। জলকরের এই পরিবেশে মাছের গন্ধটাই স্বাভাবিক।

তা, কেমন চিংড়ি হয়েছে এবার ? সাইজ কেমন, ভাল হয়েছে ?

বলাই-ই আবার কথা বলে, আজ হুজুর এই এত বড় বড় বাগদা ভরা হয়েছিল চাঙারিতে।

এত বড় বড় বললে কি চেহারা বোঝা যায়। ছ'চারটে তুলে দেখাও না দেখি। হাসলেন দারোগাবাবু।

হাসির ইঙ্গিতটা যেন সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারলেন প্রসন্নবাবু। সঙ্গে সঙ্গে গাঁকগাঁক করে উঠলেন, তোরা সব আচ্ছা মানুষ তো, দারোগাবাবু কতদিন পর আলায় এলেন, কিছু ভাল সাইজ দেখে তুলে দিবি তো ?

আরে না না, আবার মাছ কেন, মাছ কেন ?

মাছ কেন মানে ! বারো ভূতে লুটেপুটে খায় মশাই। আপনাদের মতো ছ' চার জন খেলে আমাদেরই ভাল লাগবে। এই উজবুক, হাঁ করে দেখছিস কি, মাছ তোল না কিছু।

বলাই বলল, হুজুর এখনি ধরে দিচ্ছি। নন্দ আর বলাই জাল নিয়ে এগিয়ে গেল স্লুইস গেটের কাছে।

দারোগাবাবু এপাশওপাশ তাকালেন, মাছ তাহলে নিতেই হবে বলছেন ?

জলকরে পা দিয়েছেন, খালি হাতে আপনাকে ছাড়ি কি করে বলুন। এই, দেখে দেখে তুলিস রে, এক নম্বর হওয়া চাই কিন্তু।

বেশ, তাহলে যদি কষ্ট করে আমার বাড়িতেই পাঠিয়ে দেন তাহলে ভাল হয়। চলুন আমরা লঞ্চঘাটটা একবার ঘুরে যাই।

প্রসন্নবাবু বললেন, বেশ তাই চলুন। মাছ আপনার বাড়িতে ঠিক পৌঁছে যাবে, চলুন।

ওরা আলা ছেড়ে ভেড়ির রাস্তা ধরলেন। রোদের আঁচটা এখন বেশ আরামদায়ক।

ষোল

শেষপর্যন্ত অনেক থানা পুলিশ হল। প্রসন্নবাবু ছুটোছুটি কম করলেন না। ঘনঘন আলায় এসে শলাপরামর্শ করলেন। টংয়ে টংয়ে রাত পাহারা আরো বাড়ান হল।

কিন্তু ওদিকে আবার আর এক সমস্যা। দিন কয়েক ধরে শিবুর কোন হদিশ নেই। যাহ্ বাবা, গেল কোথায় লোকটা! ভাইদাকে জানিয়ে যাওয়া তো দূরের কথা, যে প্রসন্নবাবুর কথায় ওর দিন রাত ওঠাবসা সেই প্রসন্নবাবুকেও কিছু না জানিয়ে ও ডুব মেরেছে। এ যেন গোঁদের ওপর নতুন একটা বিষফোঁড়া।

কোথায় যেতে পারে শিবু! এই হরিণচক ছাড়া আর কোথায় যাওয়ার জায়গা আছে ওর! মনে মনে বেশ কিছুটা দুর্ভাবনা থাকলেও শিবুর ব্যাপারে সবাই কেমন যেন সন্দেহবাতিক হয়ে ওঠে। কি জানি, এই ডাকাতির ব্যাপারে শিবুরও কোন কারসাজি নেই তো! কার মাথায় কি যে ঘুরছে কে বলবে। তবে কি শিবু আপাতত পালিয়ে বাঁচতে চাইছে। কি জানি, কিছুই মাথায় ঢোকে না কারো।

জলকর থেকে কয়েকদিন আর মাছও পাঠানো হয়নি বাজারে। সতীশ কাঁটাদার দিন দুয়েক এসে খবর নিয়ে গেছে, কি গো ভাইদা, কি হল? মাছ পাঠানো বন্ধ করে দিলে নাকি?

ভাইদা বলে, দু-একটা দিন যাক না। একটু সামলে উঠি, আবার পাঠাব।

বাজারে তো নানা গুজব।

কি?

তোমাদের জলকর নাকি উঠে যাচ্ছে।

তাই নাকি! হাসে ভাইদা। তারপর একটু গম্ভীর গলায় বলে, আসলে অক্ষয়বাবু না আসা পর্যন্ত আর কিছুই আগ বাড়িয়ে করতে চাইছি না। আমার কি দরকার বলো?

কবে আসবেন অক্ষয়বাবু?

দু-চার দিনের মধ্যেই এসে পড়বেন। লোক পাঠিয়েছিলাম কলকাতায়।

অক্ষয়বাবুকে ডাকাতির কথা বলা হয়েছে তাহলে? কী বললেন উনি?

কি আর বলবেন। খুব রাগারাগি করেছেন শুনেছি। না এলে বোঝা যাবে না।

রাগারাগি কেন? কেমন অবাক হয় সতীশ।

কি জানি ভাই, কিছুই বুঝি না। অক্ষয়বাবু এলে এবার খোলাখুলি কথা বলে নিতে হবে। না-পোষায় জলকর ছেড়ে চলে যাব ঠিক করেছি।

সতীশ ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে ভাইদার দিকে, কোথায় যাবে?

ভাইদাও তাকায় সতীশের দিকে, ওসব কথা থাক না। আগে অক্ষয়বাবু আসুন, তারপর যা হয় হবে।

দিনের আলো প্রায় মরে এসেছিল। দিগন্তজোড়া কেমন একটা বিষণ্ণ-বিষণ্ণ ভাব। বিশেষ করে এই জলকরের সামনে আলায় বসে থাকলে খিষণ্ণতা যেন আরো বেশি করে জড়িয়ে ধরতে চায়।

আলার সামনে মাচার ওপরই গা এলিয়ে বসে গল্প করছিল ওরা। খানিকটা দূরে জলকরের ছোট্ট ডিঙিটাকে তুলে এনে উপুড় করে রাখা হয়েছে। কিছু মেরামতী কাজের প্রয়োজন আছে ওর। ডোঙাটার পাশেই একটা উপুড় করা ঝুড়ির ওপর বসে জাল বুনছিল বিষ্টু।

খানিকক্ষণের মধ্যেই হরি এগিয়ে এল, চা করব ভাইদা ?

কর না। আদা-চা খাওয়া না একটু।

হরি বলল, শুধু চা ! কিছু মাছও ভেজে দিতে পারি।

সতীশ হাসে, ময়রা কখনো মিষ্টি খায় না, জানো না ?

ভাইদা বলল, মাছ না, মুড়ি থাকলে মুড়ি দিয়ে যা।

ওদিকে ব্রজকে দেখা গেল, স্লুইস গেটের কাছে এক কোমর জলে নেমে কি যেন করছে। কাজের কি আর শেষ আছে। পশ্চিম দিকের বাঁধটায় নতুন করে মাটি ফেলা দরকার। সাত নম্বর টংয়ের একটা খুটি পচে গেছে, পাল্টানো দরকার। সবচেয়ে বেশি যেটা প্রয়োজন তা হল, তিন নম্বর ঘেরে মেলাই ভেটকি ট্যাংরা বেড়ে গেছে, বাছাই না করে নিতে পারলে চিংড়ি খেয়ে খেয়ে সাবাড় করে ফেলবে। কিন্তু কেমন যেন একটা লাগামছাড়া ভাব ভাইদার। যাদের জলকর তাদের যদি মাথাব্যথা না থাকে ওর কি !

সতীশ আবার কথা বলে, প্রসন্নবাবু তো জীবন দারোগাকে ধরে এনেছিলেন শুনেছি, বার করা গেল না কারা ডাকাতি করেছে ?

ভাইদা বলে, জীবন দারোগার থোড়াই মাথাব্যথা আছে ডাকাত ধরার। ডিউটি করতে হয় বলেই আলায় এসেছিল খোঁজ করতে। আসলে ও চোরকে বলে চুরি করতে, গ্রেয়স্থকে বলে জেগে থাকতে।

সতীশেরও তা না জানা নয়। কাঁটাদারি সামান্য একটা ব্যবসা ওর, তাতেও দারোগার পকেটে কিছু না গুঁজলে চলে না। তবু এরকম একটা ঘটনা ঘটল, আইন-শৃঙ্খলা কি সব মুছে গেল নাকি দেশ থেকে !

এক গামলা মুড়ি এনে সামনে রাখল হরি, সঙ্গে টিনের বড় গ্লাসের দু' গ্লাস চা।

ওরে বাবা, এত মুড়ি—

আহা, খাও না। দেখতে দেখতে উড়ে যাবে, খাও। চায়ে চুমুক দেয় ভাইদা।

আর এ সময় দূরে বাঁধের দিকে তাকিয়ে ওরা চমকে ওঠে। আবার

বোধহয় কোন উৎপাত আসছে। দু'তিনজন লোক। হ্যাঁ, এদিকেই আসছে মনে হয়। কে রে বাবা!

সন্দেহের চোখে তাকায় সতীশও, কে গো?

ব্রজ স্লুইস গেটের কাছ থেকে এগিয়ে এসেছিল। ভাইদা জিজ্ঞেস করে, কে আসছে একটু এগিয়ে দেখ তো ব্রজ।

ও-পাশের দিকে বসেছিল নন্দ আর বলাইরা। নন্দ উঠে দাঁড়াল, মামু গো! সঙ্গে ও দুটোকে চিনি না।

মামু এই সন্ধেবেলায় আবার এদিকে কেন! লোকটাকে দেখলেই কেমন অস্বস্তি হয় ভাইদার।

সতীশ বলল, কি মতলব আবার মাথায় ফেঁদেছে দেখ।

ভাইদা মুড়ি খাওয়ার কথা ভুলে যায়, হাঁ করে তাকিয়ে থাকে।

লোক তিনটে আরো অনেকখানি এগিয়ে আসার পর সত্যি সত্যি চেনা গেল, মামুই। কিন্তু সঙ্গের ও-দুটোকে ভাইদা চিনতে পারল না। গাঁয়ের অনেক লোককেই ভাইদা চেনে না।

সতীশ বলল, একটার নাম দেবু। আর একটা পচা। ওরা তিন মূর্তি সব সময় একসঙ্গে থাকে।

দেবু মানে কানাইবাবুর ছেলে?

হ্যাঁগো। কানাইবাবু ভোটে হারল তো ছেলেটার জন্যই। নইলে প্রসন্নবাবু জেতে? পঞ্চায়েতের সদস্য হয়?

সতীশ বলল, যাও না, কি বলবে শুনে এসো।

ভাইদা ফিসফিস করে, পয়সা কড়ি চাইবে বোধহয়। কি ঝামেলা বল দেখি।

স্লুইস গেটের কাছে একটু ঢালে নেমে পড়েছিল পচা। ছোঁ মেরে কি যেন একটা তুলে ধরল।

দেখ কাণ্ড! সতীশ বিড়বিড় করে বলে ওঠে, সাপ ধরেছে। ঢোঁড়া-ফোড়া হবে হয়তো।

সাপটা তুলেই বাঁইবাঁই করে পাক খাওয়ানো শুরু করে পচা। তারপর লাফাতে লাফাতে আলায় ওদের কাছে এগিয়ে আসে।

সাপ দেখেছ, সাপ? অদ্ভুতভাবে হাসতে থাকে ও।

জলকরে সাপ একটা ব্যাপারই নয়। যত রাজ্যের নির্বিষ জলঢোঁড়া ঘোরাঘুরি করে এদিক-সেদিক। যখন-তখন ধরা যায় ওদের। এতে কোন বাহাত্নরি আছে বলে কেউ মনে করে না। পচার কাণ্ড দেখতে থাকে সবাই।

এই ফেলে দে! মামু ভারী গলায় ধমকে ওঠে।

পচা হাত ঘোরাতে ঘোরাতে আবার একচোট হাসে, এত সাপ পোষ কেন গো তোমরা? তারপর হাতটা উঁচুতে তুলে দড়ির মতো ঝুলিয়ে রাখে সাপটাকে।

এই ফেলবি, না ঝাড় লাগাব? মামু এবার দাঁত খিঁচিয়ে ওঠে।

পচা মাথার ওপর বারহুয়েক আবার পাক খাওয়ায় সাপটাকে, তারপর উড়ন্ত দড়ির মতো ছুঁড়ে দেয়। আর বেশ খানিকটা দূরে সাপটা জলের উপর পড়েই তলিয়ে গেল। নিমেষেই যেন হারিয়ে গেল!

সতীশদের মুড়ি খাওয়া প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। চায়ের গ্লাসটা একপাশে সরিয়ে রেখেছিল ভাইদা।

মামু আরো কাছে এগিয়ে এলো। ভাল আছ গুরু? চা খাচ্ছ 'বুঝি?

এ কথার কি উত্তর হয় ভাইদার জানা নেই।

পচা বলল, আমরা এলাম, আমাদের একটু চা খাওয়াও। রোজ তো আর আসি না, একটু চাই না হয় খেয়ে যাই।

চা খেতে চাইলে কে আর না বলতে পারে। ভাইদা আবার হরিকে ডাকে, এই ওদের চা করে দে।

ওখানে বড় বড় চিংড়ি ঘুরছে দেখলাম। কয়েকটা তুলে ভেজে দাও না।

ব্রজ বলল, অন্য মাছ আছে, তাই ভেজে দেবে, আপনারা বসুন।

ভাইদা এবার কথা না বলে পারে না, তা, কি মনে করে এই সন্ধ্যা-বেলা?

সতীশ উঠে দাঁড়িয়েছিল, পালাতে পারলে যেন বাঁচা যায়।

মামু মাচার একপাশে উঠে বসল, একটা ছোট্ট কাজে এসেছিলাম। তা চা'টা খাই আগে, পরে বলা যাবে।

ওপাশে বিনোদের দিকে চোখ পড়ল মামুর, আহা ওরই বুঝি মাথা ফাটিয়ে দিয়েছিল গুণ্ডারা। কেমন আছে গো?

ভাইদা বলে, ঘা শুকিয়ে এসেছে।

বেচারি! কারা গুণ্ডামি করল গো? একবার যদি ধরতে পারতাম বাপের জন্ম দেখাতাম।

ভাইদা চুপ করে থাকে।

নদীর ওপারে গাছ গাছালির আড়ালে চলে গেছে সূর্যটা। উঠোনের একদিকে গোটা চারেক হ্যারিকেন নিয়ে বসেছিল ভোলা। চিমনি পরিষ্কার করে তেল ভরবে। আর একটু পরেই হ্যারিকেনগুলো জ্বালাতে হবে।

সতীশ বলল, আমি আজ যাই ভাইদা। অনেক কাজ পড়ে আছে। কাল-পরশু আবার না হয় আসা যাবে।

ভাইদা বোঝে সতীশ কাটতে চাইছে। বাধা দেয় না, ঠিক আছে।

মামু বলল, আমার তো মনে হয়, যারা ডাকাতি করেছে তারা এ গাঁয়েরই কেউ না।

কি করে বুঝলে?

হাসে মামু। এ গাঁয়ের লোক হলে তোমার লোকজন যারা মাছ নিয়ে যাচ্ছিল, তারা ঠিক চিনতে পারত।

ভাইদা গম্ভীর গলায় বলল, মুখে কালিমাখা ছিল চেনা সম্ভব ছিল না।

তাই বুঝি! তবে তো বেশ পাকা হাতের ব্যাপার!

দেবু আর পচা ততক্ষণে রান্নাঘরে গিয়েই ঢুকে পড়েছে। মাছ ভাজা বা চা খেতে চাইছে, তাতে আপত্তি নেই; কিন্তু ওরা ওখানে ঢুকে আবার নতুন কি উৎপাত শুরু করে দেবে কে জানে।

ভাইদা তাড়া লাগাল ব্রজকে, চা'টা তাড়াতাড়ি করে দিতে বল না।

আহা, আহা, অত ব্যস্ত হচ্ছ কেন, ধীরে ধীরেই করুক। তোমাদের কাছে তো আর আসা হয় না।

অন্ধকার হয়ে এসেছিল বলে জাল বুনোন বন্ধ করে দিয়েছিল বিষ্টু। সামনেই জলে দু'একটা মাছ লাফিয়ে লাফিয়ে খেলা করছিল, চোখে পড়ল।

এক পলক মামুর দিকে তাকিয়ে ঘরের ভেতর ঢুকে পড়ে বিষ্টু।

মামু বলে, কপাল ভালো, ডাকাতরা বোমা পিস্তল চালায়নি। যা দিনকাল পড়েছে ভাইদা।

ভাইদা কোন হুঁ-হ্যাঁ করে না। লোকগুলো তাড়াতাড়ি কাটলে যেন বাঁচা যায়।

হরি চা নিয়ে এল। সেই টিনের গ্লাস। কাগজ জড়িয়ে ধরতে হয়।

ভাইদা জিজ্ঞেস করে, ওদের দিয়েছিস?

চা না খাইয়ে যদি একটু মাল খাওয়াতে গুরু, এই সন্ধেটা তাহলে এখানেই মৌজ করে কাটিয়ে দেওয়া যেত।

ভাইদা দাঁত চেপে বলার চেষ্টা করে, এটা আলা, পবিত্র স্থান, এখানে পাপকাজ চলে না।

মাল খাওয়া পাপ! হাঁ হাঁ করে হেসে ওঠে মামু। বেশ বললে যাহোক।

পাপ তো বটেই। তোমরা মনে করতে না পার, আমরা মনে করি পাপ। যাকগে, কেন এসেছ বলো?

গোটা দুই হ্যারিকেন জ্বালিয়ে ঘরে ঢুকিয়ে দিয়েছিল বলাই। তারপর গোটা দুয়েক ধূপকাঠি জ্বালিয়ে মাকালঠাকুরের সামনে ঘুরিয়ে আনার জন্য এগিয়ে গেল।

মামু বলল, কাজ বলতে, সেদিন তুমি অত চোটপাট করে ওদের ঘরে গিয়ে ঢুকলে—

ভাইদা তাকায়। বুঝতে অসুবিধা হয় না, লঞ্চঘাটের ওই ঝুপড়ি-গুলোর কথাই আবার বলতে চাইছে মামু। জিজ্ঞেস করল, তা কি হয়েছে?

মেয়েগুলো কিন্তু সত্যি বলছি খারাপ না। আসলে বুঝলে না, পেটের দায়ে।

কি বলতে চাইছ, খুলে বল ?

মামু চায়ে চুমুক দিয়ে গ্লাসটা সরিয়ে রাখে, মেয়েগুলো আমায় ধরেছে, কার্তিক পুজো করবে।

ভাইদা তাকিয়েই থাকে। করুক পুজো, আমাদের কি ?

না মানে, তোমার নামে পাঁচ শ' টাকা চাঁদা ধরেছি।

ঠিক এই রকমই কিছু একটা আশঙ্কা করছিল ভাইদা। পাঁচ শ' টাকা! আমাকে বিক্রি করে যদি পাঁচশ' টাকা পেতে পার, নিয়ে নিও।

পাঁচশ' টাকা বেশি হল মাইরি ? একটা বিড়ি ছাড় তো!

আমি বিড়ি খাই না।

যাহ্ বাবা, মাল টান না, বিড়ি খাও না, নিজেকে গুরু পুরোটাই পুণ্যের খাতায় জমা করে দিলে গো ?

ভাইদা বলল, এই নন্দ, বিড়ি থাকে তো একটা দে!

নন্দ উঠে এসে বিড়ি দেয় মামুকে।

বিড়ি ধরিয়ে মামু বলে, মেয়েগুলো বড় সাধ করে বলেছে গুরু, তোমাদের তো কত টাকা ফালতুফালতু উড়ে যায়, ছাড় না টাকাটা।

ভাইদা বলল, জলকরের টাকা আমি দিই কি করে! ম্যানেজার-বাবু আছে, তার কাছে যাও। সে যদি দিতে বলে দিয়ে দেব।

ম্যানেজারবাবু। ওই শালা চামারের সঙ্গে আমরা কথা বলি না। অদ্ভুতভাবে হেসে ওঠে মামু।

ততক্ষণে এক থালা মাছভাজা নিয়ে রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিল দেবু আর পচা। আহ্, ফাস্‌কেলাস মাছ মামু, নাও খাও।

তোরা খা। মামু খপ করে হাতটা চেপে ধরে ভাইদার, ঠিক আছে টাকাটা তুমি কার্তিক পুজোর জন্য না দাও, অন্যভাবে দাও।

ভাইদা বলল, কেন এই সন্ধেবেলা এসে এখানে ঝামেলা করছ বুঝি না। বলছি তো আমার কোন ক্ষমতাই নেই দেওয়ার। তাছাড়া আমার কাছে টাকাও নেই।

মামু একবার এপাশ-ওপাশ তাকায়, তেমন কেউ কাছে নেই। বলল, তার মানে তুমি তোমার গলা থেকে কাঁটা তুলে ফেলতে চাইছ না?

ভাইদা কিছুটা চমকে ওঠে, সেদিনও লঞ্চঘাটের ঝুপড়ির ভেতর একই কথা বলেছিল লোকটা। কাঁটা, কিসের কাঁটা, কি বলতে চায় ও!

কিসের কাঁটা? প্রশ্ন করে ভাইদা।

মামু হাসে, মেয়েটার যে সর্বনাশ করে বসে আছ গুরু! এখন কাঁটা বোঝ না?

মানে!

মামু উঠে দাঁড়ায়, টাকা যদি ছাড়, কাকপক্ষীও টের পাবে না। আর তা নাহলে বুঝতে পারছ?

ভাইদাও উঠে দাঁড়ায়, বেরও, বেরও বলছি।

আই বাপ! পচা এগিয়ে এসেছিল, কি হয়েছে মামু?

থরথর করে কাঁপছিল ভাইদা! এগিয়ে এসেছিল নন্দ, বলাই, ব্রজও। কি হয়েছে ভাইদা?

মামু বলল, চল রে, সোজা আঙুলে ঘি উঠবে না।

ভাইদা আবার বসে পড়ে। মাথার ভেতর কেমন যেন ঝিমঝিম শুরু হয়েছে ওর। শেষটায় কি এরকম একটা অপবাদ ওর মাথাতেই চাপাবে নাকি সবাই। আশ্চর্য!

টলতে টলতে নিজের ঘরে এসে ঢুকে পড়ে ভাইদা। শিবুটাকে হাতের কাছে পেলে হেস্তনেস্ত করতেই হবে এবার। আর উপায় নেই।

সতের

রাত ভোর হওয়ার প্রথম সঙ্কেতটি ভেসে আসে মুরগী ডাকের ভেতর দিয়ে। কর্কশ মুরগীর ডাকে ঘুম ভেঙে গেল হাসির। স্যাঁতসেতে বিছানায় একবার পাশ ফিরল, চোখ মেলে তাকাল। এখনো কেমন অন্ধকার। এই অন্ধকার আশ্রয়টিই যেন ভালো। কিন্তু হাসি জানে,

আর বেশিক্ষণ শুয়ে থাকা যাবে না। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই ওর জেঠি উঠে পড়বে। উঠেই শাপান্ত শুরু করে দেবে। মহারানীর দুপুর পর্যন্ত না ঘুমুলে চলে না। গোয়ালে গরুদুটো ছটফট করছে, দুধটা দুইয়ে দিলেও তো হয়। সংসারের এতটুকু যদি কাজ পাওয়া যায় গো!

হাসি অন্ধকারেই তাকিয়ে থাকে। জেঠাজেঠির ঘর আলাদা। জ্যাঠতুতো বোন বুঁচিকে আগে হাসির সঙ্গেই শুতে দেওয়া হত, এখন আর হয় না। মেয়েটাকে নাকি খারাপ করে ফেলবে হাসি।

ফলে বুঁচি আর পাশে শোয় না, তাতে অবশ্য হাসির এখন আর বিন্দুমাত্র কষ্টও হয় না। প্রথম দিকে ভীষণ অভিমান হত ওর। মেয়েটা হাঁটতে শেখার আগে থেকেই সারাক্ষণ থাকত ওর কোলে-পিঠে। এখন পাঁচ-ছ বছর বয়স, কিন্তু ওইটুকু মেয়েকে হাসি কি কুবুদ্ধি শেখাতে পারে! বরং সেদিক থেকে জেঠতুতো ভাই রুণু অনেক ভালো। কলকাতায় একটা প্রেসে কাজ করে রুণু। ছুটি পায় কম, তাই বড় একটা আসা হয় না বাড়িতে। কিন্তু চিঠি লিখলে হাসির কথা না লিখে পারে না, দিদি কেমন আছে জানিও। হাসিকে এখনো মনে রেখেছে ও।

রুণুর কথা মনে পড়তেই বুকটা আবার ভার হয়ে ওঠে হাসির। ও যে এখন চক্রব্যূহের মাঝখানে দাঁড়িয়ে চরম কিছু ঘটার জন্য অপেক্ষা করে সময় গুনছে, একথা কি জেনে গেছে রুণু! নিশ্চয়ই ওকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। না জানতে পারলে জেঠাজেঠির স্বস্তি কোথায়।

নিজের শরীরে কিছুক্ষণ হাত বোলায় হাসি। সময় বড় সাংঘাতিক, এই শরীরটাই দিনে দিনে কেমন যেন পালটে যাচ্ছে। আর ক' দিন পরে কিভাবে যে লুকিয়ে রাখবে নিজেকে ভেবে উঠতে পারে না ও।

নাহ্, বাবা ফিরল কিনা খোঁজ নেওয়া দরকার। আজ নিয়ে পাঁচ দিন হয়ে গেল কালীর খোঁজে বেরিয়েছে বাবা, যদি ফিরে থাকে নির্ঘাৎ আলাতেই রয়েছে। বাবা কি কালীর কোন খোঁজ পেয়েছে! কালীকে কি বাবা ধরে এনেছে!

কথাটা ভাবতেই আর স্থির থাকতে পারে না ও। ঝট করে

বিছানা থেকে উঠেই নিজেকে গুছিয়ে নেয়। মাথার দিকে ঘুলঘুলি মতো একটা জানালা। টান দিয়ে খুলে ফেলে জেঠাজেঠির ঘরের দিকে তাকায় হাসি। দরজা বন্ধ। নাহ্, জাগেনি এখনো। ওদের জেগে ওঠার আগেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়া ভাল।

আর সময় নষ্ট করে না হাসি। নিঃশব্দে দরজা খুলে উঠোনের দিকে তাকায়। ওপাশে গোয়াল। গরুদুটোকে দেখতে পায় ও। জেঠাজেঠির ঘরের লাগোয়া মুরগীর ঘর। মুরগীগুলো বেরুবার জন্য ছটফট করছে বুঝতে পারে। কিন্তু না, একটু বেলা না হলে মুরগী-গুলোকে ছাড়া হবে না। নইলে এদিক-ওদিক কোথায় ডিম ছড়িয়ে রাখবে কে জানে!

হাসি আর দাঁড়ায় না। তড়িঘড়ি পুকুরঘাটে এসে চোখে-মুখে একটু জল ছিটিয়ে নিয়েই বাগানের ভিতর ঢুকে পড়ে।

আবছা আবছা অন্ধকার। গাছগাছালির ডালে পাতায় অন্ধকার। গাছগাছালিগুলো যেন খুঁটিয়ে লক্ষ্য করছে হাসিকে, কি মেয়ে? তুমি নাকি মা হবে! আশ্চর্য, মুখ দেখাবে কি করে গো? সবাই যে আঙুল তুলে দেখাবে তোমাকে, কি কেচ্ছা কি কেচ্ছা!

গাছগুলোর দিকে তাকাতে ভয়ভয় লাগে হাসির। কি সাংঘাতিক এই অন্ধকার। কি নির্মম এই পৃথিবীটা। কেউ বুঝবে না, কেউ বুঝতে চাইবে না কেন এমন হল হাসির! কেন, কেন, কেন!

একটু দ্রুত পা চালায় ও। বাগান পেরিয়ে আরও কিছু বাড়িঘর। সব ঘুমন্ত। কুকুর চেঁচিয়ে ওঠে দূরে। একটু থমকে দাঁড়ায় আবার। নাহ্ ঘুর পথেই এগোন ভাল। গাঁয়ের ভিতর দিয়ে এগোতে গেলে কার চোখে পড়ে যাব কে জানে!

ঘুরপথ বলতে কাঁটা ঝোপঝাড়ের পথ। যেখানে নিরাপদ আশ্রয়ে থাকে সাপ আর শেয়াল। হ্যাঁ, ওই পথই ওর ভালো। ও পথেই পা বাড়ায় ও।

উত্তেজনায় হাঁটার গতি কখনো দ্রুত হয়ে ওঠে, আবার কখনো ঝিমিয়ে শ্লথ হয়ে আসে। ঝোপঝাড়ের ভেতর বেশ খানিকটা এগোবার

পর সরু একটা পায়েচলা পথ, পথটা জলকরের দিকে এগিয়েছে। সব মনে পড়ে গেল ওর।

জলকরের বাঁধের কাছাকাছি এগিয়ে আসতে বেশিক্ষণ সময় লাগে না। যত এগোচ্ছিল ততই টংগুলো ওর চোখে পড়ছিল। আবার একটু দাঁড়াল ও। সামনের এই টংটাই ওর বাবার। কিন্তু ফিরেছে কি লোকটা! যদি না ফিরে থাকে, তাহলে হয়তো টংয়ে এখন অন্য কোন লোক বসে আছে। এগিয়ে গিয়ে টংয়ে উঠে পড়াটা তাহলে একদম উচিত হবে না।

এপাশ-ওপাশ তাকায় হাসি। বাঁধের গা অবধি কোমর উচু জঙ্গল। কুঁজো হয়ে এই জঙ্গলের ভিতর দিয়ে আরো খানিকটা এগোন যায়। কিন্তু এগোন কি উচিত হবে! ঠিক বুঝতে পারে না ও। আর ঠিক এ সময়ই টংয়ের ভেতর থেকে ঠনঠনে একটা কাশির শব্দ ভেসে এল। চমকে উঠল হাসি। না, ওর বাবার গলা নয়। ওর বাবা কখনো ওভাবে কাশে না। কেমন যেন মুসড়ে পড়ে হাসি। বাবা কি তাহলে ফেরেনি! কি আশ্চর্য, পাঁচ দিন গিয়ে ছ' দিন হতে চলল! ক্যানিং কি অনেক দূর!

কেমন যেন বুকের ভেতর মুচড়ে উঠে ওর। একরাশ কান্না ফেঁপে, উথলে উঠতে শুরু করে। আবার সঙ্গেসঙ্গেই কান্নার আবেগটাকে ঠোঁটে কামড়ে চেপে ধরে হাসি। আরো কিছুক্ষণ কাটিয়ে দিয়ে ও উঠে দাঁড়ায়। নাহ্, টংয়ের দিকে গিয়ে লাভ নেই। সটান আলাতেই গিয়ে উঠি না, ক্ষতি কি! ও তো আর মাছ চুরি করতে যাচ্ছে না। যাচ্ছে ওর বাবার খোঁজ করতে।

আবার খানিকটা পিছিয়ে ঝোপঝাড় সরিয়ে এগিয়ে যেতে থাকে হাসি। টংয়ে যারা আছে, তারা ওকে দেখে যেন হৈ-হৈ করে উঠতে না পারে, এই ভেবেই ও খানিকটা লুকিয়ে লুকিয়ে হাঁটার চেষ্টা করে।

মাকালঠাকুরের মন্দিরের কাছে এসে সটান ও নদীর বাঁধের ওপর উঠে দাঁড়ায়। চারপাশ বেশ ফর্সা হয়ে উঠেছে। বাঁধের ওদিকে নদী, এদিকে জলকর। নদীর দিকে এখন ভাঁটা। ফলে নদী এখন গুটিয়ে

এইটুকু। তা হোক ওদিকে দেখার সময় ছিল না হাসির। আলার দিকে তাকাল। দু' একজন লোক আলার সামনে ঘোরাঘুরি করছে বলে মনে হল। ওদের কাছেই জিজ্ঞেস করে জেনে নেওয়া যাবে। উৎসাহ পায় ও।

আরো খানিকটা এগিয়ে আসে হাসি। এসে চিনতে পারে ভাইদাকে। হ্যাঁ ভাইদাই। ভালোই হল, ভাইদাই বলতে পারবে ওর বাবা ফিরেছে কি ফেরেনি। হাসি জিজ্ঞেস করে, আমার বাবা ফেরেনি গো?

ভাইদার চোখে কেমন কৌতূহল। দু'একবার মেয়েটাকে ও যে না দেখেছে এমন নয়। তবু সন্দেহের ভঙ্গি করে জিজ্ঞেস করে, কে বাবা?

ওমা, আমার বাবাকে চেন না! শিবুচরণ গো।

ও, তুমিই তাহলে শিবুর মেয়ে!

হ্যাঁ গো। হাসি মাথা নাড়ে, বাবা ফেরেনি?

হাসির আপাদমস্তক এবার ভাল করে দেখে নেয় ভাইদা। পা ভর্তি কাদা। কোন বাদাবন ডিঙিয়ে এসেছে কে জানে! গায়ে জড়ানো ময়লা একটা শাড়ি। চোখে-মুখে কেমন যেন রাতজাগা ছাপ।

যেমন মেয়ে তেমন তার বাপ। এই মেয়েটাকে জড়িয়েই ঝামেলা বাধাতে চাইছে মামুগুণ্ডারা। মেয়েটা নাকি অন্তঃসত্ত্বা! আশ্চর্য!

বলো না গো, বাবা ফিরেছে কিনা? চিন্তায় সারা রাত ঘুমুতে পারিনি।

ততক্ষণে ব্রজও এগিয়ে এসেছে। ভাইদাকে ফিসফিস করে বলল, শিবুর মেয়ে।

চেহারা দেখেই বুঝতে পেরেছি শিবুর মেয়ে।

হাসি আরো কিছুটা এগিয়ে এলে ভাইদা বলল, তোমার বাবা ফিরেছে কিনা আমরা কি করে বলব! আমরা জানি না।

হাসি কেমন অবাক চোখে তাকায়, ওমা ফিরলে তো এখানেই ফিরবে। ও কি বাড়িমুখো হয় নাকি! তোমরা জান না?

বাড়িমুখো না হয়ে অন্য কোন আঘাটায় গিয়েও তো পড়ে থাকতে পারে। যাও, সেখানে গিয়ে দেখ গে। এই আলায় যেন কখনো আর না দেখি তোমাকে। ভাইদার গলায় কেমন একটা আদেশের ভঙ্গি।

হাসি ফোঁস করে উঠল, বাব্‌বা, কেমন করে কথা বলে গো! আমি তোমাদের মাছ চুরি করতে এসেছি নাকি?

মাছ চুরি-টুরি বুঝি না, এখানে আর আসবে না বলে রাখছি। এখানে মেয়েছেলেদের আসা বারণ।

হাসি বোঝে, এ যেন পায়ে পা লাগিয়ে ঝগড়া করা। হাসিই বা কম যাবে কেন, ও কেন ওদের তোয়াক্কা করবে। বলল, অমন করে কথা বলার কি হয়েছে, আমি কি তোমাদের এখানে থাকতে এসেছি। অ্যাঁ?

ব্রজ বলল, শিবু কোথায় গেছে তা আমাদের বলে যায়নি। আমরা ওর কোন খবরই রাখি না। কি করে বলব।

হাসি হাঁ করে তাকিয়ে থাকে।

ভাইদা বলল, যে চুলোতেই যাক, আমাদের কিছু যায় আসে না। ও ফিরে এলে আমরা ওকে এখান থেকে তাড়াব। যতসব নাই-ঝামেলা।

কেমন যেন নির্দয় মনে হয় লোকগুলিকে। হাসির আবার কান্না পেতে শুরু করে। আজ ওর এই দুর্দিন, অথচ এমন একজনও নেই যার কাছে গেলে ও কিছুটা সান্ত্বনা পেতে পারে। ভাইদার ওপর প্রচণ্ড রাগ হতে থাকে ওর। ইচ্ছে করে, একটা ইট মেরে পালিয়ে যায়। কি এমন দোষ করেছে ও যে অমনভাবে কথা বলছে লোকটা। বাবাকে ওরা তাড়িয়ে দেবে এখান থেকে; কেন, কি এমন দোষ করেছে বাবা!

হাসি আবার ঠোঁট টিপে কান্নাটাকে কামড়ে ধরার চেষ্টা করে, তারপর মুখে আঁচল চেপে দ্রুত পা চালিয়ে দেয় বাঁধের ওপর দিয়ে।

খানিকটা এগিয়ে এসেই আবার থমকে দাঁড়ায়। স্লুইস গেটটা দেখা যাচ্ছে। নদীর জল গেটের পাটায় এসে আটকে রয়েছে। গেটের

পাটাটা যদি টেনে খুলে দেওয়া যায়, নদীর জল হু-হু করে ঢুকতে শুরু করবে জলকরে। তাতে কি কিছু ক্ষতি করা যায় ভাইদার! কিছু একটা ক্ষতি করতে পারলে যেন মনের আশা মেটে ওর।

হাসি পাটার দিকে তাকাল। ওপরে কপিকল দিয়ে আটকানো কিন্তু ওই ভারি পাটা কি একজন মানুষের পক্ষে সরান সম্ভব! নাহ্, সাহস হয় না।

ক্ষোভে এক চাপ থুথু ছেটাল আলোর দিকে তাকিয়ে, তারপর ইরিগেশনের বাঁধ ধরে কাঁটাদারদের বাজারের দিকে হাঁটা দিল হাসি।

খানিকক্ষণের মধ্যেই রোদ উঠে পড়বে বোঝা যায়। বেশ ফর্সা হয়ে গেছে চারপাশ। কাঁটাদারদের আজ বাজারের দিন কিনা মনে করতে পারে না ও। সপ্তাহে তিন দিন বাজারে বসে কাঁটাদারদের। আজ বন্ধ না খোলা মনে পড়ছে না। খোলা থাক বা বন্ধ থাক ওর কিছু যায় আসে না। কালী কাঁটাদারের ঘরটা আজও তালাবন্ধ আছে কিনা একবার শুধু দেখেই ও ফিরে আসবে।

যদি দেখে কালী কাঁটাদার ফিরে এসেছে! কথাটা ভাবতেই বুকের ভেতর একটা ময়ূর যেন পেখম তুলে বসে। মাগো, কথা রেখেছ তাহলে, কখন ফিরলে?

কালী কাঁটাদারের সেই ঝকঝকে একজোড়া চোখের কথা মনে পড়ল। সেই ননীচোরা হাসিমাখা দৃষ্টি। গা ছমছম করে ওঠে ওর।

জীবন্ত কালী কাঁটাদারই যেন চোখের সামনে ভেসে উঠেছিল। কিন্তু স্বপ্নভঙ্গ হল মুহূর্তেই। নদীর দিকে চোখ পড়তেই ও দেখল, গাঁয়ের বেশ কয়েকটি মেয়ে-বউ মাছ ধরার জন্য নদীতে কোমর জলে নেমে পড়েছে। চেনা কাউকে দেখে ফেলা অসম্ভব নয়। ফলে ওদের এড়াবার জন্য বাঁধ থেকে নদীর উল্টোদিকে নেমে পড়ে হাসি। পিছনে আলার দিকটা এখন দৃষ্টির আড়ালে চলে গেছে।

এই ভাল হল। চেনা মুখ আর দেখতে ইচ্ছে হয় না। হাসি বাঁধের নিচে জঙ্গলের ভিতর ঢুকে পড়ল। জঙ্গলটুকু পার হয়ে আবার বাঁধে ওঠা যাবে।

অন্য দিন হলে এই জঙ্গলে একা ঢোকার সাহস হত না ওর। সাপ-শেয়াল ছাড়া আরো কি কি আছে এই জঙ্গলে কে জানে। একা একা জঙ্গলে ঢুকে কেই বা বিপদে পড়তে চায়! কিন্তু হাসির কাছে এই জঙ্গলই এখন যেন স্বর্গ। সাপে যদি কামড়ায় আপদ চুকে যায়।

জঙ্গলের ভেতর দিয়ে এগোতে এগোতে হঠাৎই একবার ও ভীষণভাবে চমকে ওঠে, মাগো, ওটা কি!

একটু লাফিয়ে উঠেছিল হাসি। পর মুহূর্তেই নিজের বোকামিটা ও বুঝতে পারল, গাছের একটা শিকড় যেন সাপের মতো পড়ে আছে। আঁতকে উঠেছিল ও। শেকড়টার দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে হাসি আবার এগোতে শুরু করল।

আর ঠিক সেই সময়ই হঠাৎ একটা ভারী গলার আওয়াজ, কে ওখানে?

হাসি কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। গলার আওয়াজটা ওর চেনা-চেনা! মামু নয়তো? এই ভোরে মামু এখানে কি করছে?

আবার সেই গলার স্বর, কে ওখানে? কথা বলছ না যে?

হ্যাঁ মামুই। হাসি উত্তর না দিয়ে পারল না। বলল, আমি গো মামু!

আমি কে?

মামু এক লাফে ওর কাছে এগিয়ে এসেছে ততক্ষণে, আই বাপ, হাসি! এখানে কি হচ্ছে? জঙ্গলের মধ্যে?

হাসি কি উত্তর দেবে ভেবে পেল না। মামুকে ওর ভালভাবেই চেনা। লোকটা গুণ্ডামি করে, চুরি ডাকাতি করে। করুক না, ওর কি? ওর সঙ্গে তো কোন দিন খারাপ ব্যবহার করেনি। বরং হাসির অসুবিধার কথা মামুই একমাত্র আগ বাড়িয়ে জানতে চায়। দেখা হলে হাসির দুঃখটা মামুই কিছু না কিছু যেন বুঝতে চায়।

হাসি কেমন একটু অপরাধীর মতো হাসল। বলল, কিছুই না মামু। এমনিই এসেছিলাম।

এমনিই কেউ জঙ্গলে ঢোকে? মামুর চোখে কেমন সন্দেহ।

হাসির আপাদ-অঙ্গ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লক্ষ্য করে মামু। চেহারাটা কেমন যেন ধসকে উঠতে শুরু করেছে মেয়েটার। ভেতরের পাপটাকে যেন আর ঢেকে রাখার উপায় নেই। বেচারা!

হাসির চোখের দিকে সরাসরি তাকায় মামু, রাতে কি করছিলে? ঘুমুওনি? এই বাদাজঙ্গলে কতক্ষণ শুনি?

হাসি বোকার মতো হাসে। এসব কথার কি উত্তর হয় ওর জানা নেই।

মামু আরো এগিয়ে আসে, শিবু ফেরেনি? খোঁজ পেলে ওর?

হাসি মাথা নাড়ল, না। কেউ কিছু বলতে পারে না। আলায় গিয়েছিলাম, ওরাও কিছু জানে না।

আলায় গিয়েছিলে? মামুর একটা ভ্রূ একটু বাঁকা হয়ে উঠল, কখন?

এইতো ওখান থেকেই এলাম গো!

মামু আবার হাসির চোখের দিকে তাকায়, কি বলল ওরা?

আমাকে দেখেই গাঁকগাঁক করে তেড়ে এল। বলে, আলায় নাকি মেয়েছেলেদের ঢোকা বারণ।

বটে। মামুর নিচের ঠোঁটটা যেন একটু ঝুলে পড়েছিল, কে? ওই মুহুরিটা বুঝি? শালাকে একদিন যদি হুড়কো না দিয়েছি তো কি বললাম।

হাসি এবার কিছুটা সংযত হয়, হুল্লোড় ঝামেলা আর ভাল লাগে না ওর। মামু না জানি এখনি গিয়ে হাঙ্গামা বাধিয়ে দেয় ওখানে। বলল, সে যাকগে মামু, বাবার জন্য এমন দুশ্চিন্তা হচ্ছে, কিছুই ভাল লাগে না।

মামু একটুক্ষণ চুপ করে তাকিয়ে থাকে হাসির দিকে, তারপর হঠাৎই বলে, একটা কথা শুধোব?

হাসি কেমন কেমন ভয়ে ভয়ে তাকায়, কি?

মামুও চারপাশ একবার তাকিয়ে নেয়, ঠিক আছে, এদিকে এসো। ওই ইটের পাঁজাটার কাছে এসো।

হাসি অদ্ভুতভাবে তাকায়, কেন ? কি ওখানে ?

এসো না। ঝট করে হাসির একটা হাত মুঠোর মধ্যে নিয়ে নেয় মামু। ওখানে বসার জায়গা আছে। দু-চারটে কথা শুধু জিজ্ঞেস করব, ব্যস।

হাসি তবু ইতস্তত করে। হাতটা ছাড়িয়ে নেওয়ার জন্য টানে। কিন্তু মামুর হাতের আঙুলগুলো যেন লোহার শিকলের মতো, টেনে ছাড়ান অসম্ভব। হাসি অসহায়ভাবে তাকায়।

টানতে টানতে হাসিকে ইটের পাঁজার কাছে নিয়ে আসে মামু। বোস এখানে। তারপর ওর হাত ছেড়ে দিয়ে একটা গাছের গুঁড়ির ওপর বসে পড়ে মামু।

কেমন একটা আঁশটে মাছের গন্ধে যেন ভরে আছে জায়গাটা। হাসি চুরি করে একবার নাক টানল। বিশ্রী পচা পচা গন্ধ।

বোস না। আমি যতক্ষণ আছি কোন ভয় নেই। বোস।

হাসি দাঁড়িয়ে থেকেই বলল, কি কথা বল না ?

মামু আবার হাসির চোখের দিকে তাকায়, তারপর আঙুল তুলে ধরে ওর শরীরের দিকে, মহাপুরুষটি কে ? কে এই সর্বনাশ করল, আমাকে বলতে হবে।

হাসি পাশের গর্তটার দিকে তাকায়। পচা গন্ধটা যেন ওই গর্তের ভিতর থেকেই বেরিয়ে আসছে। গর্তটার দিকে তাকিয়েই থাকে হাসি।

কি হল ? বলবে না ?

হাসি আবার অসহায়ভাবে তাকায়, কি বলব! সব আমার কপাল। আমি যাই মামু। আমাকে ছেড়ে দাও।

ছেড়ে দেব! হাঁ হাঁ করে হেসে ওঠে মামু। ধরলাম কোথায় যে ছেড়ে দেব!

হাসি আরো গুটিয়ে যায়।

মামু উঠে দাঁড়ায়, আমাকে বিশ্বাস করা যাচ্ছে না বুঝি ? আমি গুণ্ডা, তাই না!

হাসির গলা দিয়ে অস্ফুট শব্দ বেরুল, না না, তা না।

অথচ আলা থেকে যে মাছ বাজারে যাবে, সে খবর কিন্তু তোমরাই আমাদের দিয়েছিলে, মনে আছে? পুলিশের হাতে ধরা পড়ে গেলে, কেবল কিন্তু আমরাই ফাঁসতাম না।

হাসি বলে, অন্য এক সময় না হয় বলব। আজ আমি যাই মামু।

অন্য এক সময় মানে, কখন? মামু এগিয়ে এসে আবার খপ করে একটা হাত চেপে ধরে ওর।

হাসির চোখদুটো কেমন জলে ভরে উঠতে শুরু করে এ সময়। এক হাতে মুখে আঁচল চাপা দেয় হাসি।

এই দেখ! কান্নার কি হল? এই এই—

মামু হাত ছেড়ে দেয়, ঠিক আছে, বলতে হবে না। আমিই বার করে নেব একদিন। ঠিক আছে। মামু হাত ছেড়ে দেয় ওর।

হাসি ওর ভেতরকার কান্নাটা কিছুতেই বেঁধে রাখতে পারে না। মুখে আঁচল চেপেই ও ছুটতে শুরু করে বাঁধের দিকে।

আঠার

হরিণচক থেকে ক্যানিং এক লঞ্চেই যাওয়া যায়, ভোর ভোর লঞ্চে চড়ে বিকেলে গিয়ে ক্যানিং নেমেছিল শিবু। বহুকাল আগে একবার ক্যানিং এসেছিল, সেই স্মৃতিই মাথায় ছিল। কিন্তু এবার ক্যানিংয়ে নেমে কেমন বোকা হয়ে গেল, ও। একি সেই ক্যানিং নাকি রে বাবা! কত বাড়িঘর, কত বড় বাজার। মাতলার পাড় দিয়ে ক্যানিং শহর ছড়িয়ে গেছে কতদূর। আশ্চর্য। এই বিশাল এলাকার মধ্যে কোথায় ও খুঁজে পাবে কালীকে। তন্নতন্ন করে ক'দিন ধরে খুঁজেছে ও কালীকে। না, এই ভূসংসারে যেন কোথাও নেই কালী।

পরপর কয়েক দিন ক্যানিংয়ের রাত্রিগুলো ও মাছের বাজারেই কাটিয়ে দিল। বিশাল বাজার। কত মাছ! নৌকা বোঝাই করে মাছ নিয়ে আসছে জেলেরা। ফড়ে-দালাল-ব্যাপারীতে গিজগিজ করা

বাজার। রাত-তুপুরের পর থেকে যেন দক্ষ-যজ্ঞ শুরু হয়, ভোরের সঙ্গে সঙ্গেই সব শেষ। বাজারের চারপাশের মাছের আঁশটে গন্ধ ছাড়া আর কিছুই থাকে না তখন।

শিবু ভাব জমাবার চেষ্টা করেছিল তু-একজনের সঙ্গে, হ্যাঁ গো, কালী বলে কাউকে চেন?

কালী কি? কালী বেরা, কালী মণ্ডল, না কালী নস্কর? কার কথা বলছ?

তাই তো কালীকে কালী কাঁটাদার নামেই চেনে ও। বলল, কালী কাঁটাদার। হরিণচকে ওর কাঁটা আছে। এখানে ওর বাপ-মা থাকে।

কালী কাঁটাদার বললে বোঝা যায়! কাঁটাদার তো সবাই। হেসেছিল লোকটা। কেমন হতাশ হয়ে পড়েছিল শিবু।

চেহারা কেমন? লম্বা না বেঁটে? বয়স কত?

শিবু যতখানি সম্ভব চেহারার বর্ণনা দিয়েছিল। না, কেউ হদিশ দিতে পারেনি কালীর। তবে কি কালী মিথ্যে কথা বলেছে পুরোটাই। আশ্চর্য!

তন্নতন্ন করে ক্যানিং শহরটাকে ক'দিন ধরে চষেছিল শিবু, কোথাও যদি ওর সন্ধান মেলে।

এরপর হরিণচকেই ফিরে যাওয়ার কথা ভেবেছিল ও। মিছিমিছি এখানে ঘুরে বেড়াবার কোন মানেই হয় না।

কিন্তু হরিণচকে ফিরতেও কেমন ভরসা হয় না শিবুর। কি মুখে আবার হাসির সামনে দাঁড়াবে! শেষটায় পাগল হয়ে যাবে না তো মেয়েটা! সারা হরিণচকে জানাজানি হয়ে গেছে হাসির কথা। কি করে এখন সে অপবাদ ঘোচাব!

ভাবতে ভাবতে মাথা গরম হয়ে ওঠে শিবুর। পাগলের মতো এদিক ঘোরে, ওদিক ঘোরে। ভোরবেলা লঞ্চঘাটে এসেও লঞ্চে উঠতে পারে না। কালীর একটা সন্ধান না করে ফেরাটা কি উচিত হবে, নাহ্‌, আর একটা দিন দেখে যাই।

না-খাওয়া, না-স্নান, না-ঘুম, শরীরটা চিমসে মেরে উঠতে শুরু করেছিল। এমনি সময় বাজারে ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ একদিন একটা জড়িবুটি-অলার আসরের সামনে মেলাই লোক দেখে দাঁড়িয়ে পড়েছিল শিবু। খোলা আকাশের নিচে একগাদা শেকড়-বাকড়, হাড়গোড়, মড়ার খুলি, ওষুধ-টষুধ নিয়ে বসেছিল লোকটা। অনর্গল অসুখের কথা বলে যাচ্ছিল।

শিবু হাঁ করে দেখছিল লোকটাকে। দাঁত, পেট, যকৃৎ কোথাও কোন গড়বড়ী হয়েছে,—মাথা খারাপ হয়ে গেছে, হ্যাঁ সে ওষুধও আছে। ঘুম হয় না, স্বপ্নদোষে ভুগছ, হ্যাঁ সে ওষুধও।

দেখতে দেখতে হাসির কথা মনে পড়ে যাচ্ছিল। পেটের বাচ্চাটাকে বার করে ফেলার ওষুধ যদি থাকে, নিয়ে গেলে কেমন হয়! কিন্তু হাসি কি খেতে চাইবে সে ওষুধ! না খেতে চায়, জোর করে খাইয়ে দেব ওকে। শিবু মনে মনে উত্তেজিত হতে থাকে। কিন্তু এতগুলো লোকের সামনে এরকম একটা ওষুধের কথা মুখেই বা আনে কি করে! চুপটি করে দাঁড়িয়ে থাকে শিবু।

ভিড় কমে এলে একটু এগিয়ে ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করে, তোমার কাছে মেয়েদের ওষুধ আছে?

মেয়েদের! কি রোগ? লোকটা বাঁকাচোখে তাকিয়েছিল।

শিবু এপাশওপাশ তাকিয়ে নিল, প্রসঙ্গটা যখন তুলেই ফেলেছে, তখন আর বলতে আপত্তি কি! বলল, মানে ইয়ে হয়েছে। পেটে বাচ্চা এসে গেছে।

খালাস করতে চাও?

ওই রকমই আর কি!

ক' মাস হয়েছে? কে হয় তোমার?

শিবু একটু আমতাআমতা করে, আজ্ঞে পাঁচ-ছ মাস তো হলই।

হুম্! তা এতদিন কোথায় ছিলে বাপু, আগে আসতে পারলে না! এখন আর কম পয়সায় হবে না।

কত লাগবে?

পুরো দশ টাকা।

দশ কেন, আরো বেশি দিতেও আপত্তি নেই শিবুর। দশ টাকাতেই যদি শাপমোচন হয়, ক্ষতি কি!

ট্যাক থেকে দশ টাকার একটা নোট বার করে দিয়েছিল শিবু। তারপর ওষুধের পুরিয়া যত্ন করে কাপড়ের খুঁটে বেঁধে নিয়ে সরে এসেছিল।

পরদিন ভোর হতে না হতেই লঞ্চ ধরেছিল ও। কালীকে না পাওয়া যাক, বাচ্চা খালাসের ওষুধ তো পাওয়া গেছে। একটু নিশ্চিন্তই লাগছিল ওর।

বিকেল নাগাদ লঞ্চ এসে পৌঁছল হরিণচকের ঘাটে। তখনো বেশ বেলা। লঞ্চ থেকে নেমে বাঁশের জেটির ওপর একটু দাঁড়ায় শিবু। কিছু কিছু চেনা মুখ চোখে পড়ছিল। জেটি পেরিয়ে ভেড়িতে উঠলেই আরো অনেকের সঙ্গে দেখা হয়ে যেতে পারে। দেখা হওয়া মানেই নানান প্রশ্ন, কি গো শিবু, কোথায় ডুব মেরেছিলে? ভাবিয়ে তুলে-ছিলে সবাইকে। এ রকম আরো কত সব।

ওদিকে ভেড়ির নিচে মেয়েগুলোর ঝুপড়ি। ওদিকটাও ওর পক্ষে খুব একটা নিরাপদ নয় এখন। শিবু কি করবে ভেবে উঠতে পারল না। ঘুরে লঞ্চটার দিকে আবার চোখ পড়ল। লঞ্চটা আবার ঘাট ছেড়ে সামনের দিকে এগোতে শুরু করেছে। পেছনের চিমনি দিয়ে গলগল করে ধোঁয়া বেরুচ্ছে। ফটফট শব্দ! লঞ্চের পাখা জল কাটছে অদ্ভুতভাবে ঢেউ তুলে। অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকে শিবু। তারপর লঞ্চটা দৃষ্টির বাইরে মিলিয়ে যেতে যেন ওর হুঁস ফিরল।

নাহ্, এইখানি বেলায় গাঁয়ে ঢোকা ঠিক হবে না। বরং এদিক সেদিক করে কিছুক্ষণ কাটিয়ে নেয়া যাক। ঝুপ করে নদীর জলে কাদায় নেমে পড়ে শিবু। এগোতে শুরু করে নদীর ধার ঘেঁষে।

খানিকটা এগোতেই কাদায় তোলা পাশাপাশি দুটো নৌকো দেখতে পেল ও। এই নৌকোয় বসেই কাটিয়ে দিলে কেমন হয়? রাত হলে না-হয় চুপি চুপি ফেরা যাবে জলকরের দিকে।

যা ভাবা, ঝট করে পায়ের কাদা ঝেড়ে নৌকোয় উঠে পড়ে শিবু। পাটাতনের ওপর একটু শুয়ে অনায়াসে ঘুমিয়েও নেওয়া যায়। ক'দিন যা গেল, শরীরটা এখন যেন খসে খসে পড়তে চাইছে।

পাটাতনে হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ে শিবু। শুতেই, বিশাল ছড়ানো আকাশটা চোখের ওপর ভেসে ওঠে। অনেক উঁচুতে পাখি উড়ছে। অলস ভঙ্গিতে যেন হাওয়ার সমুদ্রে ভেসে বেড়াচ্ছে পাখিগুলো। ভাবনা নেই চিন্তা নেই বেশ আছে ওরা।

চোখ বোজে শিবু। বেশ খানিকটা দূরে নদীর জলের শব্দ ভেসে আসছে। জলে ভেসে যাওয়া কোন মাঝি যেন চেঁচিয়ে অন্য কোন নৌকোকে কিছু বলছে। কি বলছে কে জানে! নিছক কিছু আওয়াজ ছাড়া আর কিছুই মনে হয় না ওর।

চোখ বুজেই শিবু কাটিয়ে দিল অনেকক্ষণ। তারপর এক সময় শরীরের ক্লান্তিতে ঘুমিয়েও পড়ল।

ঘুম যখন ভাঙল তখন প্রায় ভোর। ধড়ফড় করে আবার উঠে বসল। আশ্চর্য, রাত কাবার হয়ে গেল যে! ভালই হল, সারা রাত আর আদাড়ে-বাদাড়ে ঘুরতে হল না। এ-পাশ ও-পাশ তাকায় শিবু।

কিন্তু ক্ষিধেয় পেটের ভেতর যেন মোচড়াতে শুরু করেছে। কাল সারাদিন খাওয়াই জোটে নি ওর। এক থালা পান্তা পাওয়া গেলে যেন বাঁচা যেত এখন।

খাওয়ার কথা মনে আসতেই প্রসন্নবাবুর কথা মনে পড়ল। তাহলে আগে প্রসন্নবাবুর বাড়ির দিকেই যাওয়া যাক। কিছু না বলে বাগানের কাজে লেগে গেলে নির্ঘাৎ খাওয়া পাওয়া যাবে। পান্তাই দিক, কি মুড়িই দিক, কিছু জুটবেই। তাছাড়া জলকরের হালচালটাও ওখান থেকেই জেনে নেওয়া যেতে পারে।

নৌকো থেকে নেমে পড়ে শিবু। আর একবার খুঁটে বাঁধা ওষুধটা আছে কিনা দেখে নেয়। তারপর প্রায় পড়িমরি করে প্রসন্নবাবুর বাড়ির দিকে এগোতে শুরু করে।

শেষটায় প্রসন্নবাবুর বাড়ির সদরে এসে দেখল, বাড়িটা কেমন নিস্তব্ধ। কেউ জাগেনি তখনো। বাঁশের গেট ফাঁক করে শিবু ঢুকে পড়ে বাগানে। ওপাশে গোয়াল, গরুগুলিকে দেখা যাচ্ছে। গোয়ালের দিকেই এগোয় ও।

কে রে ওখানে ?

চমকে ওঠে শিবু। মুখ তুলে তাকিয়ে দেখে বাড়ির ছাদে প্রসন্নবাবু।

শিবু বলল, আমি ম্যানেজারবাবু, আমি শিবু।

শিবু! এই ভোরে কোত্থেকে এলি ? বেঁচে আছিস হারামজাদা ?

শিবু দাঁত মেলে হাসে, আজ্ঞে হ্যাঁ বাবু। মরিনি।

প্রসন্নবাবু বললেন, দাঁড়া বেটা আমি আসছি।

শিবুও এগিয়ে গিয়ে বাড়ির দাওয়ায় বসে পড়ে। ম্যানেজারবাবু একটু গালাগালি করবেন ঠিকই, করুন না। কি আসে যায়।

দরজা খুলে গেল। প্রসন্নবাবু বেরুলেন, কি রে ? কি হয়েছিল তোর ? এ-ক'দিন কোথায় ছিলি ?

শিবু আবার বোকার মতো হাসে, এই এদিক-ওদিক ছিলাম বাবু।

এদিক-ওদিক ! সে আবার কোথায় ? তোর জন্য সবাই আমরা ভেবে মরি। বলে যাবি তো ?

হুট করে চলে গেলাম বাবু।

হুট করে চলে গেলি ! বয়স তোর বাড়ছে না কমছে ?

আবার একগাল হাসে শিবু।

জলকরে গিয়েছিলি ? ভাইদাকে বলে এসেছিস তো, ফিরেছিস যে ?

শিবু অপরাধীর মতো তাকায়, এই তো এলাম। বড্ড ক্ষিধে পেয়েছে, তাই এখানেই আগে চলে এলাম।

বাহ্, বেশ লোক। তোর অন্নদাতা কি আমি নাকি ! অ্যাঁ ?

পান্তা-টান্তা কিছুই নেই বাবু ? না খেলে মরে যাব।

পান্তা থাকবে না কেন, আগে উঠুক সব, তবে তো। একটু ঝেড়ে কাশ তো, কোথায় ছিলি এ ক'দিন ?

শিবু বলবে না বলবে না করেও বলে ফেলল, আজ্ঞে, ক্যানিং গিয়েছিলাম।

ক্যানিং! ক্যানিংয়ে কে আছে তোর?

কেউ নেই, এমনি ঘুরে এলাম।

এমনি ঘুরে এলি! তোর মাথাটাথা ঠিক আছে তো?

শিবু আবার বোকার মতো একগাল হাসে।

কাউকে কিছু বলে যাবি না, ওদিকে ভাইদা তো রেগে আগুন হয়ে আছে। তোকে আর আলাতে ঢুকতে দিলে হয়।

শিবু নির্বিকার। আলায় ঢুকতে না দিলে এখানেই থাকব। আপনার তো কাজের লোক লাগেই। আপনার বাড়ির কাজ করব।

বাহ্, চমৎকার। বেশ কথা শিখেছিস আজকাল!

শিবু আবার একটু হাসে।

তা যাকগে, কাজের কথাটা সেরে নেই, তোকে যে ভরতের নামে একটা ঠুকে দিতে বললাম, সেটা কতদূর কি করলি?

আজ্ঞে, ওসব আমি বুঝি না।

না বুঝলে চলবে কি করে! তোর সম্পত্তির ভাগ তুই বুঝে নিবি না?

একটু গম্ভীরভাবে তাকায় শিবু।

প্রসন্নবাবু বললেন, সাধে তোকে বুদ্ধু বলি। তোদের যা জায়গা জমি, তা থেকে বছর গেলে কম হয়! অথচ সবকিছু ছেড়েছুড়ে তুই এ-বাড়ি সে-বাড়ি করে বেড়াচ্ছিস। না হয় বুঝলাম, তোর নিজের পেট কোনরকমে তুই চালিয়ে নিবি, কিন্তু তোর মেয়ে?

শিবু কথা বলে না।

সম্পত্তির ভাগ তুই না নিতে চাস, আদায় করে মেয়েকে দিয়ে দে।

চুপ করেই থাকে শিবু।

কি রে কিছু শুনছিস? আমার কথা শোন, তাড়াতাড়ি মামলাটা লাগিয়ে দে।

ওসব কি করতে হয়, আমি জানি না বাবু।

জানাজানির কি আছে, কাগজপত্র কি আছে ভরতের কাছ থেকে চেয়ে নে আগে। তারপর উকিলই সব করবে। আর তোর উকিল যদি না থাকে, আমিই বলে দেব একজনকে।

ওদিকে ততক্ষণে গোয়ালের কাজ করার লোক চলে এসেছিল। দুধ দোওয়ার কাজও আরম্ভ করে দিয়েছিল। শিবু ওদিকে তাকাল।

প্রসন্নবাবু আবার বললেন, জলকরের ভিতরে তোদের যে চার বিঘা লিজ নেওয়া আছে, সেই টাকাটা তুই যদি মামলা করিস, আমার কাছ থেকে নিতে পারিস। তোর ভাল হবে ভেবেই টাকাটা আমি ভরতকে দিইনি এতদিন।

শিবু কেমন ফ্যালফ্যাল করে তাকায়, কত টাকা জিজ্ঞেস করতে সাহস হয় না।

আর তোর মেয়ে তো একটা কেলেঙ্কারী বাঁধিয়ে বসে আছে, সেটা? এত করে বললাম, মেয়েটার বিয়ে দিয়ে দে, শুনলি না।

শিবু বলল, আমার কপাল গো বাবু।

কপাল বললে তো লোকে শুনবে না। তোর ওই মেয়েকে আর কোনদিন বিয়ে দিতে পারবি? লোকে দেখিস, গায়ে তোর থুথু দেবে।

শিবু কাঁদো কাঁদো, কাল সারাদিন কিছু খাওয়া হয়নি বাবু, মাথা ঝিমঝিম করছে।

তার মানে এতক্ষণ যা বললাম, কিছুই তোর মাথায় ঢোকেনি। মরগে যা।

বিরক্তি প্রকাশ করলেন প্রসন্নবাবু। তারপর বললেন, রান্নাঘরের দিকে যা, কপিলা আছে, পান্তা খেয়ে আয়।

শিবু দেয়ালে হাতের ভর রেখে উঠে দাঁড়াল। ক্ষিধের মতো আর মারাত্মক কিছুই নেই। না, কিছুই নেই। আগে খাওয়া, তারপর সব।

বাড়ির পেছন দিকে টিনের একটা দোচালায় রান্না হয়। পা টিপে টিপে শিবু সেই দোচালার সামনে এসে হাঁকল, কপিলাদি আছ নাকি গো? ম্যানেজারবাবু আমাকে পান্তা দিতে বললেন।

উনুন পরিষ্কার করছিল কপিলা, দরজার ফাঁক দিয়ে একবার দেখে নিল শিবুকে, আর কোথাও জুটল না বুঝি? বোস ওখানটায়, দিচ্ছি।

শিবু বসল না। দরজার কাছ অবধি এগিয়ে এসে কপিলার দিকে তাকাল, কালো মুশমুশে চেহারা। হেঁসেলের দায়িত্বে থেকে দিনে দিনে যেন আরো মুটিয়ে চলেছে।

শিবু বলল, কপিলাদি গতকাল আমার কিছুই খাওয়া হয়নি গো! একটু যদি তাড়াতাড়ি দাও।

খাওনি কেন, কোন ভাগাড়ে পড়ে ছিলে? তোমার মেয়েকে নিয়ে তো টি-টি পড়ে গেছে। বলিহারি বাপ বটে! মুখ দেখাও কি করে?

শিবু দরজার চৌকাঠেই বসে পড়ল, কি করবো বলো, সবই আমার কপাল।

আমার যদি মেয়ে হত, এই বঁটি দিয়ে ওর গলায় কোপ বসাতাম।

শিবু আবার ফ্যালফ্যাল করে তাকায়। কপিলার যা চেহারা, তাতে ওর পক্ষে অমন কাজ অসম্ভব নয়, কিন্তু শিবু ওর মেয়েকে দোষ দেয় কি করে। শিবুই তো হাসিকে গোপনে গোপনে কালীর কাছে পাঠাত। কি ভুলই না ও করেছে!

কপিলা হাঁড়ি থেকে পান্তা তুলতে তুলতে জিজ্ঞেস করল, কোন মহাপুরুষ অমন করেছে, বার করতে পারলে না? সেই মহাপুরুষের গলায় মেয়েকে ঝুলিয়ে দিলেই তো পার।

শিবু ওর কাপড়ের খুঁটে আবার এক পলক হাত বুলিয়ে দেখে নিল, না ওষুধের পুরিয়া ঠিকই আছে।

মেয়ে বলে না, কে করেছে? আবার জিজ্ঞেস করে কপিলা।

শিবু করুণচোখে তাকায়, মেয়ের সঙ্গে দেখাইবা হয় কতটুকু? ও ওর জেঠাজেঠির কাছেই থাকে।

সানকি-ভরা পান্তা এগিয়ে এনে শিবুর হাতে তুলে দেয় কপিলা। কিছু লঙ্কা কিছু নুনও গুঁজে দেয় সানকিতে। নাও, গেলো এবার।

শিবু পান্তা হাতে তুলে কপিলার দিকে আবার তাকায়, তুমি কপিলাদি সত্যি খুব ভালো।

হুঁ ভালো তো বটে। এ দুনিয়ায় যে খেতে দেবে সেই ভালো। সে কথা থাক, হাসির কথা কিন্তু তোমার ভাবা উচিত। দিনে দিনে কি চেহারা হচ্ছে মেয়েটার, চোখে দেখ না ? সেদিন হাটখোলার ধারে মেয়েটাকে দেখে আমি চমকে উঠেছিলাম, ওমা, কি চেহারা গো! এই চেহারা নিয়ে ধিঙ-ধিঙ করে হাটেবাজারে ঘুরে বেড়ায় কি করে !

শিবু লঙ্কা কাটে দাঁতে।

কপিলা আর একটু এগোয়, একটা কাজ করলেও তো পার। ডাক্তার দেখিয়ে পেটের আবর্জনা পরিষ্কার করে ফেল না।

শিবু মুখ তুলে তাকায়।

না-হয় কিছু টাকা খসবে তোমার। তা, কি আর করা যাবে। লাজলজ্জার হাত থেকে তো বাঁচতে পার।

শিবু একপলক খাওয়া থামাল, দেখি ও রকমই কিছু করব ভাবছি।

কপিলা এবার আগ্রহে ঝুঁকে পড়ে, তাই নাকি ! ডাক্তারের কাছে নিয়ে গিয়েছিলে বুঝি ?

শিবু ভাঙল না, ও ক্যানিং থেকে ওষুধ এনেছে। বলল, দেখি, কি করি। দেখতেই পাবে কি হয়।

কপিলা হাঁ করে তাকিয়ে থাকে, কি হয় মানে ?

শিবু আর উত্তর দেওয়া প্রয়োজন মনে করে না। আবার গোগ্রাসে গিলতে শুরু করে পান্তা।

উনিশ

জলকরের আলায় হুড়োহুড়ি পড়ে গেল। ডাকে চিঠি এসেছে, আগামী বুধবার অক্ষয়বাবু হরিণচকে আসছেন। আলাতেই থাকবেন। সব যেন গুছিয়ে রাখা হয়।

চিঠিটা হাতে নিয়ে ভাইদা হৈ-চৈ লাগিয়ে দিল, অক্ষয়বাবু

আসছেন, এই দেখ চিঠি। ফলে বুঝতে পারছিস, সব যেন ঠিকঠাক গোছানো থাকে। ব্রজর ওপর দায়িত্ব দেওয়া হল, জাল-পাটা-খোসনা থেকে শুরু করে কোদাল-ঝুড়ি, দা-কাটারি কি কি আছে তার যেন একটা লিস্ট করে রাখে। সেই সঙ্গে কি কি আরো নতুন জিনিস দরকার তারও যেন একটা ফর্দ তৈরি করে রাখে। বুধবার মানে ক'দিন আর। আজ শনি। তার মানে আর মাত্র তিন দিন। এই তিন দিনে প্রচুর কাজ।

ভাইদার ছটফটানি বেড়ে যায়। কাজে হাত দিলে কি কম কাজ! জলকরের চারদিকে যে বাঁধ, সেই বাঁধের হালও কোথাও কোথাও খারাপ হয়ে পড়েছে। মাটি ফেলে মেরামতি দরকার। তাছাড়া তিন আর চার নম্বর ঘের থেকে পাঁচমেশালী মাছগুলো সরিয়ে নেওয়া দরকার। প্রচুর ভাঙন মাছের উৎপাত বেড়েছে তিন নম্বরে। চিংড়ি বাঁচাতে হলে ওগুলোকে ধরে ধরে ছ' নম্বরে ছাড়া দরকার। ভাঙন ভেটকি ট্যাংরা মাছগুলো তুলে বাজারে বিক্রি করে দিলেও আপদ চুকে যেত। কিন্তু অক্ষয়বাবু না আসা পর্যন্ত বাজারে মাছ পাঠাবার ঝুঁকি আর নিতে চায় না ভাইদা।

নন্দ আর বলাই বলল, ওসব মাছ কাঁটাদারদের কাছে না পাঠিয়ে কিছু কিছু দিনের বেলায় বাজারেও বিক্রি করে আসা যায় ভাইদা।

রাজি হয়নি ভাইদা। দিনের বাজারে বিক্রি করার জন্যও পাইকারের অভাব নেই, কিন্তু যাক না আর কয়েকটা দিন।

ভাইদা বিনোদকে ডাকল, ডিঙিটা জলে নামা তো বিনোদ। একটা পাক দিয়ে নিই জলে।

বিনোদের মাথার ব্যাণ্ডেজটা এখন খোলা। মাথায় চুল খানিকটা চাঁছা। চোখ পড়লে বোঝা যায়, ওখানটাতেই লাঠি লেগেছিল। ঘা-ফা সব শুকিয়ে এখন জায়গাটা স্মৃতির মতো কেবল জেগে আছে।

বিনোদ বলল, ডিঙি নামাব, এখন ?

—হ্যাঁ এখনই। চল, একটু ঘুরে নিই জলকরের মধ্যে। মাছের হালচালগুলো একটু বুঝে নিই।

ডিঙিটা দশ-বারো হাত লম্বা, চওড়ায় হাত তিনেক। দু-তিনজনের বেশি একসঙ্গে চড়া যায় না। বিনোদ ডিঙিটার দিকে তাকায়। আলার উঠোনেই একপাশে দিন কয়েক ধরে ওটা উপুড় হয়ে পড়ে আছে। ঠেলেঠুলে একাই ওটাকে জলে নামান যায়, কিন্তু বিনোদ একা সাহস পেল না। বলল, ও-পাশটায় একটু ধর তাহলে, নামিয়ে দিই।

জলে নামিয়ে ফেলল ওরা ডিঙিটাকে।

জলকরের এই জলে ডিঙি নিয়ে ভাসতে বেশ আরাম লাগে বিনোদের। জলের ভাঁজে ভাঁজে মাছ। চিড়বিড় করে কখনো সখনো লাফিয়ে ওঠে, কখনো বা টলটলে জলের তলায় মাছের ঝাঁক ছুটে যাচ্ছে দেখা যায়।

ভাইদা বলল, ফলন এবার সত্যি সত্যি ভাল, তাই না রে? গতবার এ সময় মাছের চেহারা কিন্তু এরকমটি ছিল না।

বিনোদ গতবারের কথা কি করে বলবে। গতবার ও এখানে ছিল না। বৈঠা হাতে নিল। বইঠা বাইবার প্রয়োজন হয় না, নৌকা আপনি আপনি ভাসতে থাকে। ভাসতে ভাসতে এক নম্বরের আলের দিকে এগোয়। পুরো জলকরটাকেই সরু সরু মাটির আল দিয়ে ছ-সাত ভাগে ভাগ করে নেওয়া। কোনটার কত নম্বর, নম্বর প্লেট লাগানো না থাকলেও সবার কাছেই তা জানা। এক ঘের থেকে আর এক ঘেরে ডিঙি নিয়ে যেতে হলে জলে নেমে ডিঙি তুলে পার করতে হয়। অথবা এক ঘের থেকে আর এক ঘেরের মধ্যে আলের গায় মাটি কেটে কাঠের যে সব পাটাতন বসানো আছে, সেই পাটাতন খুলেও নৌকো পার করা যায়। তেমন বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া পাটাতন খোলার প্রয়োজন হয় না। মাছ চালাচালি করার সময় কাঠের পাটাতন খুলে সেখানে পইনা বসিয়ে দিতে হয়। ফলে এক ঘেরের মাছ অনায়াসেই অন্য ঘেরে চলে আসতে পারে, কিন্তু নিজের ঘেরে আবার ফিরে আসতে পারে না। মাছ চালাচালির ব্যাপারটা জিমনিদেরই কাজ।

ভাইদা টংয়ের দিকে তাকায়, টংগুলোর খুঁটি সব ঠিক আছে তো বিনোদ?

বিনোদ বলল, আমি তিন নম্বরে থাকি, ওটা ঠিকই আছে। তবে ওপরের খড় সব নষ্ট হয়ে আসছে, নতুন কিছু খড় চাপালে ভালো হয়।

চাপিয়ে নিলেই তো হয়। ক' কাহন আর লাগবে! অক্ষয়বাবু আসার আগেই চাপিয়ে নিস। শুধু তোরটাই না, সবগুলো টংই একবার নেড়েচেড়ে দেখে নিস। বুঝলি?

মাথা নাড়ে বিনোদ।

নৌকোটা আলের গায়ে এসে লেগে গেল। ভাইদাও সঙ্গে সঙ্গে কোমরে কাপড় তুলে জলে নেমে পড়ল, নে হাত লাগা, পার করে নিই।

জলকরের জল কোথাও গভীর নয়। খুব বেশি যদি হয় এক কোমর, নৌকোয় না ঘুরে হেঁটে হেঁটেও বেড়ান যায়।

ডিঙিটাকে উঁচু করে ধরে ওরা আল পার হয়ে তিন নম্বরে ঢুকল। জলকরের প্রায় মাঝামাঝি অংশে তিন নম্বর। বেশ ছড়ানো।

বিনোদ বলল, তিন আর ওপাশের ওই চার নম্বরটায় জাল টানার দরকার হয়ে পড়েছে ভাইদা। অনেক দিন ঘের-জাল চলে নি এ দুটোয়।

ভাইদাও লক্ষ্য করে, ভাঙন ভেটকি প্রচুর বেড়েছে। এ ঘেরের চিংড়িগুলো ওরাই সব খেয়ে সাবাড় করে দিচ্ছে। না, চিংড়িগুলোকেই সরানো দরকার। ভাইদা বলল, দেখি কাল-পরশু যদি সময় পাই, একবার বাছাই করে নেওয়াব। ভেটকি ভাঙনগুলোকে সব চার নম্বরে ঢুকিয়ে রাখব।

খানিকটা দূর দিয়ে একটা সাপ সাঁতার কেটে আলের দিকে উঠছে দেখতে পেল ওরা। এসব কোন নতুন জিনিস নয়। যেখানে এত জল, এত মাছ, সাপই বা থাকবে না কেন! গ্রাহ্য করে না ওরা।

ভাইদাই আবার কথা বলে, অক্ষয়বাবু আসছেন, উনি কিন্তু ডাকাতির কথা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জানতে চাইবেন। সব কিছু বুঝিয়ে বলতে পারবি তো?

বিনোদ বলল, যা হয়েছে তাই বলব।

ডাকাতদের চেহারা কেমন, কাকে কাকে তোদের সন্দেহ হয়, সব জানতে চাইবেন কিন্তু।

সন্দেহের কথা কি করে বলব। মুখ জেবড়ে তো কালী মাখা ছিল ভূতভূত মনে হয়েছিল প্রথমে। তারপর ওরা যে দুম করে আমার মাথায় লাঠি বসিয়ে দেবে বুঝতেই পারি নি।

তুই প্রাণে বেঁচে গেছিস, এই আমাদের ভাগ্যি। নইলে পার্বতীকে যে কি বলতাম ভাবতেই পারি না। তোকে এখানে কাজে লাগিয়েছি, দোষটা পুরো আমার ঘাড়েই চাপত।

বিনোদ একটু অস্বস্তি বোধ করে, না না, তোমার দোষ কি। তুমি তো আর জেনেশুনে আমাকে পাঠাও নি। ও যা হবার হয়ে গেছে। কিন্তু এবার একবার বাড়িতে না গেলেই নয় ভাইদা। মাসে মাসে একবার করে বাড়িতে যাব বলে কথা দিয়ে এসেছিলাম।

তা পরে যাবি। এখন অক্ষযবাবু আসছেন, এ সময় তোর এখানে থাকা ভাল। অক্ষয়বাবু চলে গেলে না হয় দু-চার দিনের জন্য ঘুরে আসিস।

ডিঙির কাছেই একটা বড় মাছ লাফিয়ে উঠল, বেশ বড়। বিনোদ বলল, ভাঙন।

ভাইদা বলল, এক কেজির কম নয়। এ রকম বেশ কিছু থাকলেই হয়েছে আর কি! চিংড়ির গুষ্টি উদ্ধার করে দেবে। ব্রজরা এদিকে নজরটজর কিচ্ছু রাখছে না। কি যে করে সারা দিন, কে জানে!

একটা কথা বলব ভাইদা। কেউ নজর দেয় না। একা তুমিই যা কিছু হাঁকপাক কর, আর কেউ কিছু ভাবে না।

ভাইদা বলল, হাঁকপাক করি সাধে, আসলে কি জানিস, কেমন যেন মায়ায় জড়িয়ে গেছি এই জলকরে। কখনো তো তেমন করে ঘরসংসার হল না, এটাই আমার ঘরসংসার।

বিনোদ চুপ করে থাকে। ভাইদার জীবনে যে বড় একটা দুঃখ রয়ে গেছে সেটা এখানে একমাত্র ওরই জানা। সে সব পুরনো প্রসঙ্গ

কোনদিন আর প্রকাশ্যে আসার নয়। বিনোদের মনে পড়ে গেল ঘটনাটা, আজ থেকে প্রায় পনের কুড়ি বছর আগের। আজকের ভাইদাকে দেখলে বোঝাই যাবে না সেদিন এই লোকটাই কত প্রতাপে থাকত। ভূতের মতো খাটতে পারত। কখনো কেউ ওকে বেজার মুখে দেখেছে বলে বলতে পারবে না। ভাইদার বাবা ছিল গাঙখালির বাবুদের বাড়ির দারোয়ান। জায়গা জমি বাড়িঘর দেখাশোনা করত। বাবুরা থাকতেন কলকাতায়। সেই সূত্রে বাপের সঙ্গে ভাইদার কখনো সখনো কলকাতা যাওয়া। পরে কলকাতাতেই একটা কাজ জুটিয়ে ফেলেছিল ভাইদা। চায়ের দোকানের চাকরি। কিন্তু কপালের লেখা ছিল অন্যরকম। একদিন দেখা গেল, দোকানের সামনেই একটা রক্তমাখা দেহ পড়ে আছে। মার্ডার না আর কিছু কেউ জানে না। যাই হোক না কেন, পুলিশ এসে বেঁধে নিয়ে গিয়েছিল ভাইদাকেই। সেই নিয়ে কত ঝামেলা। শেষটায় অনেক টাকাপয়সা খরচ করে ভাইদাকে ছাড়ান হয়। তারপর হাতে পায়ে ধরে ছেলেকে বাবুদের দেশের বাড়ির কাজে লাগিয়ে দিয়েছিল ওর বাবা।

সেই থেকে ওর গাঙখালিতে কেটেছিল অনেক দিন। নৌকা নিয়ে মাঝে মাঝে মাছ ধরতে বেরিয়ে যেত ও। ফিরত কখনো একরাত দু'রাত পর। কখনো আবার তিন চারদিন একেবারে বেপাত্তা।

কি রে শুয়ার, কোথায় ছিলিস এ'কদিন ?

ভাইদা ভেঙে বলত না কোথায় ছিল। বুড়ো বাপকে খুব একটা যেন গ্রাহ্যই করত না ও। মা খিটিরখিটির করত সারাক্ষণ, কে তাতে পরোয়া করে। ভাইদা পরোয়া করত না কাউকে। কেমন একটা একরোখা হয়ে উঠছিল দিনে দিনে।

এমন দিনে লোকে বুদ্ধি দিল, ছেলেকে বিয়ে দিয়ে দাও, ঘরে তাহলে বাঁধা পড়বে।

কথাটা একেবারে উড়িয়ে দেওয়ার নয়। ভাইদার বাবা, মেয়ের তল্লাসে উঠেপড়ে লেগে গেল। বাদাবনে মুড়িমুড়কি আর মেয়ে একই কথা। মেয়ের অভাব কি! মেয়ের বাপরাই ঘোরাঘুরি শুরু করে

দিল, এটা দেব, সেটা দেব।

তারপর কে একজন এসে যেন লোভ দেখাল, ছেলেকে হাটখোলায় একটা দোকান করে দেব। তাছাড়া নগদ এক হাজার টাকা।

কি রে ভাদাই? ভেবে দেখ। কথা দেই এখানেই?

ভাইদাই ভাদাই। ভাদ্রমাসে জন্ম বলে ভাদাই। সেদিনকার সেই ভাদাই এই জলকরে এসে হয়ে উঠেছে ভাইদা।

ভাদাই বলল, তোমরা যদি ভাল মনে কর, আমি কি বলব।

অর্থাৎ ভাইদা সেই বিয়েতে রাজি হয়ে গেল। আর সেটাই হল ভাইদার কাল।

যথাসময়ে বাজনা বাজিয়ে, বাজি পুড়িয়ে বিয়েও হয়ে গেল। মেয়েতো নয়, লক্ষ্মী। বউ নিয়ে বাড়ি ফিরল ভাইদা। আর তারপরই শুরু হল ভাইদার জীবনে এক নতুন অধ্যায়।

অমন দেখেশুনে আনা মেয়ে, কিন্তু সে মেয়ের মাথায় যে অমন গোলমাল রয়েছে কে বুঝতে পারবে আগে। দু'দিন একদিন যেতে না যেতেই মেয়ের স্বরূপটা ধরা পড়ে গেল। বলা নেই কওয়া নেই হঠাৎ দেখা গেল, খাটের নিচে লুকিয়ে বসে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

কি ব্যাপার! কি হল বৌমা?

খাটের নিচে এগোতেই শাশুড়ীর হাত কামড়ে রক্তারক্তি। তাই নিয়ে হুলুস্থুল।

বুঝতে অসুবিধা রইল না, পাগল। কখনোসখনো একেবারে ভালে-মানুষটি আবার কখনো একেবারে উন্মাদ।

ভাইদাকেই একদিন দা ছুঁড়ে একেবারে যমের বাড়ি পাঠাতে গিয়েছিল বউটা।

দড়ি দিয়ে বেঁধে রেখেও আটকান যায় না ওকে। তারপর যা হয়, তাই হল। বউকে বাপের বাড়ি পৌঁছে দিয়ে সেই যে পালাল ভাইদা, বহু দিন আর ওর কোন খবরই রইল না।

বিনোদও জানত না, ভাইদা কোথায় আছে কি করছে। এমন দিনে এই হরিণচকের লঞ্চঘাটে ভাইদার সঙ্গে হঠাৎ একদিন দেখা।

প্রথম দিকে চিনতে পারে নি বিনোদ। কেমন একটু বুড়োটে-বুড়োটে চেহারা। পনের কুড়ি বছর আগের সেই ভাদাই এখানে এসে ভাইদা হয়ে বসেছে। বিনোদ দেখল, সবাই মান্য করে লোকটাকে। দেখল ভাইদা এখন ইচ্ছে করলে ওকে জলকরের কাজেও লাগিয়ে দিতে পারে।

হ্যাঁ লতায়পাতায় একটা সম্পর্ক ছিল বলেই বুঝি ভাইদা ওকে ফিরিয়ে দেয়নি, ঠিক আছে, কাজ করতে চাস যখন আয়, লেগে পড়।

বিনোদের জলকরে আসা এভাবেই।

বিনোদ বলল, আসলে কি জান ভাইদা, শিবুই হচ্ছে যত গণ্ড-গোলের গোড়া। ওকে তাড়িয়ে দেওয়াই ভাল।

সেদিনই আমি ওকে জুতোপেটা করে তাড়িয়ে দিতাম। কিন্তু কি চালাক দেখ, ও ঠিক প্রসন্নবাবুকে সঙ্গে নিয়ে এসে হাজির। ঠিক আছে, কত দিন আর প্রসন্নবাবু ওকে বাঁচাবে! এবার অক্ষয়বাবু এলেই প্রথমে ওর ব্যবস্থা করব।

বিনোদ বলল, আমার কি মনে হয় জানো ভাইদা, ওর মাথাটাই গোলমেলে হয়ে গেছে। বউটাকে কামটে খেল, আর মেয়েটার কথা তো বলারই নয়।

মেয়েটা চোর। জ্ঞানের দোকান থেকে সেদিন একটা সাবান চুরি করতে গিয়ে কি কাণ্ড!

সাবান চুরি! অবাক হয়ে তাকায় বিনোদ।

জানিস না! একেবারে হাতেনাতে ধরা পড়ে গিয়েছিল। টুক করে এক ফাঁকে একটা সাবান শাড়ির আঁচলের মধ্যে ঢুকিয়ে ফেলেছিল।

তাই বুঝি! কবে গো, কবে?

ভাইদা বলল, কবে আবার, এই তো ক'দিন আগে। সব দিকে চোখকান খোলা না রাখলে এসব জানা যায় না।

ডিঙিটা আবার আলের ধারে আটকে গিয়েছিল। বিনোদ বলল, চার নম্বরে ঢোকাব নাকি ভাইদা? জলে নাবব?

চার নম্বরে না, ওপাশে চল। ছ' নম্বরের বাগদাগুলো কত বড় হল দেখা যাক।

ছ'নম্বরে এগোতে হলে পশ্চিম দিকে খানিকটা এগোতে হয়। ডিঙি ঘোরাল বিনোদ। আর ঠিক এ সময় আলার দিক থেকে ব্রজর গলা ভেসে এল ও ভাইদা, শুনছ?

ভাইদা তাকায়, কি হয়েছে?

ভরতবাবু এসেছে গো। তোমায় ডাকছে।

ভরত আসা মানেই আবার কিছু নাই ঝামেলা। ভাইদা বলল, বসতে বল, আসছি। বিনোদের দিকে তাকাল, চল আলার দিকেই চল।

বিনোদ আবার ডিঙির মুখ ঘোরাল। বৈঠায় চাড় লাগাল। ডিঙি যতই ছোট হোক, দু'পাশে সুন্দর কিছু ঢেউ উঠল। দু'পাশে সাপের মতো ছড়িয়ে যেতে লাগল।

আলার কাছে এসে ভাইদা বলল, জলেই থাক ডিঙিটা। তুইও উঠে আয়।

তারপর লাফিয়ে পাড়ে উঠল ভাইদা।

কোথায় ভরত?

ব্রজ বলল, তোমার ঘরে। মুখটা কেমন হাঁড়ি হয়ে আছে দেখগে যাও।

কেন, হাঁড়ি করে রেখেছে কেন! কেমন একটু বিরক্তি দেখিয়ে ঘরের ভিতর ঢুকে পড়ে ভাইদা।

কি গো ভরত, কি ব্যাপার? এই অসময়ে?

ভরত বলল, এদিকে এসো। কথা আছে। মুখখানা সত্যি কেমন ভার-ভার।

টাকা চাওয়ার ব্যাপার বলে মনে হল না। এ যেন অন্য কোন প্রসঙ্গ। ভাইদা এগিয়ে এসে আর একটা টুল টেনে নিয়ে বসে পড়ে।

শিবুর মেয়ে কি করেছে শুনেছ?

ভাইদা কেমন সন্দেহের চোখে তাকায়, নতুন কি করল আবার।

ভরত দরজার দিকে একবার তাকায়, তোমরা যাও না বাপু। হাঁ করে দেখছ কি !

ভাইদাও তাড়া লাগাল, যা না। এই, ওদিকে যা। কথা বলতে দে।

ভরত বলল, মেয়ে বিষ-ফিস কিছু খেয়েছে বোধহয়। ভোরবেলা দেখি বিছানায় শুয়ে গোঁ গোঁ করছে, মুখে গ্যাঁজলা উঠছে। কি কাণ্ড বল! এদিকে শিবুরও দেখা নেই। আমার মরণদশা এখন।

বিষ খেয়েছে ! হাঁ করে তাকিয়ে থাকে ভাইদা।

বিষই হবে, নইলে অমন হয় ? বুঝলে ভাইদা আমাকে ওরা শেষটায় না জানি ফাঁসিতে ঝোলায়। কতবার শিবুকে বলেছি, তোর মেয়ে তুই নিয়ে যা। আমার ঘাড়ে কেন ! শোনে সে কথা ?

ডাক্তার ডেকেছ ?

ভরত বলল, মুকুন্দডাক্তারকে ধরে এনেছিলাম, কি বলে জানো, হাসপাতালে দিতে হবে। দেরি করলে নাকি বিপদ আছে।

ভাইদা চুপ করে থাকে।

তা এইমাত্র নৌকো ঠিক করে ওকে শিবতলা পাঠালাম। শিবুকে জানান দরকার। তাই এখানে এলাম। কি ঝামেলা বল দেখি !

মেয়েটা কথা বলছে না ?

বলছে, তবে কি যে বলছে কিছুই বোঝা যায় না। ডাক্তারবাবু ওর নাড়ি দেখলেন, বুক দেখলেন, একটা সুঁই ফুঁড়িয়ে ওষুধ দিলেন।

বাঁচবে তো ? প্রশ্নটা করেই কেমন তাকিয়ে থাকে ভাইদা।

ডাক্তার বলছেন, মরার মতো কিছু নয়, তবে ভয় যেটা তা নাকি পেটেরটাকে নিয়ে। সত্যি কথা বলব, মেয়েটা মরলে হাড় জুড়োয় আমাদের। জানো, কোথাও আর মুখ দেখাতে পারি না।

ভাইদা চুপ করে থাকে।

ভরত বলল, এখানে এসে শুনলাম, শিবুকে নাকি তুমি তাড়িয়ে দিয়েছ ? ও নাকি আর এখানে থাকে না ?

ঠিকই শুনেছ। বুধবার অক্ষয়বাবু এসে ওর সম্পর্কে যা ব্যবস্থা

করার করবেন। আমি সাফসাফ প্রসন্নবাবুকে জানিয়ে দিয়েছি ওর এখানে থাকা চলবে না।

এখানে থাকে না, তাহলে কোথায় থাকে ?

বুঝতে পার না, কোথায় থাকে। প্রসন্নবাবুর পেয়ারের লোক যে, ওখানেই থাকে। তুমি যদি ওকে খবর দিতে চাও, ওখানেই যাও।

প্রসন্নবাবুর বাড়িতে! আমি! বেশ বললে যা হোক।

কেন, দোষ কি! মেয়ের এই অবস্থা, শিবুকে জানিয়ে রাখা ভাল।

তুমি একটু কাউকে পাঠিয়ে খবরটা দাও না ভাইদা। আমার বড় উপকার হয়। ভাইদার হাতটা চেপে ধরে ভরত।

ভাইদা হাত ছাড়াল, ঠিক আছে, দেখছি।

ওকে বলবে হাসপাতালে দেওয়া হয়েছে মেয়েকে। হাসপাতালে গিয়ে যেন খোঁজ খবর করে মেয়ের।

ঠিক আছে। ভাইদা উঠে দাঁড়ায়।

উঠে দাঁড়াল ভরতও। অক্ষয়বাবু বুধবার আসছেন শুনলাম, এবার কিন্তু আমার টাকাটা বন্দোবস্ত করে দিও ভাইদা। ভরতের গলায় আকুতি ছড়ায়।

ভাইদা বলল, তুমি এসো না ওদিন। মুখোমুখি করিয়ে দেব তোমাকে। প্রসন্নবাবুও থাকবেন, একটা হিল্লে হয়ে যাবে।

আমি তো আসবই। কিন্তু আমার হয়ে তোমাকেও বলতে হবে ভাইদা।

ওরা ঘর থেকে বেরিয়ে এল। বাইরে উৎসাহী জেলে জিমনিদের মুখ। ভাইদা বলল, চল তোমাকে এগিয়ে দিই।

আলা ছেড়ে বাঁধের দিকে এগোতে শুরু করে ওরা।

কুড়ি

এ সব খবর চাপা থাকে না। মুহূর্তেই সারা তল্লাটে ছড়িয়ে পড়ল, বিষ খেয়েছে হাসি। নিজের কলঙ্ক আর লুকোতে না পেরে বিষ খেয়েছে।

কলঙ্ক বড় না জীবন বড়! হাসিই যেন প্রমাণ করতে চাইল, জীবনের কিছুই দাম নেই। লাজ-লজ্জা, কলঙ্ক এসবের হাত থেকে রক্ষা পেতে হলে জীবনকেও বিসর্জন দেওয়া যায়।

খবরটা এ কান সে কান হতে হতে শেষপর্যন্ত শিবুর কানেও এসে পৌঁছল। আর সঙ্গে সঙ্গে পায়ের নিচ থেকে মাটি যেন চড়াৎ করে সরে গেল। বেশ কিছুক্ষণ সময় লাগল ওর ধাতস্থ হতে।

প্রসন্নবাবুদের বাড়ির লাগোয়া বাগানে কোদাল দিয়ে মাটি কোপাচ্ছিল শিবু। মাটি সাইজ করে লঙ্কাচারা লাগাবার কথা। এমন সময় হেঁসেলের দিক থেকে প্রায় ছুটতে ছুটতে এল কপিলা, কি গো, তুমি যে এখনো এখানে? কেমন বাপ গো তুমি?

অবাক হয়ে তাকিয়েছিল শিবু, কেন, কি হয়েছে?

কি হয়েছে মানে! শোন নি কিছু?

শিবু ফ্যালফ্যাল করে তাকায়। হাত থেকে কোদালের বাটটা আপনি আপনি খসে যায়।

তোমার মেয়ে যে বিষ খেয়েছে, শোন নি?

বিষ খেয়েছে! শিবু তেমন গুরুত্ব দেয় নি প্রথমে। বিষ যে নয় শিবু তা ভালভাবেই জানে। ক্যানিং থেকে আনা ওষুধের পুরিয়াই ওর খাওয়ার কথা। কিন্তু সে কথা বাইরের লোক জানবে কি করে! অবাক না হয়ে পারে না ও।

কপিলা বলল, আশ্চর্য লোক তো তুমি! তোমার মেয়ের মরণদশা, আর তুমি দিব্যি এখানে মাটি কোপাচ্ছ। যাও, দেখগে যাও, মেয়েটা বোধহয় শেষই হয়ে গেল এতক্ষণে।

শিবুর এবার যেন কিছুটা টনক নড়ে, মরণদশা মানে?

কপিলা বলল, বিষ খেয়েছে গো। মুখ দিয়ে গ্যাঁজলা বেরুচ্ছে। মুকুন্দডাক্তারকে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল তোমার দাদা। ডাক্তার বলেছে, এখনতখন অবস্থা। হাসপাতালে পাঠাও।

কেমন যেন গোলোক ধাঁধায় পড়ে যায় শিবু। মুখ দিয়ে গ্যাঁজলা বেরুবে কেন! নগদ টাকা দিয়ে কেনা ওষুধ। তবে কি ক্যানিংয়ের

সেই জড়িবুটিঅলা ওকে ধোঁকা দিয়েছে!

মেয়েটাকে যে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে জানো না তুমি? হরিণচকের সবাই জানে, আর তুমিই জান না, আশ্চর্য!

শিবু আর অবিশ্বাস করতে পারে না। কি জানি বাবা, কি কেলেঙ্কারি হয়ে গেল কে জানে! এখন কি করবে ও। ক্যানিং গিয়ে সেই জড়িবুটিঅলার মাথায় ডাণ্ডা মেরে আসবে, নাকি—

কি হল গো! একবার যাও। তোমারই তো মেয়ে!

শিবু তবু ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়েই থাকে। কোথায়?

কোথায় মানে, হাসপাতালে তোমার যাওয়া উচিত নয়?

শিবু বলল, যাচ্ছি। তারপর কোদালটা কপিলার হাতে তুলে দিয়ে হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে গেল বাগান থেকে।

শিবুর মেয়ে বিষ খেয়েছে খবরটা হাটখোলাতে ছড়িয়ে গেল। তাই নিয়ে শুরু হয়ে গেল মুখরোচক নানারকম কথা। কত কুৎসা, ঠাট্টা আর হাসাহাসি। ও মেয়ের নাকি মরে যাওয়াই ভাল।

কিন্তু বিষ জোগাড় করল কোত্থেকে বল দেখি?

বিষ জোগাড় করা আবার কঠিন নাকি! বিষ চাই তোমার? আমাকে বলো, আমি জোগাড় করে দেব। পাঁচু মুদি এমন ভাব করল যেন ওর দোকানে বিষও কিনতে পাওয়া যায়।

হ্যাঁরে পেঁচো, তুই যে বিষ দিবি, সে বিষে লোক মরবে তো?

কেন?

তুই ভেজাল ছাড়া কিছু বিক্রি করিস নাকি! তোর বিষেও যে ভেজাল।

কি, আমি ভেজাল বিক্রি করি! আমার সব জিনিস ভেজাল! রুখে ওঠে পাঁচু।

ইতিমধ্যে ঢেঁকির মতো পা ফেলে ফেলে হিলহিলে সেই নুলো এসে হাজির। হাঁপাতে হাপাতে বলল, এইমাত্র হাসির বাবা খেয়ায় উঠে ওপারে গেল গো, দেখে এলাম।

তাই নাকি রে মুলো! তা তুইও তো সঙ্গে যেতে পারতিস!

মুলো বলল, যার ব্যথা সেই যাচ্ছে। তারপর আরো কিছু নতুন খবর দেওয়ার ভঙ্গি করে বলল, মেয়েটাকে কে বিষ খাইয়েছে জানো তো? ও নাকি নিজে বিষ খেতে চায়নি। ওকে জোর করে ধরে খাওয়ানো হয়েছে।

তাই নাকি, কে খাওয়ালো?

মুলো বলল, ভরত হালদার। শিবুবাবুর দাদা। মেয়েটা তো ওর কাছেই থাকত।

ঘটনাটা যেন সত্যি সত্যি একটা নতুন দিকে মোড় নিচ্ছে। পাঁচু জিজ্ঞেস করল, তুই কি করে জানলি? কে তোকে বলেছে?

ওই যে গো, খেয়া পার হওয়ার জন্য শিবুবাবু ঘাটে বসেছিল, সবাই জিজ্ঞেস করল, কি হয়েছে শিবু? তোমার মেয়ে নাকি বিষ খেয়েছে? তা শিবু মাথা নাড়ল, খেয়েছে।

খেয়েছে! কী সাংঘাতিক কাণ্ড! নিজে নিজে বিষ খেল?

নিজে খাবে কেন, নিজে নিজে কেউ বিষ খায়, ওকে ওর জেঠা জোর করে খাইয়ে দিয়েছে।

এতগুলো কথা একসঙ্গে বলে ফেলে মুলো আবার হাঁফাতে থাকে।

পাঁচু বলল, তার মানে পেছনে একটা ষড়যন্ত্র আছে। এবার পুলিশ ওদের নাজেহাল করে ছাড়বে।

কি প্রমাণ আছে যে ভরত বিষ খাইয়েছে?

কোর্ট-কাছারি হলে প্রমাণ ঠিক বেরিয়ে পড়বে।

প্রমাণ আছে কি নেই, তা নিয়ে আর এক কাহন হয়ে গেল।

ওদিকে খবরটা মামুর কানেও পৌঁছতে বেশিক্ষণ সময় লাগল না।

মামু, পচা, দেবু আর ভানু কার্তিকপুজোর চাঁদা তোলার জন্য ভোরে ভোরে পুঁইখালি পেরিয়ে হাঁসুয়া গিয়েছিল। পুঁইখালির জলকরের অবস্থা এখন পড়তির দিকে। কিন্তু যত পড়তিই হোক, কার্তিক পুজোর চাঁদা না দিলে ছাড়ে কে! ওদের নামে কমসম করে একশ টাকাই ধরেছিল মামুরা। তারপর হাঁসুয়া কো-অপারেটিভের

সেক্রেটারি রাধা ঘোষের বাড়ির দরজায় গিয়ে হাজির হয়েছিল।

নমস্কার রাধাবাবু, আমরা হরিণচক থেকে আসছি।

কি ব্যাপার?

আমাদের ওখানে লঞ্চঘাটে কার্তিক পুজোর আয়োজন করা হয়েছে।

কার্তিক পুজো! রাধা ঘোষের চোখ কপালে ওঠে।

হ্যাঁ, কার্তিক পুজো। চাঁদা নেবার জন্য কবে আসব বলুন?

চাঁদা। হরিণচকে পুজো হবে, তা এখানে চাঁদা কেন?

আপনাদের জলকর তো এখানে, তাহলে মাছ নিয়ে হরিণচকের কাঁটাদারদের বাজারে যান কেন? পাল্টা প্রশ্ন মামুর।

আমি ঠিক ওভাবে বলিনি। আসলে কার্তিক পুজোর আবার চাঁদা কি! ঠিক আছে, পকেট থেকে একটা পাঁচ টাকার নোট বার করে দিয়েছিলেন রাধা ঘোষ।

এটা কি ভিক্ষে নাকি! পাঁচ টাকা চাঁদার জন্য এতদূর কেউ আসে!

কত দিতে হবে তাহলে? রাধা ঘোষ ভ্রূ তুলে তাকান।

আপনাদের নামে কমই ধরেছি। আমাদের ওখানে অক্ষয়বাবুদের জলকরের জন্য পাঁচশ' টাকা ধরা হয়েছে, আপনাদের জন্য তিনশ'।

ভানু বলল, আপনাদের এই জলকর যদি হরিণচকে হত, হাজার টাকা ধরতাম।

বটে! কিন্তু চাঁদা ধরলেই তো আর দেওয়া যায় না। আমাদের এটা কো-অপারেটিভ। এখানে এক টাকা খরচ করতে হলেও কমিটিতে পাশ করিয়ে নিতে হয়। অত টাকা তো ভাই আমার পক্ষে দেওয়া সম্ভব নয়। আমি আমার পকেট থেকে বড় জোর পাঁচ টাকা দিতে পারি, আর আমার ক্ষমতা নেই।

মামু যখন হাসে, নিচের ঠোঁটটা একটু ঝুলে পড়ে। এ সময়ও ঝুলে পড়ল। পচা বলল, তাহলে দিন সাতেক পরে আবার আমরা আসব, মিটিং-ফিটিং কি করবেন করে টাকাটা রেডি রাখবেন।

ওরা গটমট করে বেরিয়ে এল রাধা ঘোষের বাড়ি থেকে। তারপর সটান শিবতলার খেয়াঘাটে। খেয়া পেরিয়ে হরিণচকে। তখনো কানে আসেনি, বিষ খেয়েছে হাসি।

লঞ্চঘাটে নেমে মামু বলল, তোরা এগো, আমি একটু ঝুপড়িতে পাত্তা লাগিয়ে আসি। হাটখোলায় গিয়ে বোস তোরা।

হাটখোলায় গণেশের চায়ের দোকানে মামুদের আড্ডার জায়গা। ওরা তিনজনে সেদিকে এগিয়ে গেল। মামু তিন লাফে একেবারে ঝুপড়ির সামনে।

জায়গাটা বেশ ভাল করে ঘিরে নিয়েছে মেয়েগুলো। তুলসী মঞ্চে তুলসী গাছটা বেশ লকলকিয়ে উঠেছে। উঠোনটা বেশ পরিষ্কার।

মামু একটা ঝুপড়ির সামনে এসে ডাকল হিমি আছো নাকি? এক গ্লাস জল খাওয়াও তো। বলতে বলতে মাথা নিচু করে ভেতরে ঢুকে পড়ে মামু।

হিমি, বেলা, ময়না ছুটে এল। ছুটে এল আরো কয়েকটা মেয়ে। যেন শিবুর মেয়ে সম্পর্কে কিছু শুনবে আশা করেই জিজ্ঞেস করল, শিবুর মেয়ে বেঁচে আছে তো মামু?

শিবুর মেয়ে! কেন, কি হয়েছে? কেমন অবাক হয়ে তাকায় মামু।

ওমা তুমি জানো না, বিষ খেয়েছে যে।

বিষ খেয়েছে! মামুর চোখের তারা কেমন অদ্ভুত দেখায়! বিষ খেয়েছে, কই জানি নাতো! কে বললে?

ওমা, এ আবার বলাবলির কি, সবাই জানে। কিছুক্ষণ আগে শিবুও ছুটতে ছুটতে ওপারে গেল। শিবতলার হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে মেয়েটাকে।

এমন উত্তেজিতভাবে মেয়েগুলি বলতে শুরু করল যে মামুর কাছে আর অবিশ্বাস করার রইল না।

এক শিশি ফলিডল নাকি ঢকঢক করে গলায় ঢেলেছে মেয়েটা। বলো তো কি কাণ্ড!

হাসপাতালে নিয়ে গেছে, অথচ আমরা তো ওপার থেকেই এলাম। কারো মুখে কিছু শুনলাম নাতো। আশ্চর্য!

মেয়েটা এতক্ষণ বেঁচে আছে কি না কে জানে।

মামু একবার এদিকওদিক তাকায়, ঠিক আছে, আমি দেখছি। এক গ্লাস জল খাওয়াতে বললাম না?

ঘরের এক কোণে একটা কুঁজো আর প্ল্যাস্টিকের গ্লাস, তাই থেকে জল ঢেলে এগিয়ে ধরে হিমি, নাও।

মামু জলের গ্লাসটা হাতে তুলে বলল, মেয়েটা হতভাগা। বিষ খেয়ে কার কি উপকার করবে শুনি? মরুক গে যাক্, যত মরে তত ভালো।

জলের গ্লাসটা ফাঁকা করে দিয়ে আবার মেয়েগুলোর দিকে তাকায় মামু, কার্তিক পুজোর ফর্দটর্দ সব রেডি তো? সকালে আমরা চাঁদা তুলতে বেরিয়েছিলাম।

হিমি বলল, ওমা, আমরা কি ফর্দ রেডি করব! ফর্দ তো পুরুত দেবে। আমরা ওসব বুঝি নাকি!

না বুঝলে পুজো কেন। সব শালা মামুকেই করতে হবে। মামুর সময় কোথায়?

সবাই চুপ করে থাকে।

বেলা বলল, পুরুতের বাড়িও চিনি না যে যাব।

ঠিক আছে যেতে হবে না তোদের। আমরাই আনিয়ে নেব। ফর্দটা না পেলে ঠিক বোঝাই যাচ্ছে না, কি কি লাগবে, কি খরচ হবে।

হিমি বলল, কুমোরকেও মূর্তি গড়তে দিতে হবে। মূর্তি ছাড়া পুজো জমে না।

বটে! সেটাও আমাকেই শালা করতে হবে! ঠিক আছে, আমিই মূর্তির অর্ডার লাগিয়ে আসব।

কার্তিকঠাকুর যেন এই এত বড়টি হয় গো। বুঝলে?

বেলা বলল, দেখতে ঠিক যেন তোমার মত হয় মামু। তোমার

মতো কার্তিক না হলে ঠিক জমবে না।

বটে! মামু ভ্রূ তুলে তাকায়, রস কত!

মাসি বলল, ঠাকুরদেবতা নিয়ে ঠাট্টা ভাল নয় বেলা, তুই থাম।

মামু দাঁতে দাঁত ঘষে তাকায়, সে দিনকার সেই গালের চড়টা এখনো ভোলে নি মনে হচ্ছে।

হিমি হাসে, চড় খাওয়ার জন্যই তো আমরা জন্মেছি গো মামু। ও আমাদের গা সওয়া।

বটে! আমরা আছি বলে তবু টিকে আছিস এই হরিণচকে। নইলে কবে এই ঝুপড়িগুলো তুলে নদীতে ভাসিয়ে দিত, টের পেতি।

মাসিও সায় দেয়, তা তো বটেই।

যাক গে, ও সব থাক, আর একটা কথা জানিয়ে রাখি, জলকরের খোত মালিক অক্ষয়বাবু আসছেন শুনেছিস?

ওদের পক্ষে শোনার কথা নয়। হাঁ করে তাকিয়ে থাকে ওরা।

মাসি শুধোয়, কেন গো? কবে?

বুধবার আসবে বলে শুনেছি। জলকরে কি হচ্ছে না হচ্ছে দেখতে আসবে।

কি হচ্ছে?

টাকা মেরে মেরে ফাঁক করে দিচ্ছে ওই শালা ম্যানেজার। এ সময় তোদেরও একটা কাজ করতে হবে।

কি?

তোরা সবাই মিলে একদিন অক্ষয়বাবুর কাছে অভিযোগ জানাতে যাবি। দল বেঁধে সবাই মিলে হৈ চৈ করে আসবি, বুঝলি?

অভিযোগ! কি অভিযোগ?

সেদিন ভাইদা এসে তোদের ঘরে ঢুকে চোটপাট করে গেল, মনে নেই? বলবি, গায়ে হাত তুলেছে ভাইদা, তোদের কাপড় ধরে টানাটানি করেছে। ঘরের জিনিসপত্র ভাঙচুর করেছে। বানিয়ে বানিয়ে আরো কত কিছু বলা যায়।

ওরা ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে।

মামু বলল, সুযোগ যখন পাওয়া গেছে, তোরাই বা ছাড়বি কেন! লোকটাকে ঘায়েল করার এটাই কিন্তু সময়।

মাসি ফ্যালফ্যাল করে তাকায়, বললেই বিশ্বাস করবে?

সবাই মিলে কান্নাকাটি করে পায়ে লুটিয়ে পড়বি। আরে বাবা, মেয়েছেলের কান্নার সবটাই বিফলে যায় না। যাক গে, আমি উঠি এবার। মামু উঠে দাঁড়ায়, হাসির খবরটা একটু নেওয়া দরকার।

ঝুপড়ির ভেতর থেকে বেরিয়ে এল মামু। তারপর ব্যস্ততা দেখিয়ে হনহন করে হাঁটা দিল হাটখোলার দিকে।

ঝুপড়ির মেয়েগুলো ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়েই রইল।

একুশ

নামেই চ্যারিটেবল ডিসপেনসারি, হাসপাতাল। কয়েক বিঘা জমির ওপর টানা লম্বা দু'খানা টিনের শেড। একটা আউটডোর একটা ইনডোর। হাসপাতালে ঢুকবার মুখে খান দু'য়েক বড় বড় ত্রিকোণ মার্কা পোস্টার, হাম দো হামারা দো। পোস্টারগুলিই মনে করিয়ে দেয় ওটা হাসপাতাল, নইলে শিবতলার এই হাসপাতালের অন্য কোন বৈশিষ্ট্য নেই।

বছরের বেশির ভাগ সময়ই এ হাসপাতালে ডাক্তার থাকে না। নতুন নতুন ডাক্তার আসে আর যায়। মাস কয়েক আগেও কলকাতা থেকে সদ্য পাশ করা এক অল্পবয়সী ডাক্তারকে এখানে এসে দায়িত্ব নিতে দেখা গিয়েছিল কিন্তু বেশি দিন টিকতে পারেন নি। এই পাণ্ডববর্জিত দেশে কেই বা আর থাকতে চায়। কলকাতায় যাবার নাম করে সেই যে একবার কাটলেন আর ফেরেন নি। ফলে এল এম এফ পাশ করা গাঁয়ের শরৎ ডাক্তার আর তার দীর্ঘ দিনের সহচর তারাপদ কম্পাউণ্ডারই এ হাসপাতালের ভরসা। শরৎ ডাক্তারের যথেষ্ট বয়স হয়েছে, এখন আর অত পরিশ্রম করতে পারেন না। কম্পাউণ্ডার তারাপদই গলায় স্টেথিস্কোপ ঝুলিয়ে হাসপাতালে তার

সাম্রাজ্য বিস্তার করে রেখেছে।

সেই তারাপদর সাম্রাজ্যে হাসিকে এনে যখন তোলা হল, তখন মেয়েদের জন্য তিনটি বেডের একটিও খালি নেই। কিন্তু এ হেন রুগিকে ফিরিয়েও দেওয়া যায় না। মেঝেতেই রাখার বন্দোবস্ত করা হল। তারাপদর সাফ কথা, মাটিতেই থাকতে হবে বলে রাখছি, বেড যখন খালি হবে তখন বেডে তোলা হবে।

মেঝেতে একটা কম্বলের ওপর শোয়ানো হল হাসিকে। তেল চিটচিটে একটা ইটের টুকরোর মতো বালিশ গুঁজে দেওয়া হল মাথায়, একটা নোংরা চাদর এনে ঢেকে দেওয়া হল সারা গায়ে।

শরৎ ডাক্তার রুগির দিকে তাকিয়েই প্রশ্ন করলেন, অন্তঃসত্ত্বা নাকি?

আজ্ঞে!

পেটে বাচ্চা রয়েছে মনে হচ্ছে?

আজ্ঞে ডাক্তারবাবু।

কি আজ্ঞে আজ্ঞে করছেন, এ সময় একটু সাবধানে থাকতে হয় জানেন না? কি খেয়েছে শুনি? লক্ষণটা একদম ভালো লাগছে না মশাই।

হাঁ করে তাকিয়ে থেকেছিল ভরত হালদার।

কি হল? জবাব নেই কেন, বিষ গেলে নি তো? বিষ যদি খেয়ে থাকে তাহলে কিন্তু কিছুই করার নেই আমাদের। রুগিকে কলকাতা নিয়ে যেতে হবে।

কলকাতা। কলকাতা কি করে নেব ডাক্তারবাবু! কলকাতা কি এখানে!

তা আমরা কি করব। পাম্প করে বিষ বার করার যন্ত্র নেই এখানে।

ভরত হালদারের মুখ শুকিয়ে উঠেছিল, এ আমার মেয়ে নয় ডাক্তারবাবু, এ আমার ভাইয়ের মেয়ে। শিবু হালদারের নাম শুনেছেন, তার মেয়ে। বাপ হয়ে মেয়েটার দিকে ফিরেও তাকায় না, আমি কি করব বলুন?

শরৎ ডাক্তার মানুষ চিনতে খুব একটা ভুল করেন না, ভরতের চোখের দিকে সরাসরি তাকালেন, ব্যাপারটি বলুন দেখি মশাই, মেয়ের কপালে তো সিঁদুর দেখছি না, অথচ—

ভরত কিছুক্ষণ আমতা আমতা করে কি যে বলল ঠিক বোঝা গেল না। আসলে পালাতে পারলে যেন বাঁচে ও। শেষপর্যন্ত কোনরকমে হাসিকে হাসপাতালে ফেলে রেখেই ও পালিয়ে এল।

খবর পেয়ে শিবু যখন এল, তখন চোয়াল শক্ত হয়ে উঠেছে হাসির। মাথাটা বাঁকা হয়ে বালিশের পাশে ঝুলে রয়েছে। সারা শরীরে যে অসম্ভব যন্ত্রণা, তা ওর চোখমুখের ভঙ্গি দেখেই বোঝা যাচ্ছে।

শিবু হাঁপাতে হাঁপাতে হাসির বিছানার পাশে বসে পড়ল। বিছানার তিন পাশে তিনটে খাট, তাতেও রুগি রয়েছে। দুটো খাটে দুটো বউ, একটাতে এক বুড়ি মতন। কি অসুখ এদের কে জানে! জানবার তখন বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই শিবুর। মেয়ের মুখের দিকেই হাঁ করে কেবল তাকিয়ে থাকে। হাসি, ও হাসি, খুব কষ্ট হচ্ছে মা?

হাসি একেবারে যে অচৈতন্য তাও মনে হয় না। বাপের মুখের দিকে তাকিয়েই ঝরঝর করে কেঁদে ফেলে। কাঁদে, চোখ দিয়ে জল ঝরে কিন্তু গলা দিয়ে কোন শব্দ বেরয় না।

খুব কষ্ট হচ্ছে মা? হাসির মাথাটা বালিশের ওপর আবার ঠিক করে তুলে দেয় শিবু। তারপর মাথায় হাত বোলাতে থাকে।

পাশের খাটের বুড়িটা খাটের ওপর উঠে বসেছে ততক্ষণে, তোমার মেয়ে?

শিবু বুড়ির দিকে তাকায়।

কেমন মেয়ে গো বাবু, পেটে বাচ্চা রয়েছে। লজ্জা ঢাকতে বুঝি বিষ গিলেছে।

শিবুর ইচ্ছে হল ঠাস করে বুড়িটার গালে একটা চড় কষিয়ে দেয়, কিন্তু এটা হাসপাতাল। ফলে, কোন উত্তর করে না। আবার চোখ ঘুরিয়ে আনে হাসির দিকে।

তা বাপু, কি কর তুমি? কোথাও কাজটাজ কর তো?

শিবু আবার বুড়ির দিকে তাকায়, কেন?

কেন কি, সঙ্গে যদি পয়সা কড়ি থাকে, কম্পাউণ্ডারবাবুর হাতে কিছু গুঁজে দাও গে যাও, মেয়ের যদি ভাল চাও তো করগে যাও।

শিবু বলল, আমি জলকরে কাজ করি। হরিণচকের জলকরে।

জলকরে কাজ করলে তো ভালই। কিছু চিংড়ি তুলে দিয়ে এস না। ডাক্তারবাবুদের খুশি রাখলে কাজটা তোমার হবে, নইলে তোমার মেয়ের যা হাল দেখছি বাবু, মোটেই ভাল লাগছে না।

জলকরের চিংড়ি আমায় দেবে কেন! তাছাড়া—, এ হাসপাতালে তো পয়সা লাগে না বলে জানি।

পয়সা লাগে না, আবার লাগেও।

কি রকম?

বুড়ি ফোকলা দাঁতে হাসে, তোমার মেয়েকে তো মাটিতে ফেলে রাখল, কিছু ভেট দিয়ে এলে খাট এসে যাবে এক্ষুনি।

হাঁ করে এবার বুড়ির দিকে তাকিয়ে থাকে শিবু। কিছু টাকা তো ও এখনই ম্যানেজারবাবুর কাছ থেকে নিয়ে আসতে পারে। ম্যানেজার-বাবুর কাছে ওর অনেক টাকাই পাওনা আছে। একটু অন্যমনস্ক হয়ে যায় ও।

বুড়ি বলে, তা বাপু একটা কথা জিজ্ঞেস করব?

শিবু আবার সম্বিত ফিরে পায়, কি কথা?

মেয়েকে তো এখনো বিয়ে দেওনি বলেই মনে হচ্ছে।

শিবু বুঝতে পারে কি জানতে চাইবে এবার। মুখ ঘুরিয়ে আবার হাসির মাথায় হাত বুলোতে শুরু করে শিবু।

মেয়ের বিয়ে হয় নি, অথচ এ অবস্থা হয় কি করে?

শিবু বুড়ির কথায় কান দেয় না। উত্তরও দেয় না।

তা বাপু তোমায় আমি দোষ দিই না, আজকালকার মেয়েগুলো কোথায় নামতে পারে ভাবা যায় না, ঘেন্না ঘেন্না।

শিবু মুখ ঘোরায়, তারাপদ কম্পাউণ্ডারকে তাহলে কিছু টাকা

দেব বলছ, মাটিতে ফেলে না রেখে খাটে শোয়াবে বলছ ?

বুড়ি কুতকুত করে তাকায়, আমাকেও কি খাট দিয়েছিল নাকি প্রথমে, আমার খোকা তো এসব জানে, টাকা ছাড়তেই আমাকে খাটে তুলেছে।

শিবু বলল, ঠিক আছে, আমি এখনই তাহলে কথা বলে আসি। মেয়েটার দিকে একটু নজর রেখ বুড়ি মা। আমার কপাল খারাপ, তাই আজ এ অবস্থা আমার, তোমাকে আর কি বলব।

বুড়ি খুশি হয়। তুমি কিচ্ছু ভেব না বাপু, আমি যতক্ষণ আছি কিচ্ছু ভেব না। তা বাপু, মেয়ে ভাল হয়ে গেলে এবার থেকে কিন্তু সাবধানে থেক। এতবড় মেয়ে সব সময় নজরে রাখতে হয়।

শিবু মাথা নাড়ে, ঠিক আছে। তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

ঘর থেকে বেরুতেই কেমন বোকা বোকা লাগে নিজেকে। বাইরে ধু ধু রোদ, মাঠের মধ্যে ছু'চারটে গরু ঘুরছে। আউটডোরের দিকে গেলে হয়তো তারাপদ কম্পাউণ্ডারকে পাওয়া যেতে পারে কিন্তু ওদিকে এগোতেও কেমন ভয়ভয় লাগে। গেলেই তো জিজ্ঞেস করবে, মেয়ে বিষ খেল কেন ?

বিষ ! তবে কি ক্যানিংয়ের সেই জড়িবুটিওলা বিষই পুড়িয়া করে ওর হাতে তুলে দিয়েছিল। রাগে থরথর করে কাঁপতে থাকে ও। শালাকে আবার গিয়ে ধরতে হবে। হাসির যদি কিছু হয়, শালাকে খতম না করেছি তো আমি মানুষই নই।

আরো কিছুক্ষণ বোকার মতো তাকিয়ে থাকে শিবু, তারপর ভাবে, ম্যানেজারের কাছেই যাওয়া যাক। অনেক টাকা পাওনা আছে ওর, টাকাগুলো এবার গিয়ে নিয়ে আসা যাক। বিপদের সময় যদি না পাওয়া যায়, তাহলে কি হবে ওই টাকা দিয়ে।

হাসপাতাল ছাড়িয়ে হাঁটা শুরু করে ও। প্রথমে একটু ধীরে ধীরে, তারপর একরকম প্রায় ছুটতেই শুরু করে শিবু। মাথার ভেতরটা কেমন যেন ফাঁকা ফাঁকা লাগছে।

দৌড়তে দৌড়তে প্রায় শিবতলার খেয়া ঘাটেই চলে এল ও। খেয়া

নৌকোটা খানিকক্ষণ আগেই হয়তো ছেড়েছে, মাঝ নদীতে দেখা যাচ্ছে, ওপারের দিকে চলেছে। যাত্রী নামিয়ে এপারে আসতে আসতে বেশ কিছু সময় যাবে, বুঝতে পারে ও।

ঘাটের কাছে এসে থমকে দাঁড়িয়ে থাকে শিবু। বহুদূরে হরিণচকের জলকর দেখা যাচ্ছে। কেমন ধু ধু নির্জন মাঠের মতো। আর এদিকে ওপারের খেয়াঘাটের পাশেই হিমিদের সেই ঝুপড়িগুলো। হিমির মুখটাই চোখের ওপর ভেসে ওঠে ওর। মেয়েটা বড় ভালো। সত্যি সত্যি ভালো। শিবুর সুখদুঃখ নিয়ে কেই বা আজকাল অত মাথা ঘামায় হিমি ছাড়া। মেয়েটাকে ঝুপড়ি থেকে বার করে নিয়ে অন্য কোথাও পালিয়ে গেলে কেমন হয়। কথাটা যে মাঝেমাঝে মাথায় না আসে এমন নয়, কিন্তু কত কথাই তো মাথায় আসে, সব কি আর জীবনে ঘটে। ঘটা সম্ভব নয়। যেমন, হাসিকে ছেড়ে কোথাও যাওয়া সম্ভব নয় ওর। মা মরা মেয়েটার দুঃখ কে বুঝবে ও ছাড়া।

পরক্ষণেই আবার দাঁত কিড়মিড় করে ওঠে ও। শালা, ক্যানিংয়ের সেই জড়িবুটিঅলাকে দু' টুকরো না করেছি তো আমি শিবুই না।

পেছন থেকে কে যেন এসময় ওর নাম ধরে ডেকে উঠেছে, চমকে ওঠে শিবু।

লোকটার পরনে ধুতি, গায়ে হাফ হাতা একটা শার্ট, মাথায় ছাতি।

শিবু না? লোকটা প্রশ্ন করে।

শিবু চিনতে পারে কানাইবাবুকে। পঞ্চায়েতের ভোটে প্রসন্নবাবুর সঙ্গে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হয়েছিল কানাইবাবুর। ভোটে হেরে যাওয়ার পর অনেকদিন মুখ দেখা যায় নি লোকটার।

শিবু উত্তর করে, আজ্ঞে বাবু আমি শিবু।

তা এ'দিকে কি মনে করে? কানাইবাবু শিবুর কাছাকাছি এগিয়ে আসেন।

আজ্ঞে বাবু একটু হাসপাতালে গিয়েছিলাম।

হাসপাতালে, কেন? কি হয়েছে?

আমার কিছু হয় নি, আমার মেয়ের?

কি হয়েছে মেয়ের ?

শিবু কেমন অস্বস্তিতে পড়ে। হাসির কথা কি ভাবেই বা বলা যায়। বলল, কি জানি বাবু, খুব অসুখ। হাসপাতালে ভর্তি করে দিয়ে এলাম।

কানাইবাবু শিবুর আপাদমস্তক দেখে নেন, হাসপাতালে তো ডাক্তারফাক্তার কিছুই নেই, কি চিকিৎসা হবে ওখানে ?

শিবু কোন উত্তর দেয় না।

কানাইবাবুই আবার প্রশ্ন করেন, তা তোদের জলকরের খবর কি ?

আজ্ঞে ভাল।

মাঝখানে কি সব ডাকাতি হয়ে গেল শুনলাম ?

শিবু মাথা নাড়ে, হয়েছে। কাঁটাদারদের বাজারে মাছ আসছিল, পথে ডাকাত পড়েছিল, মাথায় ডাণ্ডাফাণ্ডা মেরে তিন ঝুড়ি মাছ লুট করে নিয়ে গেছে।

প্রসন্নবাবু কি বলে ?

শিবু বোকার মতো তাকায়। জলকরের ও থোড়াই খবর রাখে, কি বলবে! তাছাড়া প্রসন্নবাবুর সঙ্গে ওর সম্পর্ক থাকতে পারে কিন্তু কতটুকুই বা প্রসন্নবাবুর খবর রাখে শিবু।

খোঁজ নিয়ে দেখ গে, ডাকাতির পেছনে প্রসন্নবাবুরও হাত থাকতে পারে।

আজ্ঞে!

অবশ্য তোমাদের কাছে এ সব বলে লাভ নেই, তোমাদের জলকরের ম্যানেজার ও, তোমরা বিশ্বাস করবে কেন!

আজ্ঞে তা না বাবু—দারোগাসাহেবকে সঙ্গে করে নিয়ে অনেক ছুটোছুটি করেছিলেন প্রসন্নবাবু।

হাঁ হাঁ করে হেসে উঠলেন কানাইবাবু, জীবনদারোগার সঙ্গে প্রসন্নবাবুর গ্লাসের বন্ধুত্ব। প্রসন্নবাবু কিছু করলে ওই জীবনদারোগা চোখ বুজে থাকবে। আসলে ওসব হচ্ছে লোক দেখানো ব্যাপার।

শিবু আবার খেয়া নৌকাটার দিকে তাকায়, নৌকাটা ওপার ছুঁয়েছে। লোক নামছে, লোক উঠছে।

এখন তো জলকরে ডাকাতি হচ্ছে, এর পরে বাড়ি বাড়ি ডাকাতি হবে। হরিণচকের বারোটা বাজিয়ে ছাড়বে ওই লোকটা।

শিবু কথা বলে না, হাঁ করে কেবল শোনে।

কানাইবাবু বলেন, আসলে এমনিতে লোকটা ভাল, কিন্তু ওর সব চেয়ে বড় দোষ কি জানো ?

শিবু শোনার জন্য তাকায়।

ওর সব চেয়ে বড় দোষ হচ্ছে, ও পয়সা ছাড়া আর কিছুই বোঝে না। লঞ্চঘাটের মাগীগুলোর কাছ থেকেও ও পয়সা খায়। বাজারের মেয়ে মানুষের কাছ থেকেও যে পয়সা খেতে পারে, তার পক্ষে সব কিছুই সম্ভব।

শিবুর কেমন খারাপ লাগে কথাটা। হিমি, বেলারা রোজগারের টাকা থেকে প্রসন্নবাবুকে যে কিছু কিছু দেয়, এটা আর যেই বিশ্বাস করুক ও করবে না। ও হিমিকে যেভাবে চেনে, তাতে প্রসন্নবাবু টাকা খেলে নির্ঘাত ও শুনতে পেত।

বিশ্বাস হল না ?

শিবু বলল, এসব কথা আমি শুনি নি বাবু !

তা শুনবে কেন, চোখকান বুজে থাকলে কেউ শুনতে পায় না। সে যাক গে, একটা কথা বলব ?

শিবু তাকায়।

ওখানে তোমাদের কত করে দেয় মাসে মাসে ?

ওখানে মানে, জলকরে ?

হ্যাঁ, জলকর ছাড়া আর কার কথা বলছি।

শিবু বলল, তিন শ'। আগে আড়াই শ' দিত, এখন তিন শ'।

ভাল। তিন শ' টাকা খারাপ নয়, তা আমরা যদি তোমাদের কয়েকজনকে সাড়ে তিন করে দেই আমাদের কাছে আসবে ?

শিবু ঠিক বুঝতে পারে না।

বুঝলে না? আমরাও এখানে একটা জলকর করছি। আর কিছু দিনের মধ্যেই কাজ শুরু করব ভাবছি।

কথাটা শিবুরা যে একেবারে না শুনেছে এমন নয়, ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে।

খেয়া নৌকো এগিয়ে আসছে, প্রায় মাঝ নদী পর্যন্ত এসে গেছে।

কানাইবাবু বললেন, সাড়ে তিনশ' টাকা করে এখানে কেউ দেবে না, কাজ করবে তো বলো, যত রকম সুযোগসুবিধা চাও, সব দেব।

শিবু বলল, তা যখন বলছেন, করব।

ঠিক আছে, ওখান থেকে আরো দু'চারজন যদি আসে বলে দেখ না।

শিবু তাকায়, আমার সঙ্গে ওখানে কারো ঠিক বনে না বাবু। তবে দু' একজনকে বলতে পারি, আসবে কিনা জানি না।

ঠিক আছে বলে দেখ, পারলে কালই একবার দেখা করো। তোমার মেয়ের ব্যাপারে তারাপদ কম্পাউণ্ডারকে যদি কিছু বলে দিতে হয়, আমি বলে দেব।

শিবুর চোখদুটো এবার ছলছল করে ওঠে, আমার মেয়েটাকে বাবু ওখানে মাটিতে শুইয়ে রেখেছে। একটা খাটও দেয়নি।

কেন, খাট কি হল?

মেয়েদের জন্য তিনটে খাট, তিনটে খাটেই রুগি রয়েছে।

কানাইবাবু ভুরু বাঁকা করলেন, ঠিক আছে আমি দেখছি। আসলে কি জানো, সব হয়েছে ঘুঘুর বাসা। কেউ কিছু বলে না, তাই যা ইচ্ছে করে যাচ্ছে। তুমি কিচ্ছু ভেব না, বিকেলে ওখানে গিয়ে আমি খোঁজ নিয়ে আসব।

ততক্ষণে খেয়া এসে পড়েছিল ঘাটে। কানাইবাবু বললেন, চলো ওপারে যাবে তো?

দু'জনে বাঁধ থেকে নেমে খেয়ায় গিয়ে উঠে বসে।

নদীতে এখন মাঝ ভাঁটা। এই রকম এক ভাঁটার সময়ই হাসির মাকে কামটে টেনে নিয়ে গিয়েছিল। শিবু লক্ষ করল, নদীর ধারে

ধারে আজও অনেক মেয়ে বউ মাছের চারা তোলার জন্য জলে নেমে ঘোরাঘুরি করছে। কই, কাউকে তো ধরে না, অথচ হাসির মাকেই ধরে নিয়ে গেল। কপাল, সবই কপাল! একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে শিবু। তারপর চুপ করে নদীর দিকে তাকিয়ে বসে থাকে।

বাইশ

অবশেষে ক্যানিং থেকে লঞ্চে চেপে হরিণচকের দিকে রওনা হলেন অক্ষয়বাবু। সঙ্গে রাইচরণ। হরিণচকের লঞ্চঘাটে যখন এসে পৌঁছলেন তখন দিনের আলো প্রায় মরে এসেছে।

লঞ্চঘাটে ভাইদা তো বটেই, প্রসন্নবাবুও তৈরি ছিলেন। পান থেকে যাতে চুন না খসে তার তৎপরতা। দূরে লঞ্চটাকে দেখা যেতেই ওরা উঠে দাঁড়ালেন, হ্যাঁ, এসেছেন; ওই তো দেখা যাচ্ছে!

ঘাটের কাছাকাছি আসতেই লঞ্চ থেকে হাত নাড়লেন অক্ষয়বাবু। খুশিখুশি মুখ। যাক বাবা, এসেছেন তাহলে। সবাই নিশ্চিন্ত। কিন্তু সঙ্গে লোকটি কে হে? জিজ্ঞেস করলেন প্রসন্নবাবু।

ভাইদা বলল, চিনলেন না, ও রাইচরণ। বাবুর বহু দিনকার পুরোন চাকর। অক্ষয়বাবু একা একা না এসে ভালই করেছেন।

ঘাটে এসে লঞ্চ ভিড়তেই ভাইদা আর প্রসন্নবাবুর চেঁচামেচি শুরু হয়ে গেল। বিনোদকে বলা ছিল, লঞ্চ ভিড়লেই ও লাফিয়ে উঠে পড়বে। তাই করল বিনোদ। প্রসন্নবাবু চেঁচিয়ে উঠলেন, অক্ষয়বাবুকে হাত ধরে নামাস বিনোদ, কাঠের পাটা কিন্তু পেছল হয়ে আছে।

অক্ষয়বাবু হাসলেন, হাসিতে বনেদিআনা ঝড়ে পড়ল। থামো বাপু, আমি একাই নামছি।

পরণে চওড়া পাড় ধুতি, গায়ে ফিনফিনে কলি তোলা আদ্দির পাঞ্জাবী, হাতে বেতের একটা সরু লাঠি। টানটান শরীরটা লাঠির ওপর ভর রেখে নেমে এলেন অক্ষয়বাবু।

ঘাটে নামতেই প্রথমে ছুটে গিয়ে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম সেরে

নিল ভাইদা। বিনোদ আর ব্রজলালরাও ভাইদার দেখাদেখি প্রণাম সারল। প্রসন্নবাবুও এগিয়ে এসে হাত জোড় করে প্রণাম জানিয়ে কুশল জিজ্ঞেস করলেন, শরীরটরির ভালো তো?

ভাল ঠিক বলা যায় না, তবে চালিয়ে যাচ্ছি আর কি! আপনারা ভালো তো?

প্রসন্নবাবু বললেন, প্রথমে কিন্তু আমাদের বাড়িতে পা রাখতে হবে অক্ষয়বাবু। জলটল খেয়ে তারপর আপনাকে আলায় নিয়ে যাব।

ঠিক আছে, তাই হবে। তবে আলাতেই আমার থাকার ব্যবস্থা করেছেন তো? দালানকোঠায় তো জন্ম থেকেই থাকছি, দু' তিনটে রাত আলায় থাকতে খারাপ লাগবে না।

ভাইদা বলল, আলাতেই সব বন্দোবস্ত করেছি হুজুর। সব গুছিয়ে রেখেছি।

ঠিক আছে, চল।

ওদিকে অক্ষয়বাবুকে দেখার জন্য ভেড়িতে তখন বেশ ভিড় জমে গেছে। সতীশ কাঁটাদারকেও দেখতে পেল ভাইদা। কিন্তু সারাদিন লঞ্চে কাটিয়ে এসেছেন অক্ষয়বাবু, এখন আর ওর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেওয়ার সময় নেই। পরে তো সবার সঙ্গে আলাপ হবেই।

ভাইদা বলল, আসুন অক্ষয়বাবু, আমরা এগোই। এই বিনোদ, মালগুলো নিয়ে তোরা সব আলায় চলে যা। রাইচরণ না হয় আমাদের সঙ্গেই থাকুক, আমরা এক সঙ্গেই আলায় ফিরব।

কিন্তু সবে ওরা দু' চার পা মাত্র এগিয়েছে, অমনি একটা নাটকীয় ঘটনা ঘটে গেল। লঞ্চঘাটের সেই ঝুপড়িগুলোর ভেতর থেকে ছুটতে ছুটতে এগিয়ে এল মাসি। কেমন আলুথালু চেহারা। এসেই অক্ষয়-বাবুর পথ আগলে দাঁড়িয়ে ঢিপ করে মাটিতে ঝুঁকে একটা প্রণাম সেরে নিল।

প্রসন্নবাবু হাঁ হাঁ করে উঠলেন, এই এই, কি চাই এখানে? পালা পালা।

মাসি কোমরে কাপড় গুঁজে রুখে দাঁড়াল, পালাব কেন, আমরা

কি মানুষ নই ?

মানুষ নোস কে বলেছে ! এখন যা, সারাদিন লঞ্চ জার্নি করে এসেছেন বাবু, কি চাই তোদের ? পালা।

না, পালাব না। আমাদের ঘরে ঢুকে জিনিসপত্র ভাঙচুর করবে, যাকেতাকে ধরে মারধর করবে, আর আমরা চুপ করে থাকব, না ?

অক্ষয়বাবু কেমন থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন, কি যে করবেন ঠিক বুঝে উঠতে পারলেন না।

প্রসন্নবাবু আবার ধমকে উঠলেন, কে তোদের ঘরে ঢুকেছে ?

কে আবার, ওই যে লোকটা গো। ভাইদার দিকে আঙুল তুলে দেখাল মাসি। প্রমাণ চাও, ডাকব সবাইকে ?

আমি ! ভাইদার চোখদুটো কেমন ফ্যাকাসে হয়ে ওঠে। আমি গায়ে হাত তুলেছি তোদের ?

নয় তো কে ! মাসি আবার ফুঁসে উঠল।

প্রসন্নবাবুই যেন অবস্থাটাকে সামাল দেওয়ার চেষ্টা করেন। কে তোদের ঘরে ঢুকে কি করেছে, সেকথা এখন কেন ? কিছু বলতে হয় পরে আসিস। যা বলছি, পালা এখন।

কখন আসব ?

সে আসিস 'খন, এখন যা।

ভাইদা ককিয়ে ওঠে, কি সব্বনেশে মেয়ে রে বাবা ! কবে আমি ওদের মারধর করলাম। কবে আমি ওদের জিনিসপত্র ভাঙচুর করলাম। ওরা তো সব পারে দেখছি !

প্রসন্নবাবু ভাইদাকে টেনে সরিয়ে আনলেন। আহা, আসুন না, কে বিশ্বাস করছে ওদের কথা, এদিকে আসুন অক্ষয়বাবু, পরে সব বলব আপনাকে, আসুন।

মাসি বলল, আমরা কি আলায় গিয়ে বাবুর সঙ্গে দেখা করব ?

প্রসন্নবাবু এবার একটু গলা তোলেন, তুই এখন যাবি,—বলছি না, এখন নয়, পরে আসিস।

মাসি একটু থমকে দাঁড়ায়।

প্রসন্নবাবু আবার অক্ষয়বাবুর দিকে তাকান, আসুন।

একটু জোরে জোরে পা চালিয়ে দেয় ওরা।

অক্ষয়বাবু জিজ্ঞেস করেন, কে হে মেয়েটা?

আর বলবেন না, কোত্থেকে এসে লঞ্চঘাটে জুড়ে বসেছে। দাপট দেখলেন তো! নৌকার মাঝিমাল্লাদের পয়সায় দিন চালায়।

ভাইদা বলল, বিশ্বাস করুন অক্ষয়বাবু, আমি মিছিমিছি কেন ওদের মারধর করতে যাব! ওরাই বরং একদিন আলাতে এসে কি হুজ্জুতি শুরু করেছিল।

অক্ষয়বাবুর কাছে সব কিছুই কেমন ঘোলাটে লাগে।

প্রসন্নবাবু বললেন, ভাইদার ধারণা আমাদের জলকরে মাছ ডাকাতি হওয়ার পেছনে ওদের কারসাজি আছে।

কি রকম?

ভাইদা বলল, ওরা সব পারে হুজুর। যে দিন ডাকাতি হল, একমাত্র সেই দিনই আমি ওদের ওখানে খোঁজ নিতে গিয়েছিলাম, পরে তো প্রসন্নবাবুও জীবনদারোগাকে নিয়ে ওখানে গিয়েছিলেন। কি প্রসন্নবাবু, আপনিই বলুন না, আমি ওদের মারধর করেছি?

ওসব কথা এখন থাক না ভাইদা। অক্ষয়বাবু সারাদিন জার্নি করে এসেছেন, এখনি ও সব কেন! সব তো উনি শুনবেনই।

অক্ষয়বাবু হাঁটতে হাঁটতেই বললেন, এ সব উৎপাত তো আমি আগে দেখি নি। হরিণচকের অনেক উন্নতি হয়েছে তাহলে!

প্রসন্নবাবু হাসলেন, উৎপাতই বটে, তবে ওদের যে ওখান থেকে উঠিয়ে দেওয়া যাবে, তারও উপায় নেই। পেছনে ওদের মদত দেওয়ার লোক রয়েছে।

কারা?

অনেক আছে অক্ষয়বাবু, মারদাঙ্গা করা লোকের এখন আর অভাব নেই। সে সব পরে শুনবেন।

ভাইদা কথা কেড়ে নেয় প্রসন্নবাবুর, সবচে মজার ব্যাপার কি জানেন অক্ষয়বাবু, জলকরটাকে সবাই কামধেনু ভাবে। যত হামলা

সব আমাদের ওপর।

কি রকম ?

এই দেখুন না, ওই মেয়েগুলো কার্তিক পুজো করবে, ওদের হয়ে কয়েকটা গুণ্ডা চাঁদা চাইতে এসেছিল। দু'এক টাকায় হবে না, পাঁচশ টাকা চাই।

কার্তিক পুজো! অক্ষয়বাবু অদ্ভুতভাবে তাকান। কার্তিক পুজোর জন্য পাঁচশ' টাকা চাঁদা! কি বলছ তোমরা? দিয়েছ নাকি?

মাথা খারাপ। দিই নি। হবিতম্বি করে গেছে, দেখে নেবে আমাদের।

প্রসন্নবাবু বললেন, পাঁচশ' টাকা চাইলেই পাওয়া যায় না। এরপর এলে আমার কাছে পাঠিয়ে দেবেন। দেখে নেব একবার।

ভাইদা বলে, তাছাড়া এখানে বাতাসে এখন নোংরামি ঘুরতে শুরু করেছে। আপনি তো শিবুর কথা জানেন, সেই যে যার বউটাকে কামটে নিয়ে গেল।

হ্যাঁ হ্যাঁ শিবুচরণ। কি হয়েছে ?

শিবুর কিছু হয় নি, শিবুর একটাই মাত্র মেয়ে, সেটা বিষ খেয়েছে। বাঁচবে কিনা কিছু ঠিক নেই। হাসপাতালে রয়েছে।

বিষ খেয়েছে! কেন ?

সে এক মস্ত কেচ্ছা হুজুর। মেয়েটা নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, শুনলাম নাকি পেট বাঁধিয়ে বসেছিল।

প্রসন্নবাবু বাধা দিলেন, ও সব কথা এখন থাক না ভাইদা। অক্ষয়বাবু যখন এসেছেন সবই জানতে পারবেন। আপনি আসুন অক্ষয়বাবু, এই বাঁ-দিকে।

প্রসন্নবাবুর বাড়িটা চোখে পড়ছিল। সামনে বিশাল বাগান, পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। অনেক গাছগাছালি চোখে পড়ছিল।

অক্ষয়বাবু শুধোলেন, বাড়ি কি দোতলা করে ফেলেছেন নাকি? এর আগেরবার তো একতলা দেখে গিয়েছিলাম, মনে হচ্ছে।

প্রসন্নবাবু একটু সাফল্যের হাসি হাসেন, আপনাদের দশজনের

আশীর্বাদে কোনরকমে দোতলাটা হয়েছে। অবশ্য বাজারে এখনো অনেক ধার-দেনা রয়ে গেছে।

দেনা আজ আছে, কাল মিটে যাবে। বাহ্ বেশ করেছেন তো বাড়িটা।

আসুন, ভেতরে আসুন, দেখবেন। বাড়ির গেট খুলে ভেতরে ঢোকে ওরা।

অল্প অল্প করে বেশ অন্ধকার জড়িয়ে ধরেছিল চারপাশ। তা হলেও এপাশে-ওপাশে শাক শবজীর বাগান চোখে পড়ছিল। দু'পাশে বাগান, মাঝখান দিয়ে ইট বিছোন রাস্তা। খানিকটা এগিয়ে বাড়ির সিঁড়িতে পা দিয়েই চেঁচিয়ে উঠলেন প্রসন্নবাবু, কি হল, আলোটাও জ্বালায় নি দেখছি! হ্যাজাকটা জ্বালিয়ে রাখতে বলেছিলাম না? এই কপিলা, কোথায় গেলি সব?

চারপাশে তো বটেই বাড়ির ভেতরেও হুড়োহুড়ি পড়ে গেল।

অক্ষয়বাবু বললেন, অত ব্যস্ত হওয়ার কি আছে, এখনো তো অন্ধকারই হয় নি। চলুন ঘরে গিয়ে বসি।

ঘরের ভিতর ঝকঝকে তাকিয়া পাতা, ওদিকে একটা টেবিলে ফুল-টুল আঁকা একটা চাদর বিছানো। টেবিলের ঠিক মাঝখানে একটা ফুলের টব রাখা হয়েছে। দেখলেই বোঝা যায়, অক্ষয়বাবুর জন্যই এসব আয়োজন।

তাকিয়ার ওপর পা তুলে বসলেন অক্ষয়বাবু। একটু দূরে সতরঞ্চের ওপর পা গুটিয়ে বসল ভাইদা। প্রসন্নবাবু বললেন, চা না কফি, কি করতে বলব, বলুন? কি খাবেন?

ততক্ষণে জ্বলন্ত হ্যাজাক হাতে ঘরে এসে ঢুকল একজন। ঘরটা আলোয় ঝলমল করে উঠল।

অক্ষয়বাবু বললেন, চা-ই হোক, সারাদিন আজ চা-ই জোটে নি। চিনি কম কিন্তু।

ঠিক আছে, তাই বলছি। একটু বসুন অক্ষয়বাবু, আমি ভেতরে গিয়ে তাড়া লাগিয়ে আসি।

'প্রসন্নবাবু ভেতরে চলে গেলে ভাইদা বলল, এখানকার হালচাল খুব খারাপ হয়ে গেছে হুজুর। ক'দিন থাকলেই সব বুঝতে পারবেন। চারপাশে আরো অনেক জলকর হতে শুরু করেছে, কম্পিটিশনও বাড়ছে।

অবাক হয়ে তাকালেন অক্ষয়বাবু, আবার কোথায় জলকর হল?

হরিণচকে অবশ্য আমাদেব এই একটাই। কিন্তু নদী পেরিয়ে ওপারে শিবতলায় গেলেই গোটা দুয়েক তো আছেই আরো একটা হবে শুনতে পাচ্ছি।

আরো একটা মানে, কারা করছে?

কানাই কুণ্ডুকে তো চেনেন, সেই যে প্রসন্নবাবুর বিরুদ্ধে ভোটে দাঁড়িয়ে হেরে গেলেন, সেই কানাইবাবুও নাকি একটা কোঅপারেটিভ করে জলকর করবেন। শুনতে পেলাম উনি নাকি আমাদের লোকজন ভাগাবার জন্য টোপ ফেলতে শুরু করেছেন।

কি রকম?

জেলে-জিমনিদের ওরা সাড়ে তিনশ' করে দেবে বলে এক একজনের কানে মন্ত্রও পড়ে গেছে।

তাই নাকি!

ভাইদা আরো কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু মনে হল বাইরে যেন কাদের কণ্ঠস্বর। প্রসন্নবাবুর নাম ধরেই ডাকাডাকি শুরু করেছে। কারা রে বাবা! ভাইদা উঠে দাঁড়াল, একটু বসুন হুজুর, দেখে আসি কে এল।

ততক্ষণে প্রসন্নবাবুও ঘরে এসে ঢুকলেন, কান খাড়া করলেন। এক জন নয়, বেশ কয়েকজনের গলা। জিজ্ঞাসু চোখে ভাইদার দিকে তাকালেন।

ভাইদা বলল, দাঁড়ান, আমি দেখছি। ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ল ভাইদা।

গেটের বাইরে সত্যি সত্যি কয়েকজন ছেলে-ছোকরাকে দেখা গেল। আবছাআবছা অন্ধকারে চেনা যায় না। সঙ্গে টর্চ থাকলে ফোকাস

মেরে বোঝা যেত।

ভাইদা এগিয়ে গেল গেটের দিকে, কি ব্যাপার ? কি হয়েছে ?

এক সঙ্গে তিন চার জন বলে উঠল, আমরা পঞ্চায়েতবাবুকে চাই।

কি হয়েছে বল না ?

পঞ্চায়েতবাবুকে পেলেই বলব। শিবুদার মেয়েকে কলকাতা নিয়ে যেতে হবে। এখানে শিবতলার হাসপাতালে ডাক্তার নেই, ওষুধও নেই, কলকাতা না নিয়ে গেলে ওকে বাঁচান যাবে না।

নিয়ে যেতে চাও, নিয়ে যাও। পঞ্চায়েতবাবু কি কররেন ?

কলকাতা নিয়ে যাওয়ার খরচ দিতে হবে। আমরা টেম্পোর সঙ্গে কথা বলে এসেছি, টেম্পো ভাড়া দিতে হবে।

ততক্ষণে প্রসন্নবাবুও ভাইদার পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন, টেম্পো ভাড়া আমাকে দিতে হবে কেন ?

শিবুদার মেয়ে বিষ খেয়েছে জানেন ? না তাও জানেন না ?

ভাইদা বলল, তোমরা শিবুকে গিয়ে ধর। কলকাতা নিতে হবে কি কোথায় নিতে হবে, যার মেয়ে সেই বুঝবে।

লম্বামতো একজন হাত গুটিয়ে এগিয়ে এল, এই শালা, চোপ। তুমি কথা বলার কে হে ?

ভাইদা একটু থমকে গেল।

প্রসন্নবাবু বললেন, তোরা কি গায়ের জোর খাটাতে এসেছিস নাকি! শিবুর মেয়ে বিষ খেল, না, কি করল, এখানে কেন ?

ও সব চালাকি ছাড়ুন প্রসন্নবাবু, মেয়েটার সব্বোনাশ কারা করেছে শুনি ? আমরা কিছু জানি না বলতে চান ?

কে করেছে ? প্রসন্নবাবু চাপা আক্রোশে একটু একটু করে কাঁপছিলেন। ছেলেগুলো সবই ওর মুখ চেনা, সবই কানাইবাবুর চেলা-চামুণ্ডা।

জলকরে যে মেয়েদের ফুসলিয়ে নিয়ে গিয়ে সব্বোনাশ করা হয় আমরা খবর রাখি না নাকি! ভালয়ভালয় টাকা ছাড়ুন, নইলে কি করে টাকা আদায় করতে হয় আমরা জানি।

ভাইদার মাথায় রক্ত উঠে এসেছিল, হুমকি দিয়ে উঠল, কে বলেছে জলকরে মেয়েদের এনে সব্বোনাশ করা হয় ?

লম্বামতো সেই ছোকরাটাই দু'পা এগিয়ে এল, শিবুদার মেয়েই বলেছে, তোমরাই ওর সব্বোনাশ করেছ।

কি ? ভাইদার কানদুটো ঝাঁ ঝাঁ করে ওঠে।

প্রায় হাতাহাতি হয় আর কি, প্রসন্নবাবু মাঝখানে দাঁড়িয়ে অবস্থাটা সামলালেন। তোরা কি মারামারি করবি নাকি ? ভাইদা আপনি চুপ করুন না, যা বলার আমি বলছি।

ওপাশের ওরাও একটু থমকে দাঁড়ায়।

প্রসন্নবাবু বললেন, মাথা গরম করে লাভ নেই, আগে মেয়েটাকে বাঁচান উচিত। তারপর অন্য কথা ভাবা যাবে।

বাঁচাতে হলে ওকে কলকাতা না নিয়ে আর উপায় নেই।

ঠিক আছে তাই নিয়ে যা। টেম্পো কত চাইছে ?

দেড়শ'। দু'শ' চেয়েছিল, আমরা দেড়শ'তে রাজি করিয়েছি।

দেড়শ'। টাকাটা একটু বেশি হয়ে গেল না! এখান থেকে কলকাতা কতটুকু পথ, একশ দিলে হয় না ?

একশ' টাকায় আপনি টেম্পো জোগাড় করে দিন, আমাদের বলার নেই।

প্রসন্নবাবু হাসলেন, তোরা যখন বলছিস তখন দেড়শ'ই হবে। তা, কখন নিয়ে যাবি ওকে ? এই রাতে কি নিয়ে যাওয়া ঠিক হবে ? আমার তো মনে হয়, রাতটা কাটিয়ে ভোরে ভোরে নিয়ে যাওয়া ভাল। একটা রাতে কি আর এমন ক্ষতি হবে।

সকালেই নেব। মাছের সঙ্গে টেম্পোতে ওকে তুলে নিয়ে চলে যাব। টেম্পোর সঙ্গে কথা বলে রেখেছি।

সেই ভাল।

সেই ভাল তো বুঝলাম, কিন্তু টাকা ?

প্রসন্নবাবু হাসলেন, টাকা একটা প্রবলেম নাকি। ভোরে কাঁটাদারদের বাজারে আমি হাজির থাকব। টাকা যা দেবার সে

সময়ই দিয়ে দেব।

ঠিক আছে।

ঠিক আছে তো বুঝলাম। কিন্তু শিবু কোথায়? পালটা প্রশ্ন করেন প্রসন্নবাবু।

শিবুদা হাসপাতালে। হাসপাতালের বাইরে বসে মাথা ঠুকে ঠুকে কাঁদছে।

শিবুকে বলিস যেন দেখা করে। দুপুরে আমার কাছে একবার এসেছিল, কিন্তু তখন এত লোক কথাই বলতে পারি নি।

ঠিক আছে বলব, কিন্তু ভোরে কাঁটাদারদের বাজারে হাজির না থাকলে কিন্তু—

না না, বলছি তো থাকব। টাকাটা এখনই দিয়ে দিতে পারতাম, কিন্তু টাকা কোথায় যে দেব। দেখি কারো কাছ থেকে ধার-টার পাই কিনা।

ছোঁড়াগুলোকে বিদেয় করে ভাইদাকে নিয়ে আবার ঘরে এলেন প্রসন্নবাবু।

কি হয়েছে? অক্ষয়বাবু জিজ্ঞেস করেন।

কি আর হবে, শিবুর মেয়েকে কলকাতার হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে, ছোকরাগুলো টাকা চেয়ে গেল। শাসিয়ে গলা তুলে কথা বলে গেল।

কেন? কেমন রহস্যময় লাগে অক্ষয়বাবুর।

প্রসন্নবাবু ভাইদার মুখের দিকে তাকান, ওদের ধারণা মেয়েটার আজকে এই দশার জন্য জলকরই দায়ী।

সে আবার কি রকম?

ভাইদা একটু চেঁচিয়ে ওঠে, ষড়যন্ত্র হুজুর। মিছিমিছি জলকরের লোকগুলির ওপর দোষ চাপাচ্ছে ওরা, জলকরে কখনো কোন মেয়েছেলেকে আমরা ঢুকতেই দেই না।

কিন্তু ওরা বলে গেল জলকরের আলায় নাকি ফুসলিয়ে ফুসলিয়ে মেয়েছেলে নিয়ে গিয়ে সর্বনাশ করা হয়।

সব বাজে কথা হুজুর। ভাইদার গলার স্বর কেমন ভেঙে গেল।

প্রসন্নবাবু বললেন, আসলে বেশ কিছু লোকের রাগ রয়ে গেছে জলকরটার ওপর। কারণটা যে কি, আমি এখনো ঠিক বুঝে উঠতে পারি না।

ভাইদা যেন এবার মোক্ষম কিছু বলার সুযোগ পেল, কিছু কিছু লোককে তো আপনিই খেপিয়ে রেখেছেন প্রসন্নবাবু।

কি রকম? প্রসন্নবাবুর চোখজোড়া কেমন কুচকে ওঠে।

এই তো সেদিন এসে ভরত হালদার আমার ওপর বেশ কিছুক্ষণ চোটপাট করে গেল। ভরতের টাকাটা মিছিমিছি আপনি আটকে রেখেছেন।

প্রসন্নবাবু এবার দাঁতে দাঁত চাপলেন, ভরতের টাকা ওটা না শিবুর টাকা সেটাই তো এখনো ঠিক হল না। জমিটা কার? ভরতের না শিবুর সেটা ঠিক হোক আগে। শিবু যে ভরতের নামে মামলা করবে জানিয়েছে সে খবর রাখেন?

কি করে রাখব। শিবু তো এখন আপনার বাড়ির কাজ করেই সময় পায় না। ওর সঙ্গে দেখা হয় কতটুকু।

প্রসন্নবাবু একটু যেন লাফিয়ে উঠলেন, বেশ বললেন যা হোক, জলকরের তিন নম্বর টংয়ে রাতে কে পাহারা দেয়, শিবু না আপনি?

পরিবেশটা একটু উত্তপ্ত হয়ে উঠতে শুরু করে, অক্ষয়বাবু হাত তুলে দু'জনকে থামিয়ে দেন। নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করে লাভ আছে!

আমি ঝগড়া করি না। অবস্থা বুঝে চলি।

ভাইদাও আর কথা বাড়ায় না।

অক্ষয়বাবুই বললেন, কাল দুপুরে আমরা খাতাপত্র নিয়ে বসব, যার যা কিছু বলার ওখানেই আমি শুনব। এখন চা-টা কি খাওয়াবেন আসুন, রাত হয়ে গেছে।

এমনিতেই মাথাটা গরম হয়ে উঠেছিল প্রসন্নবাবুর, চায়ের প্রসঙ্গে রাগটা ভেতর বাড়ির উপর পড়ল, দেখছেন তো কাণ্ড, সেই কখন চা বানাতে বলে এলাম। গজগজ করতে করতে ভেতরে ঢুকে গেলেন।

ভাইদা মুখ গোঁজ করেই বসে থাকে। রাগে অপমানে ভেতরটা যেন জ্বলে যাচ্ছে। হায় কপাল, শেষপর্যন্ত কিনা এই অপবাদও শুনতে হল যে শিবুর মেয়েকে আমরা খারাপ করেছি।

খানিকক্ষণের মধ্যেই প্রসন্নবাবু আবার ঘরে ঢুকলেন, সঙ্গে ঘোমটা দেওয়া একটা বউ, হাতে থালা ভর্তি কাটা ফল, সেদ্ধ ডিম, বিস্কুট। সঙ্গে আর একজনের হাতে থালার ওপর সাজানো কাপে কাপে চা।

আরে সর্বনাশ এ কী করেছেন! এত কে খাবে? চায়ের একটা কাপ তুলে নেবার জন্য হাত বাড়ালেন অক্ষয়বাবু।

ততক্ষণ বউটি খাবার থালাটা অক্ষয়বাবুর সামনে নামিয়ে গলায় আঁচল দিয়ে প্রণাম করার জন্য ঝুঁকেছে।

প্রসন্নবাবু বললেন, আমার স্ত্রী।

আরে আরে এই দেখ, কি করে! আমি একটা বিস্কুট নিচ্ছি, ব্যস। বিস্কুট আর চা।

ফলগুলো আমাদের বাগানের অক্ষয়বাবু। কার্বাইড দিয়ে পাকানো নয় একেবারে গাছ পাকা।

তা হোক, এখন নয়! ফল তো আর ফুরিয়ে যাচ্ছে না, কাল খাব।

খাওয়ার পর্ব চুকতে আরো প্রায় আধ ঘণ্টা পেরিয়ে গেল। বাইরে ততক্ষণে ফুটফুটে চাঁদের আলো ছড়িয়ে পড়েছে। চাঁদের দিকে তাকালে পূর্ণিমা বলে ভুল হয়, হয়তো কাল বা পরশুই পূর্ণিমা।

ভাইদা বলল, চলুন অক্ষয়বাবু। হ্যাজাকট ততক্ষণে হাতে তুলে নিয়েছে রাইচরণ।

চলো। প্রসন্নবাবুও যাবেন নাকি? অক্ষয়বাবু প্রসন্নবাবুর দিকে তাকান।

যেতাম, কিন্তু শিবুর মেয়েটার ব্যাপারে একটু খোঁজ নেওয়া দরকার। ছোকরাগুলো অমন হম্বিতম্বি করে গেল, একটু হাওয়াটা বোঝা দরকার।

ঠিক আছে কাল সকালেই তাহলে দেখা হচ্ছে। কই হে ভাইদা, চলো আমরা এগোই।

মাঠের মধ্যি দিয়ে হ্যাজাক ঢুলিয়ে ঢুলিয়ে ওরা জলকরের দিকে এগোতে লাগল।

তেইশ

খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকতে বেশ খানিকটা রাতই হয়ে গেল। অক্ষয়বাবুর জন্য কিছু বাগদা তোলা হয়েছিল ; বাগদা, ভেটকি, ভাঙন। দু'তিন রকমের মাছ ভাজা, ঝাল ঝোল। খেতে খেতে অক্ষয়বাবুর মনে হচ্ছিল, এরা পনের'ষোল জন মানুষ রোজই এরকম মাছ তুলে তুলে খায় নাকি ! ঢাকের দায়ে মনসা বিকিয়ে যাবে যে। এক সময় না বলে পারলেন না, হাতের কাছে মাছ আছে বলে অত মাছ তোল নাকি রোজ রোজ ?

ভাইদা জিভ কাটে, ছি ছি, কি বলছেন ! আপনি এসেছেন বলে আজ সবার জন্য ঘেরির মাছেরই আয়োজন করেছি, নইলে হুজুর এখানকার একটা মাছও তোলা হয় না। মাছ খাওয়ার দরকার হয় আমরা বাজার থেকে কিনে খাই।

কথাটা কতখানি বিশ্বাস্য ধরতে পারেন না অক্ষয়বাবু, কিন্তু এ নিয়ে আর কথা বাড়ান না। খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকতেই অলসভাবে টর্চ হাতে জলের ধারে এসে দাঁড়ালেন। চমৎকার চাঁদের আলো ছড়িয়ে পড়েছে জলের ওপর, হালকা অল্পঅল্প বাতাসে সাপের মতো ঢেউ গড়াচ্ছে। এ দৃশ্য ভোলা যায় না।

একটু বসবেন হুজুর ? চেয়ারটা এনে দেই ? বলতে বলতে ভাইদা নিজেই ঘরের ভেতর থেকে একটা নড়বড়ে চেয়ার এনে জলের ধারে পেতে দেয়।

অক্ষয়বাবু ভাইদার দিকে তাকান। পরে না হয় বসব, চলো দেখি, ওদিকটা একটু ঘুরে আসি। ভারি সুন্দর লাগছে বাতাসটা।

তাই চলুন হুজুর, বাঁধ ধরে নদীর ধার দিয়ে খানিকটা হাঁটতে ভালই লাগবে।

আলাঘরের পাশ দিয়ে ওরা নদীর বাঁধ ধরে হাঁটতে শুরু করে। নদীতে এখন ভাটা। জল নেমে রয়েছে অনেক নিচ অবধি। কেমন শান্ত। কোথায় কলকাতার সেই ভিড়ভাট্টা, আর কোথায় এই নদী-নালার দেশ, ভাবা যায় না। অক্ষয়বাবু টর্চ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নদীর ওপারে ফেললেন। ওপারটা কেমন ঝাপসা ঝাপসা। বললেন, ওপারে তাহলে আরো জলকর হচ্ছে?

পাশেপাশেই হাঁটছিল ভাইদা, হ্যাঁ হুজুর হাঁসুয়া আর পুঁইখালিতে দুটো তো আছেই, কানাইবাবুরা যদি আর একটা করেন তাহলে শিবতলাতেও একটা হবে।

তার মানে ধানের জমিটমি কিছুই আর থাকবে না দেখছি।

এদিকে হুজুর ধানের জমি থাকাও যা না-থাকাও তা।

কেন?

চার-পাঁচ মনের বেশি কোন জমিতেই ধান ওঠে না। মাছের চাষ হচ্ছে বলে লোকে তবু দুটো পয়সা দেখতে পায়।

তা দেখতে পায়, কিন্তু জলকরের হালও তো আমরা দেখতে পাচ্ছি। জলকর করা না ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ান, তাই তো বুঝতে পারলাম না।

ভাইদা কথার ইঙ্গিতটা বুঝতে পারে, চুপ করে থাকে!

টাকা তো আর কম ঢালা হল না জলকরে, কিন্তু রিটার্ন কোথায়! এর চেয়ে ওই টাকা যদি আমি অন্য কোথাও ঢালতাম অনেক ফায়দা পেতাম।

ভাইদা বলল, হুজুর বাজে খরচ বড্ড বেড়ে গেছে। ওটা কমানো দরকার।

খরচ তো আর আমি করি না, খরচপত্র তো তোমরাই কর।

তা করি, কিন্তু কিছু যদি মনে না করেন তো একটা কথা বলি।

অক্ষয়বাবু একটু দাঁড়ান, কি কথা?

ম্যানেজারবাবু মাসে মাসে এখান থেকে পাঁচশ টাকা নিয়ে যান, অথচ জলকরের কোন কাজই করেন না।

কত পাঁচ শ' টাকা বেরিয়ে যাচ্ছে, আর ওই পাঁচ শ' তে আমাদের কত ক্ষতি হবে হে। হাসেন অক্ষয়বাবু

ভাইদা বুঝতে পারে, প্রসঙ্গটা অক্ষয়বাবুর মনঃপুত নয়।

পঞ্চায়েতকে হাতে রাখাই হচ্ছে অক্ষয়বাবুর আসল উদ্দেশ্য। অক্ষয়বাবু হয়তো ভাবছেন, জলকরের ঝামেলা পঞ্চায়েতের সদস্য প্রসন্নবাবুই সামলাবে। কিন্তু তাই যদি হত তাহলে তো আর কথাই ছিল না।

প্রসঙ্গটা আর টানে না ভাইদা।

অক্ষয়বাবুই আবার বলেন, আসলে কি জান হে, এখানে জলকর করে গোড়াতেই আমি ভুল করেছি। মাঝেমাঝে মনে হয় বিক্রিই করে দিই। আপদ চুকে যাক।

বিক্রি করে দেবেন? ভাইদার চোখে বিস্ময়।

তুমিই বল না কি করা উচিত? আমি যদি নিজে দেখাশোনা করতে পারতাম তাহলে এক কথা ছিল।

ভাইদা একটু আমতাআমতা করে, হুজুর, একজন কারো হাতে যদি পুরো ক্ষমতাটা দিয়ে দিতেন তাহলে এমন হত না। আসলে আপনি ভাবছেন ম্যানেজারবাবুই সব সামলাবে, কিন্তু যত গোলমাল যে উনিই পাকিয়ে তুলছেন তা আপনি বুঝতেই চাইছেন না।

হাঁটতে হাঁটতে ওরা জলকরের একেবারে শেষ প্রান্তে এসে পড়েছিল। জলকরের বাঁধের ওপারে ধানী জমি দেখা যাচ্ছে।

অক্ষয়বাবু বললেন, তুমিওতো কম ঝামেলা পাকিয়ে রাখ নি বাপু! লঞ্চ থেকে নামতে না নামতেই তো কেচ্ছা শুনলাম।

সঙ্গে সঙ্গে প্রায় ককিয়ে ওঠে ভাইদা, আপনি ওদের কথা বিশ্বাস করলেন হুজুর? ধর্মসাক্ষী রেখে বলছি, মাগীগুলোর গায়ে আমি হাত তুলি নি। আমি যদি হাত তুলে থাকি, সাত জুতো খাব।

তাহলে মিছিমিছি ওরা চেঁচিয়ে গেল। পেছনে কিছু না থাকলে কেউ এমনিএমনি চেঁচায়? কই, আর কারো নামে তো কিছু বলল না?

আপনার পা ছুঁয়ে বলছি হুজুর, সব মিথ্যে, সব বানানো। আমি তো সেদিন একা যাই নি, আমার সঙ্গে ব্রজ ছিল, ব্রজকে জিজ্ঞেস করুন না?

অক্ষয়বাবু কথা বাড়ান না।

ভাইদা বলে, আসলে আমাদের সন্দেহ হয়েছিল, ডাকাতির ব্যাপারটা ওদেরই কারসাজিতে হয়েছে। না হলে হুট বলতে আমরা ওখানে যাব কেন!

কি কারসাজি?

আজ্ঞে হুজুর এখনো বলব, মাছের ঝুড়ি ওই লঞ্চঘাট দিয়েই পাচার হয়েছে। মাগীগুলোর নির্ঘাৎ হাত ছিল তাতে। শেষ রাতের দিকে ওদিকে কোন লোক থাকে না, ওখান দিয়েই পাচার হওয়া সম্ভব। তাছাড়া আমার ওপর ওদের রাগের কারণও আছে।

অক্ষয়বাবু আরো কিছু শুনবার জন্য তাকিয়ে থাকেন।

মাঝেমাঝেই ওরা আলায় এসে পয়সা চায়, মাছ চায়। সে সব পায় না বলেই আমার ওপর যত রাগ ওদের। শুনলেন না, কার্তিক পুজোর জন্য পাঁচ শ' টাকা চাঁদা চাইতে এসেছিল। এত টাকা কে দিতে পারে বলুন!

হুম। অক্ষয়বাবু ধানের জমির ওপর একবার টর্চ ঘোরালেন।

বিশ্বাস করুন হুজুর, আমাকে দেখে কি আপনার মনে হয়, আমি মেয়েছেলের গায়ে হাত তুলতে পারি। আসলে সেদিন ওখানে যে ঝামেলা করেছিল সে হচ্ছে মামু।

মামুটা কে?

আজ্ঞে, মামুর কথা শোনেন নি হুজুর! মামু হচ্ছে মাগীগুলোর দাদাল। চেহারা দেখলেই গা ঘিনঘিন করবে আপনার।

বটে!

হ্যাঁ হুজুর। সেদিন আমরা লঞ্চঘাটে ওদের ঝুপড়িগুলোর সামনে ভেড়িতে উঠে দাঁড়িয়েছি, কোথ্‌থেকে মামুগুণ্ডা এসে হাজির। কি বলব আপনাকে, লোকটা এসেই আমাদের খাতির শুরু করে দিল।

টেনে নিয়ে গিয়ে ঝুপড়িগুলো দেখাতে শুরু করল। একেবারে ঘরের মধ্যে নিয়ে গেল।

হাঁ করে তাকিয়ে থাকেন অক্ষয়বাবু।

আসলে কোন চোরাই মালের হদিশ মেলে কিনা সেটাই আমাদের দেখার উদ্দেশ্য ছিল। আমরা এ ঝুপড়ি থেকে ও ঝুপড়িতে ঢুকছি, মাগীগুলোও সঙ্গে সঙ্গে কিচিরমিচির শুরু করে দিল। একটা মাগী তখন দাঁতমুখ খিঁচিয়ে এমন একটা কাণ্ড করে বসল—না থাক, সে কথা আপনাকে বলা যায় না।

আগ্রহে তাকান অক্ষয়বাবু, কি কাণ্ড?

যদি অপরাধ না নেন তো বলি, মাগীটা হুজুর সরাৎ করে কাপড় খুলে চেঁচিয়ে উঠল, ঘরের মধ্যে কি দেখছ গো বাবু? এখানে দেখ, এখানে খুঁজে দেখ। আর যায় কোথায়, ঠাস ঠাস করে মামুগুণ্ডা ওকে দু' থাপ্পরেই শুইয়ে ফেলল মাটিতে। আমরা তো থ', পালাতে পারলে বাঁচি। তারপর বিশ্বাস করুন হুজুর আমরা পালিয়েই এসেছিলাম।

হুম! অক্ষয়বাবু এতক্ষণ হাঁ করে শুনছিলেন, বললেন, তা থাপ্পর টাপ্পর যেই মারুক, রাগটা কিন্তু তোমারই ওপর।

সেটা আমার কপাল হুজুর। থানার দারোগাকে নিয়ে প্রসন্ন-বাবুও ওখানে গিয়েছিলেন একটু বেলায়, ওরা কিন্তু তখন টুঁ ফ্যাঁ করে নি। আসলে আমার কপালই খারাপ। নইলে জলকরের জন্য রাতদিন এত খাটি, বদনাম ছাড়া কিছুই পেলাম না। চোখ ছলছল করে ওঠে ওর।

অক্ষয়বাবু অল্প একটু হাসলেন, খাটতে তো অনেকেই পারে, কিন্তু কেবল খাটলেই তো সব হয় না একটু বুদ্ধিও খাটাতে হয়।

কাপড়ের খুঁটে চোখ মোছে ভাইদা।

অক্ষয়বাবু বলেন, সে যাক গে, ওসব ছাড়। পাশের ওই জমিটা কার হে?

আজ্ঞে হুজুর সাবির আলির। জমিটা আমাদের এই জলকরে ঢুকিয়ে নিতে পারলে অনেক উপকার হত, কিন্তু তার উপায় নেই।

কেন ?

সাবির হচ্ছে প্রসন্নবাবুর পেয়ারের লোক, পার্টির লোক।

পার্টির লোক তো কি হয়েছে, কথা বলে দেখ না। আমরা তো আর মোফতে নেব না।

আমার বলা না বলায় কিছু যায় আসে না হুজুর। ওকেই বলতে বলুন।

ঠিক আছে তাই হবে। ম্যানেজারবাবুকেই বলব।

তারপর দু'জনেই কেমন চুপ হয়ে গেল। চারপাশ কেমন নিস্তব্ধ। নদীতে ভাটা। নদী ছাড়িয়ে ওপারের দিকটা আরো রহস্যময় হয়ে উঠেছে। এদিকে জলকরের গায় গায় পাহারা দেবার টংগুলিও চোখ টানে বারে বারে। আরো দূরে গাঁয়ের দিকে জঙ্গল গাছপালা এখন ছবির মতো ঘুমুচ্ছে।

আরো কিছুক্ষণ জলকরের আশেপাশেই হাঁটাহাঁটি করে ওরা। তারপর এক সময় ধীরে ধীরে আবার আলাঘরের দিকেই ফিরতে শুরু করে।

ভাইদা বলে, কাল আপনাকে কাঁটদোরদের বাজারে নিয়ে যাব। দেখতে দেখতে বাজারটা কেমন জমে উঠেছে দেখবেন। তাছাড়া—

হঠাৎ কথা থামিয়ে থমকে দাঁড়ায় ভাইদা।

কি হল ?

আজ্ঞে দূরে ভেড়ির দিকে দেখুন তো। টর্চ হাতে কে যেন ছুটতে ছুটতে আসছে না ?

হ্যাঁ, একটা ছায়ামূর্তি মতো মানুষ, ছুটতে ছুটতেই আসছে মনে হচ্ছে। কে গো ?

ঠিক বুঝতে পারছি না হুজুর। আলার দিকেই আসছে মনে হচ্ছে।

প্রসন্নবাবু নাতো ?

প্রসন্নবাবু কেন ছুটতে ছুটতে আসবেন। চলুন আলায় যাই।

একটু জোরে জোরেই পা চালায় ওরা। ভাইদার বুকের ভেতর কেমন যেন ঢিবঢিব করে ওঠে। কে আবার আসছে রে বাবা! তবে

কি নতুন কিছু ঘটল, তবে কি শিবুর মেয়েটারই কিছু হল! তবে কি, কে জানে আবার কি ঝামেলা আছে কপালে।

আলার উঠোনে এসে পাওয়া গেল অনেককেই। ভোলা-বিষ্টুরাও হাঁ করে তাকিয়ে আছে ভেড়ির দিকে। সবারই চোখে পড়েছে দৃশ্যটা।

কে রে? চিনতে পারছিস? প্রশ্ন করে ভাইদা।

বিনোদ বলল, ছুটতে ছুটতে আসছে, চেনা যাচ্ছে না।

ততক্ষণে অক্ষয়বাবুর মুখটাও কেমন ফ্যাকাসে হয়ে উঠেছে। বিড়-বিড় করে বললেন, ঝামেলা করবে না তো?

কি ঝামেলা! আমরা এতগুলো লোক কি এখানে ফালতু ফালতু আছি নাকি! ব্রজর হাত ধরে টানে ভাইদা, আয় তো দেখি।

কোথায় যাব? ওকেই আসতে দাও না ভাইদা। কি বলে আগে শোন না।

অগত্যা আবার দাঁড়াতে হয় ভাইদাকে। তারপর আরো কয়েকটা মুহূর্ত, বিষ্টু হঠাৎ বিড়বিড় করে ওঠে, সতীশ কাঁটাদার নাতো! হ্যাঁ গো, ওরকমই মনে হচ্ছে যেন।

সতীশ কেন আসবে! তাছাড়া এভাবে দৌড়তে দৌড়তে! কেমন ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে ভাইদা।

আরো কিছুক্ষণ কাটে, হ্যাঁ, সতীশই। ধড়ে যেন প্রাণ আসে।

কি ব্যাপার সতীশবাবু? কি হয়েছে? সবাই এসে ঘিরে ধরে সতীশকে।

সতীশ হাঁপাতে হাঁপাতেই বলে, ওদিকে তো মারাত্মক ব্যাপার শুরু হয়ে গেছে ভাইদা। ছুটতে ছুটতে খবর দিতে এলাম।

কি হয়েছে?

শিবুর মেয়েটা চোখ বুজেছে। তাই নিয়ে এখন দক্ষযজ্ঞ চলছে।

মারা গেছে! ঠিক এই ভয়টাই পাচ্ছিল ভাইদা। কখন মারা গেছে?

এই তো ঘণ্টা খানেক আগে। আপনাদের ম্যানেজারবাবুকে ওরা ঘেরাও করে রেখেছে।

ওরা মানে ?

ওরা বোঝেন না, মামুগুণ্ডারা। তাছাড়া কানাইবাবুর লোকেরাও হাসপাতালের সামনে ঝাণ্ডা গেড়ে বসেছে।

ম্যানেজারবাবুকে ঘেরাও করেছে কেন ? উনি কি করেছেন ?

সতীশ অক্ষয়বাবুর দিকে তাকায়। আজ্ঞে অক্ষয়বাবু, ওদের মতে, এই জলকরই নাকি সর্বনাশ করেছে মেয়েটার। এখন ক্ষতিপূরণ চাই।

সে আবার কি রকম ?

কি জানি বাবু, ওরা তো তাই বলছে।

ভাইদা বলল, দুনিয়ায় যত কিছু ঘটে, সবই জলকরের দোষ।

হুম। তা আপনাকে তো ঠিক,—সতীশের দিকে তাকান অক্ষয়বাবু।

ভাইদা বলে, আজ্ঞে হুজুর এ হচ্ছে সতীশ কাঁটাদার। আমাদের মাছফাছ এই তোলে। আমাদের খুব আপনার লোক।

সতীশ হাত তুলে নমস্কার জানায় অক্ষয়বাবুকে। আজ্ঞে আমি শিবতলা থেকেই আসছি, ভীষণ গোলমাল শুরু হয়ে গেছে ওখানে।

এ কি অন্যায় কথা ! কেউ বিষ খেয়ে মরলে প্রসন্নবাবুর কি দোষ ! উনি তো আর বিষ খেতে বলেন নি মেয়েটাকে।

সতীশ একটু আমতাআমতা করে। আসলে পেছনে কানাইবাবুরা রয়েছে। ওরাই ব্যাপারটাকে নিয়ে হৈ চৈ বাধাতে চায়।

ভাইদা বলল, কানাইবাবুদের রাগটা কিন্তু জলকরের ওপর যত না তার চেয়ে বেশি ম্যানেজারবাবুর ওপর। আপনাকে আমি কতবার বলেছি, কানাইবাবুকে এখানে কেউ পছন্দ করে না। তা, আপনি তো কান দেবেন না।

অক্ষয়বাবু কথা টেনে নিলেন, সবই বুঝলাম, ম্যানেজারবাবু খারাপ লোক, কিন্তু কি করা এখন ?

কি করা মানে, আমরা যদি এখন লাঠিসোটা নিয়ে প্রসন্নবাবুকে ছাড়াতে যাই, দাঙ্গা বেধে যাবে। রক্তারক্তি কাণ্ড হবে।

না না, দাঙ্গার দরকার নেই। কিন্তু লোকটাকে ওরা আটকে

রাখবে একটা কিছু তো করা দরকার। এখানে কি থানাপুলিশ বলে কিছুই নেই!

সতীশ বলল, আমারও মনে হয়, থানায় একটা খবর দিয়ে আসা উচিত, পুলিশটুলিশ গিয়ে যদি ছাড়িয়ে আনতে পারে।

ভাইদা বলল, ঠিক আছে, আমি এখনি লোক পাঠাচ্ছি। এই ব্রজ, কাউকে সঙ্গে নিয়ে থানায় যা দেখি। ভাল করে বুঝিয়ে বলবি। আর অক্ষয়বাবু যে এখানে এসেছেন, খবরটাও দিয়ে আসবি।

ব্রজ মাথা নাড়ে, ঠিক আছে। পাশেই ছিল বলাই, বলাইয়ের হাত ধরে টানে, চ', খবরটা দিয়ে আসি।

ঘেরাও করেছে কোথায়? অক্ষয়বাবু আবার প্রশ্ন করেন।

আজ্ঞে, শিবতলায়। হাসপাতালের সামনের মাঠে। প্রসন্নবাবুর একা একা ওখানে যাওয়াটাই ঠিক হয় নি।

প্রসন্নবাবু কি ইচ্ছে করে গেছেন নাকি, ওকে ডেকে নিয়ে গেছে। দেখলেন না, তখন কয়েকটা ছোঁড়া এসে কেমন হম্বিতম্বি শুরু করল, মেয়েটাকে নাকি কলকাতার হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে। ওরা নাকি টেম্পো ভাড়া করে রেখেছে, টাকা দিতে হবে।

সতীশ বলল, সন্ধ্যে থেকেই মেয়েটা যাই যাই করছিল। বাঁচবে যে না, শরৎ ডাক্তার নাকি তা আগেই বলে দিয়েছিল। তবে মজার কথা হচ্ছে, পেট থেকে নাকি একটা বাচ্চাও বেরিয়েছে মেয়েটার। বাচ্চা প্রসব করার খানিকক্ষণ পরই নাকি চোখ বুজেছে।

বাচ্চা! কেমন অদ্ভুতভাবে তাকায় ভাইদা। বাঁচা না মরা?

শুনলাম তো বেঁচেই আছে, তবে সবই শোনা কথা। কি যে হচ্ছে, এখন আর বোঝার উপায় নেই।

মা মরে গেল আর বাচ্চাটা বেঁচে রইল। বিস্ময় যেন কাটতে চায় না ভাইদার?

অক্ষয়বাবু বললেন, সে রকম ডাক্তার হলে অপারেশন করে বাচ্চা বার করে নিতে পারেন। সবই ডাক্তারের ওপর নির্ভর করছে।

সতীশ বলল, শিবতলায় আবার ডাক্তার আছে নাকি অক্ষয়বাবু।

কলকাতা থেকে কত ডাক্তার ওখানে এল আর গেল, তার হিসেব নেই। এখন ওখানে ডাক্তার বলতে শরৎ কম্পাউণ্ডার। ওর হাতেই এখানকার লোকের মরা বাঁচা।

ভাইদা বলল, শরতের হাত-যশ কিন্তু খারাপ না। ওর সুনামও আছে।

তা থাকতে পারে, তবু পাশ করা তো নয়। এখানকার যাদের একটু পয়সা আছে ডাক্তারের প্রয়োজন হলেই তো কলকাতায় ছোটে।

তা ঠিক। তবে কি কপাল বল, বাচ্চাটা বেঁচে রইল আর মাটা মরে গেল!

সতীশ বলল, মরেই যখন গেল, দু'জনেরই মরা উচিত ছিল। বাচ্চাটাকে নিয়ে দেখ না আবার কি ঝামেলা হয়।

কেন, কি ঝামেলা হবে? অক্ষয়বাবু তাকান।

ওটার এখন কে দায়িত্ব নেয় দেখুন না। শিবুর তো ওই অবস্থা। ওর দাদা ভরতও মেয়েটাকে রাখতে চাইবে বলে মনে হয় না।

ভাইদা সমর্থন করে, আমারও তাই মনে হয়, ভরত তো শিবুর মেয়েটাকেই বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার কত চেষ্টা করেছে। কতবার আমাদের কানের কাছে ঘ্যানঘ্যান করে গেছে।

অক্ষয়বাবু বললেন, ও সব তো পরের কথা। এখন কি হয় তাই দেখ। জলকর অবধি আবার ধাওয়া করবে না তো ওরা?

তা বাবু অসম্ভব নয়। সতীশই বলে, একটু সাবধানেই রাতটা কাটান উচিত ভাইদা। অবস্থাটা আমার ভাল লাগেনি বলেই ছুটতে ছুটতে এলাম।

আজ না হয় সারা রাত জেগে ভেড়ি পাহারা দেব।

তাই ভাল, সাবধানের মার নেই।

ভাইদাও কেমন ফ্যাকাসে হয়ে উঠেছিল, কিন্তু ভেতরের অবস্থাটা চাপা দিয়ে বলল, আমরা এখানে বারো তের জন আছি, কেমন করে ভেড়ি রক্ষা করতে হয় জানি। আপনি আসুন অক্ষয়বাবু, কাল সকালে প্রয়োজন হলে অন্য ব্যবস্থা নেব, ঘরে চলুন।

অক্ষয়বাবুর যেন বোবা। বিষয়সম্পত্তির মাঝখানে দাঁড়িয়ে এ যেন এক গোলোকধাঁধা। বার বার এ সময় কলকাতার কথাই যেন মনে পড়ছে। কি কুক্ষণেই যে একা একা এই জলকর দেখতে এলাম, কি কুক্ষণেই যে এই পাণ্ডববর্জিত দেশে ব্যবসা করতে এসেছিলাম—

চব্বিশ

সারাটা রাত বেশ উত্তেজনার মধ্যেই কাটল। ছড়িয়ে-ছিটিয়ে জলকরের চারপাশে ঘোরাঘুরি করে কাটাল সবাই। মাঝে মাঝে রাতপাখি বা কুকুরের ডাকেও যেন চমকে উঠতে হয়। এই বুঝি এল, এই বুঝি এল, এই বুঝি হামলা শুরু হল জলকরে।

কিন্তু না, তেমন কিছুই হল না। অক্ষয়বাবুও অনেক রাত অবধি আলাঘরের সামনের উঠোনে বেঞ্চের ওপর বসে কাটালেন ভাইদার সঙ্গে। কান মাথা চাদর দিয়ে ঢাকা, পায়ে দু'ফেত্যা মোজা, তবু ঠাণ্ডাটা না জানি বুকে পিঠে বসে গিয়ে জলকরে আসার বাসনা ঘুচিয়ে দেয়। অবশেষে এক সময় উঠে গিয়ে ঘরে ঢুকলেন। ক্যাম্পখাটের বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ে গায়ে চাদর মুড়ি দিলেন। শুয়ে পড়লেন বটে, কিন্তু মাথার মধ্যে যেন সারা রাজ্যের দুশ্চিন্তা এসে ভর করে বসছে। সারাটা দিন আজ এত ক্লান্তি গেছে তবু চোখের দুই পাতা থেকে যেন ঘুম উধাও হয়ে গেছে। কত আশা নিয়ে এই জলকরের ব্যবসায় হাত দিয়েছিলেন উনি। দিনের পর দিন কত টাকা ঢেলেছেন, পরে ব্যাঙ্কের কাছে লোনের জন্যও হাত পেতেছেন। সেই লোনের সিকি ভাগও যদি শোধ হয়ে থাকে। সুদের পর সুদ গুণতে গুণতেই দিন শেষ হয়ে যাচ্ছে এখন।

এ যেন একটা ইঁদুর ধরা কলের মধ্যে উনি আটকে গেছেন। এখন বেরুবার আর পথ নেই। ব্যবসাটা যে গুটিয়ে ফেলবেন তারও উপায় নেই। বিক্রি করার কথা মাথায় যে মাঝে মাঝে না আসছে এমনও

নয়, কিন্তু কোথায় খদ্দের পাবেন উনি। পর্বত প্রমাণ ঋণের বোঝা মাথায় রেখে কে কিনতে চাইবে এই জলকর।

যত ভাবেন, মাথায় দপদপানি যেন তত বাড়ে। নাহ্ ভেবে আর লাভ নেই, যা আছে কপালে হবেই। পাশ ফেরেন অক্ষয়বাবু। তারপর কতক্ষণ যে ওইভাবে ছটফট করেছিলেন কে জানে, এক সময় ঘুমিয়েই পড়েছিলেন।

ঘরের বাইরে তখনো টর্চ হাতে পায়চারি করছিল ভাইদা। বিশ্ব চরাচর কেমন ঝিমোন. শান্ত। অল্প অল্প ঠাণ্ডা বাতাসের ঝাপটা। হালকা ধোঁয়ার মত একটু একটু যেন কুয়াশাও; আকাশের দিকে তাকায়। আকাশটা কেমন থমথমে। অসংখ্য নক্ষত্র ফুটে আছে ঠিকই, কিন্তু কেমন মিয়োন। প্রথম রাতের দিকে যে চাঁদের আলো ছিল, শেষ রাতের দিকে তা হারিয়ে যেতেই যেন আরো রহস্যময়তা এসে ঘিরে ধরেছে।

এই রহস্যময়তার মধ্যেই মাথায় কাপড় জড়িয়ে বিনোদ বহুক্ষণ ধরে এপাশওপাশ করল। হাঁটতে হাঁটতে এক সময় মাকাল ঠাকুরের মন্দিরের সামনে এসে দেখল, ভোলা আয়েস করে বসে বিড়ি ফুঁকছে। পাশেই শোয়ান একটা লাঠি।

কি হল, বসে আছিস?

ভোলা হিঁ হিঁ করে হাসে, আয় দুটো টান দিয়ে যা।

বিনোদ এগিয়ে আসে, দে।

বোস না। রাত আর বেশি নেই; ফালতুফালতু সারারাত এভাবে আমাদের কাটাতে হল।

রাত যে শেষ হয়ে আসছে সন্দেহ নেই। বিনোদ বসে পড়ে। ফালতুফালতু ঠিকই, তবে অক্ষয়বাবু এয়েছেন, কোন একটা ঘটনা ঘটে গেলে মুখ দেখাবার উপায় থাকবে না আমাদের।

অক্ষয়বাবু এয়েছেন তো কি হয়েছে! ঝামেলা হলে অক্ষয়বাবু নিজের চোখেই দেখে যেতেন। সেটা বরং ভালই হত।

ছাই হত। অক্ষয়বাবু কি বলেন জানিস?

কি ?

বিক্রি করে দেবেন জলকর। বিক্রি করে দিলে কোথায় যাবি ?

ভোলা হাসে, বিক্রি করে দিলেই বুঝি জলকর উঠে যাবে! মালিক বদলাবে. নতুন মালিক আসবে। আমাদের কি।

বিনোদের ঠোঁটের ডগায় একটা খারাপ কথা এসে গিয়েছিল, চেপে গেল। বিড়ির শেষ অংশটুকু মাটিতে গুঁজে নিভিয়ে ফেলল।

তাছাড়া বিক্রি করে দেওয়া অত সোজা না, ওটা উনি মিছিমিছি ভয় দেখাবার জন্য বলেন।

বিনোদ বলল, কি জানি বাবা, ও সব কথা আমার ঠিক মাথায় ঢোকে না। রাত তো প্রায় শেষ হয়েই আসছে। আর ঘণ্টা খানেক কাটাতে পারলেই বাঁচি।

তা ঠিক, আর কোন ঝামেলা হবে বলে মনে হয় না। সতীশবাবু মিছিমিছি আমাদের ভয় দেখিয়ে গেছেন।

ভয় দেখাবার কি আছে, ঝামেলা হলে দিনের বেলাও হতে পারে। ম্যানেজারবাবুকে এখনো ঘেরাও করে রেখে দিয়েছে কিনা কে জানে!

অসম্ভব! জীবনদারোগা নিজে গেছেন ওখানে।

বিনোদ চুপ করে থাকে। মাথার উপর দিয়ে বেশ কিছু বাদুড় উড়ে গেল। গাটা একটু ছমছম করে উঠল ওর।

ভোলা বলল, আসলে শিবুটারই কপাল খারাপ। বেচারার মেয়েটা যে এভাবে মরবে ভাবা যায়!

ঘুরেফিরে আবার সেই শিবুরই কথা। বিনোদ আবার একটা বিড়ি বার করে কোমর থেকে, ছু' আঙুলে পাকিয়ে নিয়ে এগিয়ে ধরে ভোলার দিকে, নে ধরা।

ওদিকে ব্রজ আর কে যেন বেশ খানিকটা দূরে নদীর ধারে টর্চ মেরে মেরে কি সব দেখছে। ভাইদা সারা গায়ে কাঁথা জড়িয়ে আলার সামনে একটা টুলের ওপর চুপটি করে বসে আছে। সারা রাত জেগে বসে পাহারা দিতে কেমন লাগে টের পাচ্ছে যেন।

সেবার ওর বউটা মরল, আর এবার এই মেয়েটা।

ভোলা বলল, আমি কিন্তু এর জন্য শিবুকেই দায়ী করব। শিবু যদি মেয়েটার দেখাশোনা করত ঠিক মতো, তাহলে বিষ খাওয়ার প্রশ্ন আসত না। যেমন বাপ তেমন মেয়ে।

বিনোদ কি বলবে ভেবে পায় না, হাসির মুখখানা ওর চোখের সামনে এখনো ভাসছে। সেই অন্ধকার রাতে কেমন চুপি চুপি টংয়ের নিচে এসে দাঁড়িয়েছিল। মনে পড়ল, কেমন ভাবে সে দিন মাছ চুরি করে মেয়েটার হাতে তুলে দিয়েছিল শিবু।

ভোলা ছোট্ট করে একটু খোঁচা মারে বিনোদকে, তুই বল, শিবু যদি ঠিক থাকত, তাহলে কি ওর মেয়ে বিষ খেয়ে মরে ?

আমি কি বলব ! হাতের টর্চটা জ্বালিয়ে এবার সামনের দিকে তাক করে বিনোদ। একটু একটু কুয়াশা যে বোঝা যায়। টর্চটা নিভিয়ে আবার পাশে রাখে।

তাছাড়া কি অবস্থা দেখ, তুই মরলি, বাচ্চাটাকে জন্ম দিয়ে গেলি কেন ! বাচ্চাটার কথা ভাব, বাপের কোন ঠিক নেই, মাও জন্ম দিয়েই চোখ বুজল। আসলে পাপের ফল।

বাচ্চাটা বেঁচেই যে আছে এমন কোন কথা নেই।

বেঁচেই আছে। সতীশবাবু বলে গেল না।

সতীশবাবু শোনা কথা বলেছে, চোখে তো দেখে নি।

ভোলা এতক্ষণ পর বিড়িটা ধরায়, সতীশবাবুকে আমরা অনেক দিন ধরে দেখছিরে, ও বাজে কথা বলে না।

বিনোদ বলল, কি জানি, হতেও পারে।

হতে পারে না, বাচ্চাটা বেঁচেই আছে। আমার মন বলছে।

বিনোদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে সদ্যজাত একটা শিশুর মুখ। টুলটুলে এক জোড়া চোখ, ফুলের মতো নরম হাত পা। বুকটা কেমন ভার হয়ে উঠতে থাকে ওর। মুহূর্তের মধ্যেই পার্বতীর মুখটাও চোখের সামনে ভেসে উঠতে শুরু করে। এরকম একটা শিশু কি পার্বতীর কোল জুড়ে আসতে পারত কোন দিন। ভগবান কি একবারও পার্বতীর

দিকে চোখ তুলে তাকাতে পারত না। অদ্ভুত নিয়ম এই সংসারের। যার প্রয়োজন নেই, তার ঘরেই এ রকম হয়।

এই, কি হল, বিড়িটা নে। গুম মেরে গেলি যে?

বিনোদ একটু চমকে ওঠে, তারপর বোকার মতো হাসে!

কি হল, হাসছিস?

হাসছি কোথায়, কিছু না। একটা কথা মনে পড়ে গেল।

ভোলা ফ্যালফ্যাল করে তাকায়, কি কথা?

বিনোদ আর একবার টান দেয় বিড়িতে, ও কিছু না, আজেবাজে কথা।

এই দেখ। হুমড়ি খেয়ে পড়ে ভোলা, বল না কি কথা?

ভাবছিলাম, শিবুর কোন বাচ্চার দরকার নেই অথচ ওর ঘরেই বাচ্চা জন্মাল।

ভোলা বুঝতে পারে না কি বলতে চাইছে বিনোদ।

আসলে ভগবানও শালা তেলা মাথায় তেল দেয়।

কি বলতে চাইছিস খুলে বল না?

বিনোদের গলার স্বর এবার নেমে আসে, আসলে আমাদের তো ছেলেমেয়ে কিছুই হল না, এরকম একটা পেলে নিয়ে নিতাম। বুকে পিঠে করে মানুষ করতাম।

ভোলার মুখটা কেমন হাঁ হয়ে থাকে।

মানে, এমনিই বললাম আরকি! শিবুর ব্যাপার শিবুই বুঝবে।

তা, তুই একবার শিবুকে বলে দেখ না, ও রাজি হলেও হতে পারে।

বিনোদ এবার একটু গা ঝাড়া দিয়ে বসে, বলব বলছিস?

বলতে দোষ কি. বড় জোর কিছু টাকা চাইতে পারে।

কত টাকা? চোখদুটো কেমন চকচক করে ওঠে বিনোদের। আমার তো তিন মাসের মাইনে জমা আছে ভাইদার কাছে, নিয়ে নিতে পারি।

এই দেখ, আগে কথা বলবি তো! শিবু কি ভাবছে না ভাবছে সেটা জেনে নিবি তো!

বিড়ির টুকরোটা টোকা দিয়ে ফেলে দেয় বিনোদ। চারপাশে কেমন আবছাআবছা কুয়াশা। আকাশের নক্ষত্রগুলো যেন বিন্দুর মধ্যে আর স্থির নেই, কেঁপে ফুলে ছড়িয়ে পড়েছে। যেন শিবুর মনের কথা টের পেয়ে গেছে ওরা।

ভোলা বলে, আমার তো মনে হয়, শিবু হাঁফ ছেড়ে বাঁচবে।

বিনোদ হাতটা জড়িয়ে ধরে ভোলার, তার মানে সত্যি সত্যি ওকে বলব বলছিস ?

বলতে দোষ কি ! ও যদি রাজি হয়ে যায় তো ভালই, না হলেই বা ক্ষতি কি ! তবে কি জানিস, ব্যাপারটা খুব গোপনে বলতে হবে। কার মাথায় কি ঘুরছে কে জানে।

বিনোদ ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকে। সমস্ত শরীরে অদ্ভুত এক অনুভূতি। তিন মাস ধরে এই জলকরে মাছের হাওয়ায় কাটিয়ে দিল ও, অথচ এমন একটা উত্তেজনা ভরা রাতের কথা যেন ভাবতেই পারে না। ওর কি কপাল খুলে যাচ্ছে তাহলে !

ভোলাই আবার কথা বলে, ছেলে না মেয়ে দেখে নিবি না ?

বিনোদের গলা মাখোমাখো হয়ে ওঠে, ছেলে হোক, মেয়ে হোক আমার বউ আপত্তি করবে না। আসলে কি জানিস একটা ছেলে-মেয়ে না থাকলে কেমন সব খালি খালি লাগে, তাই না ?

তা ঠিক। তবে আমি কি বলি জানিস, বাচ্চা যদি নিস, লেখা-পড়া করে নেওয়াই ভাল।

কেন ?

কেন কি রে ! রক্তের টান বলে একটা কথা আছে না, পরে যদি আবার ফেরত চেয়ে বসে। লেখাপড়ি করা থাকলে আর ফেরত চাইতে পারবে না।

লেখাপড়ি বলতে যে কি, ঠিক মাথায় ঢোকে না বিনোদের। কি ভাবে যে ওসব করতে হয় তাও ওর জানা নেই। বলল, তাহলে তুই আমায় করিয়ে দিস ওসব।

কি করিয়ে দেব ?

লেখাপড়ির কথা বললি না!

ভোলা হেসে ওঠে, আমি করাব কিরে, আমি কি উকিল নাকি! কোর্টে গিয়ে উকিলবাবুকে ধরবি, করে দেবে।

উকিল! একটু কেমন যেন দমে যায় বিনোদ। কোর্টে-কাছারি উকিলটুকিলের কথা শুনলেই কেমন যেন ভয় লাগে ওর। কোনদিন কি ওসবের ধারেকাছে গেছে নাকি ও,—চুপ করে থাকে।

আর ঠিক এই সময়ই ভাইদার গলা, কি রে ঘুমুচ্ছিস নাকি তোরা? টর্চের ফোকাস পড়ে ওদের মুখে।

না ভাইদা, বসে আছি। গল্প করছি।

ভোলা বলল, রাত তো এদিকে শেষ হয়ে এল ভাইদা।

তা এল। আর একটু ফরসা হলে খবরটা একবার নিয়ে আয় দেখি। আমিই যেতাম, কিন্তু অক্ষয়বাবুকে একা ফেলে আমার যাওয়াটা ঠিক হবে না।

বিনোদ উঠে দাঁড়ায়, আমি এখনি যেতে পারি ভাইদা, যাব?

মাথা খারাপ! অন্ধকারটা কাটুক, তারপরে যাস। তাছাড়া একা একা যাওয়াটা ঠিক হবে না, কাউকে সঙ্গে নিয়ে যাস।

বিনোদ মাথা নাড়ে, ঠিক আছে।

ম্যানেজারবাবুর বাড়ি গেলেই সব জানতে পারবি, ওখানেই বরং আগে যাস।

আবার মাথা নাড়ে বিনোদ।

ভাইদা আর দাঁড়ায় না, জলকরের বাঁধের উপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে এগিয়ে যায় ওপারের দিকে। বাঁ হাতে একটা লাঠি, ঝুলতে থাকে সমান্তরালভাবে।

বিনোদরা আবার বসে পড়ে।

চ' না, একবার ঘুরেই আসি। কাঁটাদারদের বাজার অবধি গেলেই সব জানা যাবে। বাজার তো এখন খুলেই গেছে।

ভোলা পা ছড়িয়ে দেয়, বাজারে গিয়ে কি জানবি! যেতে হলে একেবারে শিবতলা অবধি যেতে হবে।

তাই চ' না। একেবারে নিজের চোখেই দেখে আসা যাবে।

উত্তেজনায় উঠে দাঁড়াচ্ছিল বিনোদ, ভোলা খপ করে ওর হাত ধরে বসিয়ে দিল। এখন কি খেয়া আছে নাকি যে শিবতলা যাবি?

না মানে ভাবছিলাম, আগেভাগেই যদি শিবুর সঙ্গে কথাটা সেরে নেওয়া যায়।

ভোলা এবার হেসে ওঠে, শিবু এখন ওর মড়া মেয়েকে নিয়ে কি করবে তার ঠিক নেই, তুই আছিস তোর ধান্দায়। একটু সবুর কর না বাপ, অবস্থা একটু ঠাণ্ডা হোক তারপরে বলবি।

বিনোদ আবার দমে যায়। ভোলা ঠিকই বলছে, মেয়েটাকে নিয়ে শিবুর এখন সত্যি সত্যি মাথা ঠিক রাখার কথা নয়। যতক্ষণ না দাহটাহ শেষ হচ্ছে ততক্ষণ শিবুকে একা পাওয়াও সম্ভব নয়। কিন্তু বাচ্চাটাকে কোথায় রাখল ওরা! তবে কি হাসপাতালেই একা একা পড়ে আছে! নাকি কেউ কেউ তুলে নিয়ে গেল। বাচ্চাটা না জানি দেখতে খুব সুন্দর হয়েছে। হাসির মুখটাতো ওর দেখা, তবে কি হাসির মুখের মতই মুখ পেল বাচ্চাটা। অন্তত একবার একটু চোখের দেখা দেখতে পারলে যেন নিশ্চিন্ত হতে পারত ও।

ভাবতে ভাবতে কেমন যেন বিভোর হয়ে যেতে থাকে বিনোদ।

আর ঠিক এই সময়ই ঝট করে উঠে দাঁড়ায় ভোলা, কান খাড়া করে সামনের দিকে তাকায়।

কি হল? বিনোদও উঠে দাঁড়ায়।

কেমন শব্দ আসছে না? শুনছিস কিছু?

কিসের শব্দ?

হৈ চৈ হচ্ছে না কোথাও? আয় তো এগিয়ে দেখি।

কোথায়? বুকের ভেতর কেমন যেন কাঁপুনি শুরু হয় বিনোদের। ফ্যালফ্যাল করে তাকায়।

ওদিক থেকে ততক্ষণে নন্দর গলা ভেসে এল। চেঁচাতে শুরু করেছে ভাইদার নাম ধরে। ও ভাইদা, ভাইদাগো, ওরা আসছে। ওই যে গো ভেড়ি ধরে ওরা আসছে।

ভাইদারও পালটা গলা বাতাস কাঁপাতে শুরু করল, কে কোথায় গেলি রে, এই ব্রজ, নন্দ, বলাই—কোথায় গেলি সব ?

জলকরের চারপাশেই ছড়িয়েছিটিয়ে ছিল সবাই। টর্চের আলোর কাটাকাটি শুরু হয়ে গেল চারদিকে। মুহূর্তের মধ্যেই জেগে উঠল জলকর।

ভোলা বলল, চ', ভেড়িতে উঠে দেখি, ত্ব' চারজন নয়, মনে হচ্ছে অনেক লোক। এদিকেই আসছে।

বিনোদও যে শব্দটা শুনতে না পাচ্ছে এমন নয়। কিন্তু পা কাঁপছে ওর। মাথার ভিতর ঝিমঝিম করা কেমন একটা অনুভূতি। পায়ের দিকে শিশির ভেজা পেছল মাটিতে দাঁড়িয়ে থাকাই যেন দায়।

বিড়বিড় করতে থাকে বিনোদ, কারা, কারা রে ? কারা আসছে ?

ভাইদা তখনও চেঁচাচ্ছে, কে কোথায় গেলি, এই বিষ্টু, ভোলা, নন্দ........

পঁচিশ

একজন ত্ব'জন নয়, কম করেও পঞ্চাশ-ষাট জন মানুষ। হাতে হাতে লাঠি লোহার রড। কারো বা হাতে মারাত্মক সব দা-কাটারি। শেকল ছেঁড়া বুনো মোষের মতো যেন ফুঁসতে ফুঁসতে এগোচ্ছে। মাঝে মাঝে ত্ব'একটা মশালও।

চিৎকার করে জলকরের শ্রাদ্ধ করছে ওরা। কি যে ঠিক বলছে বোঝা যাচ্ছে না। এলোমেলো চিৎকার ছাড়া কিছুই না।

পিছন ফিরে ভাইদার দিকে তাকায় বিনোদ। ব্রজ আর ভাইদা গায় গায় সেটে দাঁড়িয়ে আছে, বিষ্টু ভোলা, নন্দ, আর কিশরীকে দেখা গেল। কিন্তু আর সব কোথায় !

বলাই বলল, পালিয়েছে। সব শালা ভয়েই মরে গেছে।

কিন্তু আমরা এই পাঁচ ছ'জন, আর ওরা অত লোক !

উত্তর দেয় না কেউ।

ভাইদাই বিড়বিড় করে ওঠে, কি করি বলতো ব্রজ? ওরা তো ভেড়ি লুঠ করতে পারে বলে মনে হচ্ছে।

ভেড়ি লুটের চেয়েও বড় কথা আলাঘরের খড়ের চালে ওরা মশাল ছুঁড়ে আগুন ধরিয়ে দিতে পারে।

তাহলে!

অক্ষয়বাবুকে আমাদের গার্ড দেওয়া উচিত। অক্ষয়বাবু তো একা রয়েছেন।

আশ্চর্য, এতক্ষণ যেন অক্ষয়বাবুর কথা ভুলে গিয়েছিল ভাইদা। সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে আলাঘরের দিকে তাকাল, তোরা দাঁড়া, আমি একবার কথা বলে আসি। দরকার হলে টাকা পয়সা দিয়ে ওদের সঙ্গে কিছু একটা ব্যবস্থা করা যায় কিনা দেখি।

ভাইদা আর দাঁড়ায় না, ছুটতে ছুটতে আলাঘরের সামনে এসে থমকে দাঁড়ায়। অক্ষয়বাবু ঠায় পাথরের মতো দাঁড়িয়ে।

ভাইদা আরো একটু এগোয়, অবস্থা খুব ঘোরালো হয়ে উঠেছে হুজুর। ওরা লাঠিসোটা নিয়ে এগোচ্ছে।

আমি জানতাম এরকম হবে। অক্ষয়বাবুর গলার স্বর বেশ ভারি। এখানে এসে পা দিয়েই আমি বুঝতে পেরেছিলাম, এরকম কিছু হবে।

আসলে ওরা যে কি চাইছে সেটাই বুঝতে পারছি না হুজুর। কিছু টাকাপয়সা দিলে ওরা যদি শান্ত হয়ে চলে যায়, সে চেষ্টা একবার করে দেখতে পারি। আপনি যদি একটু ভরসা দেন তো—

প্রসন্নবাবুর কি হল?

আজ্ঞে, পুলিশ ওকে ছাড়িয়ে এনেছে কিনা তাও বুঝতে পারছি না।

অক্ষয়বাবুর গলার স্বরে কেমন বিরক্তি ঝরে পড়ে, একটা রাত পার হয়ে গেল খবরটাই নিতে পারলে না? আশ্চর্য! তোমাদের মতো এই সব অপদার্থের হাতে আমি জলকর ছেড়ে দিয়ে বসে আছি।

আজ্ঞে আমি কি করব! থানায় তো লোক পাঠিয়েছিলাম।

ব্যস তাহলেই হয়ে গেল। এদিকে যে ওরা হামলা করতে আসছে, খবর পাঠিয়েছ?

আজ্ঞে।

আজ্ঞে কি! আচ্ছা উজবুক লোক নিয়ে আমার মরণ দেখছি।

আমি এক্ষুণি আবার পাঠাচ্ছি হুজুর।

ভাইদা যেন অক্ষয়বাবুর দৃষ্টির বাইরে কিছুক্ষণের জন্য সরে যেতে পারলে বেঁচে যায়। ছুটতে ছুটতে আবার ফিরে এল বিনোদদের কাছে, এই, থানায় যা দেখি। জলদি গিয়ে বল, হামলা শুরু হয়েছে। লোকজন নিয়ে দারোগাবাবু যেন চলে আসেন।

কে যাবে, মুখ চাওয়াচাইয়ী করে ওরা। ভাইদা দাঁতমুখ খিঁচিয়ে ওঠে, হাঁ করে দেখছিস কি, এই ব্রজ?

ব্রজ কেমন ঘোলাটে চোখে তাকায়, আমি, একা?

বিনোদ এগিয়ে এল, চল ব্রজদা, আমিও যাব তোমার সঙ্গে।

ওরা বেরিয়ে পড়ে। ভেড়ি থেকে নিচে নেমে মাঠের ভিতর দিয়ে একরকম প্রায় ছুটতেই শুরু করে।

লোকগুলো এতক্ষণে যেন শ' পাঁচেক হাতের মধ্যে এগিয়ে এসেছে। চিৎকারটা আরো বেড়েছে। চিৎকারের ঝড় যেন সারা আকাশ কাঁপিয়ে দিচ্ছে।

ভাইদা হাতের লাঠিটা ফেলে দিল। লাঠি দিয়ে ঠেকান যাবে না ওদের। বরং কথাটথা বলে যদি সামাল দেওয়া যায়।

ভোলাও হাত থেকে লাঠি ফেলে দিল। দেখাদেখি সবাই লাঠি ফেলে দিল।

কেউ মাথা গরম করবি না বলছি। ঠাণ্ডা মাথায় কথা বলবি। কি বলতে চায় ওরা, শুনে নিতে হবে আগে।

তা তো নেব, কিন্তু—

কিন্তু কি?

ওরা যদি ঝাঁপিয়ে পড়ে আমাদের ওপর?

পেছন দিক থেকে ততক্ষণে অক্ষয়বাবুও এগিয়ে এসেছেন, কেউ থানায় গেছে?

ভাইদা মাথা নাড়ে, গেছে হুজুর। পাঠিয়েছি।

তাহলে তুমি একবার ওদের সঙ্গে কথা বলে দেখ। মেয়েটার জন্য যদি ক্ষতিপূরণ চায়, সেটা না হয় কথা বলে একটা ব্যবস্থা করা যায় কিনা দেখ না।

ভাইদা কেমন ফ্যালফ্যাল করে তাকায়।

দেখছ কি, জলকরে ঢোকার আগেই ওদের ঠোকাও না। কেমন লোক হে তুমি। দাঁতমুখ আবার খিঁচিয়ে ওঠেন অক্ষয়বাবু।

ভাইদা বলাইকে ডাকে, আয় তো এগিয়ে দেখি।

বলাই বিষ্টুর দিকে তাকায়। এই বিষ্টু তুই যা।

বিষ্টু মাটিতে বসে পড়েছিল ; বলল, তাহলে সবাই যাই। একসঙ্গে যাই চল।

তোদের কাউকে যেতে হবে না। অভাবনীয় ব্যাপার, অক্ষয়বাবুই হনহন করে হাঁটা দিলেন সামনের দিকে।

এ অবস্থায় ভাইদারাও দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না। এই চল না, হাঁ করে কি দেখছিস ? অক্ষয়বাবু যেতে পারেন আর তোরা! পেছন পেছন হাঁটা শুরু করে ওরাও।

খানিক দূর এগিয়েই অক্ষয়বাবু দু' হাত তুলে যেন আত্মসমর্পণের ভঙ্গি করেন। দেখাদেখি ভাইদারাও।

অক্ষয়বাবু পিছন ফিরে তাকান, ওদের বলো, আমরা কথা বলতে চাই। আলোচনা করতে চাই।

ভাইদা আরো দু'পা এগোল। ওহে শুনছ, কলকাতা থেকে অক্ষয়বাবু এসেছেন। কথা বলতে চান। ওহে শুনছ ?

কে শোনে সে কথা। লাঠি উঁচিয়ে লাফাতে লাফাতে কয়েকজন ততক্ষণে ওদের সামনে এসে হাজির। একজনের হাতে একটা মশাল। চারপাশ বেশ ফর্সা হয়ে উঠেছে, মশালের এখন প্রয়োজন হয় না, তবুও।

ভাইদা হাত জোড় করে চেঁচাতে লাগল, আমরা কি করেছি ? আমাদের ওপর হামলা কেন ? এ কি অন্যায় তোমাদের ?

ততক্ষণে দৌড়তে দৌড়তে আরো অনেকেই চারপাশ থেকে ঘিরে ধরল ওদের। এ সময় ভিড়ের মাঝখান থেকে ঠেলাঠেলি করে

এগিয়ে এল একটা লোক। মালকোচামারা ধুতি, গায়ে একটা ফতুয়া। লোকটাকে দেখে যেন খানিকটা প্রাণ পেল ভাইদা।

এই যে ভরতবাবু, এসব কি। আমরা কি করেছি যে—

ভরতের চোখদুটো টকটক করছে লাল। তড়বড়িয়ে বলল, সবাই বলছে, এই জলকরই নাকি মেয়েটার সর্বনাশ করেছে। আমি কি বলব! আমিতো মশাই, কোন ঝামেলায় যেতে চাই না।

ভাইদা বোঝাবার চেষ্টা করে, জলকর কেন সর্বনাশ করবে। জলকরে তো ওর কোন—

এই চোপ! ডাণ্ডা উঁচিয়ে এগিয়ে আসে একজন। ভরতই সামাল দেয় লোকটাকে।

অক্ষয়বাবু বলার চেষ্টা করেন, জলকরেই যদি ওর ক্ষতি করে থাকে, আমি তদন্ত করব। কথা দিচ্ছি, সত্যি সত্যি যদি কেউ দোষ করে থাকে তাকে এমন শাস্তি দেব যে জীবনে ভুলবে না।

কোন যুধিষ্ঠির এলেন রে—কে একজন অক্ষয়বাবুর মুখের সামনে হাত নেড়ে অদ্ভুত একটা ভঙ্গি করল।

ভাইদা চাপা একটু প্রতিবাদ করে, এটা কি হচ্ছে! উনি তো এই জলকরে থাকেন না, ওকে অপমান করা কেন!

ভরত অক্ষয়বাবুর দিকে তাকায়, ও, তাহলে আপনিই অক্ষয়বাবু! আমার পাওনা টাকা দিচ্ছেন না কেন, শুনি?

ভাইদা বলে, ভরত চার হাজার টাকা পাবে।

অক্ষয়বাবু বুঝতে পারেন, এই তাহলে শিবুর দাদা। গলা নামিয়ে বলেন, ঠিক আছে আমিই দিয়ে দেব। কিন্তু প্রসন্নবাবু কোথায়?

ওপাশ থেকে একজন হিঁ হিঁ করে হেসে ওঠে, তেড়িবেড়ি করতে গিয়েছিল, পিটুনি খেয়ে বাড়িতে শুয়ে কোঁ কোঁ করছে।

হাঁগো বাগদাবাবু, বিছানার পাশে এখন পুলিশ পাহারা দিচ্ছে।

বাগদাবাবু! মজা পেয়ে হৈ হৈ করে ওঠে কয়েকজন।

ভরতই আবার অবস্থা সামাল দেয়, এই, এটা কি হচ্ছে, অক্ষয়বাবুর কি দোষ।

আমরা দোষফোষ বুঝি না, হাসিকে বিষ খাইয়েছে কে, হাসি মারা গেল কেন ?

আর একজন চেঁচিয়ে উঠল, হাসির ডেডবডি আমরা এই জলকরে এনে পোড়াব। হাসিকে পোড়াবার সব খরচ জলকরকে দিতে হবে।

দোষীদের শাস্তি দিতে হবে।

শিবুকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

একটার পর একটা দাবি উঠতে থাকে চারপাশ থেকে। দাবি উঠতে উঠতে আবার লাঠিডাণ্ডা বাগিয়ে চিৎকার।

জলকরের টাকায় পার্টিবাজি চলবে না, চলবে না।

ভাইদা ফিসফিস করে বলে, ভরতভাই সামাল দাও না, তোমার টাকাটা আমি কালই পাইয়ে দেব। আর মেয়েটাকে দাহটাহ করতে যা লাগে তা না হয় অক্ষয়বাবুর কাছ থেকে আমি চেয়ে দিচ্ছি।

ভরত বলে, আমি কি করব বলো, সবার মাথাগরম।

তুমি ওদের সঙ্গে এসেছ বলেই তোমাকে বলছি, তাছাড়া তুমি মেয়েটার জেঠা। তুমি আমাদের বাঁচাও ভরত, তোমার পায়ে পড়ি।

সত্যি সত্যি ঝুঁকে পায়ে হাত দিতে যায় ভাইদা।

এই দেখ, কি করে কি করে! ভরত হাত তোলে, তোমরা থামবে। আমি মেয়ের জেঠা বলছি, তোমরা কি থামবে ?

একটু একটু করে থামে সবাই। আর ঠিক এই সময়ই চেঁচিয়ে ওঠে ভোলা, ভাইদা, আগুন।

আগুন ! কোথায় আগুন ?

ওই যে গো আলাঘরে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে।

মৌচাকে ঢিল পড়ার মতো ব্যাপার হল, চারপাশে আবার চিৎকার, পার্টিবাজি চলবে না, চলবে না।

ভাইদাদের ছেড়ে মারমুখী মানুষগুলো ছড়িয়ে গেল জলকরে। ঝপাঝপ লাফিয়ে লাফিয়ে পড়ল জলে। শক্ত লোহার রডে ভেড়ির মাটিতে কোপ শুরু হয়ে গেল দেখতে দেখতে।

ওদিকে গইবাক্সের কাছেও কয়েকজন, পইনা পাটা ওলটপালট।

আগুন আগুন! ভাইদা ছুটল আলাঘরের দিকে। লাঠি উঁচিয়ে ধরল একজন, খবরদার বলছি আর এগোবে তো আগুনে নিয়ে গিয়ে ফেলে দেব।

ভয়ে পিছিয়ে আসতে হল ভাইদাকে।

ভরত চেঁচিয়ে উঠল, অক্ষয়বাবু, ওদিকে যাবেন না। মাথার ঠিক নেই কারো।

অক্ষয়বাবু অসহায়।

আর ঠিক এই সময়ই ভেড়ির উলটো দিক থেকে ছুটতে ছুটতে এগিয়ে আসে আরো কয়েকজন। ভাইদা চিনতে পারে মামুগুণ্ডাদের। হাত জোড় করে ছুটে গেল ওদের দিকে, আমাদের বাঁচাও, বাঁচাও।

এই যে ধম্মপুত্তুর। চিনতে পেরেছ তাহলে?

আমাদের বাঁচাও। তোমাদের পায়ে পড়ি, বাঁচাও।

বটে। মামু হিঁ হিঁ করে একটু হাসে। পরক্ষণেই গম্ভীর হয়ে জিজ্ঞেস করে, আলায় আগুন লাগাল কে রে?

সব গেল, সব পুড়ে গেল, বাঁচাও।

পাশের লোকটাকে কনুই দিয়ে একটু খোঁচা মারে মামু, যা জল ঢাল গে, নেভা। ঘরে আগুন কেন, এটা কি মামদোবাজী?

ভাইদা কাঁদো কাঁদো, তুমি যা চাও মামু সব দেব। বাঁচাও।

বালতি কোথায়? এই হাঁ করে দেখছিস কি, নেভা না আগুন।

ছুটে গিয়ে পেছন দিককার ঘর থেকে গোটা তিনেক বালতি আর গামলা বার করে ভাইদা। তারপর বালতি নিয়ে ছোটাছুটি। আগুন আর ধোঁয়ায় মাখামাখি তখন আকাশ।

ভরতও এগিয়ে এসে বালতি ধরল। কিন্তু ততক্ষণে উলটো দিকের বাঁধ কেটে ফাঁক করে ফেলেছে কয়েকজন। হু হু করে জল বেরুচ্ছে দেখতে পেল ভোলা বিষ্টুরা। প্রাণের মায়া থাকলে ওদিকে আর এগোন ঠিক হবে না। ভয়ে পালাতে থাকে ওরা।

সারা জলকর ততক্ষণে তোলপাড়। গোছা গোছা বাগদা উঠে আসছে গইবাক্সের কাছ থেকে। লুঠ করতে কতক্ষণই বা লাগে।

নিশ্চল্ল একা একা তখনও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিলেন অক্ষয়বাবু। কাটা বাঁধের ফাঁক দিয়ে হুহু করে জল বেরিয়ে মাঠের দিকে নেমে যাচ্ছে। জলকরের জল কোমর থেকে হাঁটুর দিকে নেমে আসছে, আর তারই মাঝে থালার মতো বিরাট একটা সূর্য উঠছে পৃথিবীতে। যেন রক্তের আভা বিছিয়ে দিচ্ছে চারদিকে। আর তখনো বালতি বালতি জল তুলে ছুঁড়ে ছুঁড়ে যাচ্ছে মামুগুণ্ডারা। আগুনটা বোধহয় কজ্জার মধ্যেই চলে এসেছে। কিন্তু অক্ষয়বাবু বুঝতে পারেন, ক্ষতি যা হওয়ার হয়েই গেছে। ভেড়ির মাছ কোচর ভরে নিয়ে ওরই চোখের সামনে দিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে সবাই। কিচ্ছু করার উপায় নেই। এই বাদাবনের দেশে এ সবই বুঝি স্বাভাবিক!

সমস্ত রাগটা ওর ভাইদার ওপরই আছড়ে পড়ল। লোকটা যে এমন অপদার্থ কোনদিন বুঝতেই পারেন নি উনি।

তাকিয়েই থাকেন অক্ষয়বাবু। অসহায় একটা কাক-তাড়ুয়া পুতুলের মতো। কালো হাঁড়ির মতো একটা মুখ, চুন বুলিয়ে কেউ যেন নাক মুখ এঁকে রেখেছে ওর। ঠায় শুধু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখা। নড়বার ক্ষমতা নেই, মাটির মধ্যে শেকড় ডোবান। হাত নাড়ার উপায় নেই, আলখাল্লা জামার নিচে শুকনো একটা বাঁশের ক্রুশ।

হায় রে, কি কুক্ষণেই এই জলকর ব্যবসা করব বলে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম। মাথা ভর্তি ঋণের বোঝাই শুধু চাপালাম, সর্বনাশের বোঝা। কি কুক্ষণেই যে এই হরিণচকে—

দাঁতে দাঁত চাপেন অক্ষয়বাবু, হাওয়া মুঠি করে হাতদুটো ঝুলতে থাকে নিচের দিকে।

অবশেষে তিন চার জন সেপাই নিয়ে জীবন দারোগাও এলেন, কিন্তু যখন এলেন তখন শ্মশানের স্তব্ধতা নেমেছে জলকরে।

ছাব্বিশ

সন্ধ্যা একটু ঘন হতেই চাঁদের আলোয় থইথই করে উঠল জলকর। সারাটা দিন গেছে অবসাদে, পরাজিত মানুষেরা লজ্জা ঢাকবার জায়গা

পায় নি। একে একে আবার সবাই ফিরে এসেছে। জেলে-জিমনিরা পইনা ধোসার হাল দেখে মাথায় হাত দিয়ে বসেছে, ভেঙেচুরে ফন্দাফাই করে দিয়ে গেছে। ওদিকে কাটা বাঁধ দিয়ে তিন আর চার নম্বর ঘেরির পুরো জলটাই বেরিয়ে গিয়ে এখন কাদা কাদা হয়ে রয়েছে। বাঁধে আট দশ ঝুড়ি মাটি ফেলে কোনরকমে আপাতত ঠেকান দেওয়া গেছে। দুটো ঘেরির জল বেরিয়ে গেলেও বাকিগুলোয় জল যা আছে তাতে মাছেরা সেখানে এখন নিরাপদ।

এক দুপুর কাদার মধ্যে ভাইদা একাই নাভিশ্বাস ওঠা মাছগুলোকে তুলে তুলে সাত নম্বরের জলে ছেড়ে দিয়েছে। ভাইদার দেখাদেখি আরো অনেকেই হাত লাগিয়েছিল মাছ বাঁচাতে। ঘণ্টা খানেক হল নদীতে ভরা জোয়ার শুরু হলে স্লুইস গেট খুলে দেওয়া হয়েছে। জোয়ারের জল এখন ঘেরির দিকে এগোচ্ছে। সকালের দিকে হয়তো দেখা যাবে আবার হাঁটু প্রমাণ জল হয়েছে সেখানে।

ভাইদা চাদর মুড়ি দিয়ে আলার উঠোনে বেঞ্চের ওপর বসেছিল স্তব্ধ হয়ে। ভেড়ি লুটের চোটটা শেষপর্যন্ত সামলানো যাবে কিনা ভগবান জানে। অক্ষয়বাবুকে জীবন দারোগাই সঙ্গে করে প্রসন্নবাবুর বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে এসেছেন। আপাতত দু' একটা দিন যদি এখানে উনি থাকেন প্রসন্নবাবুর বাড়িতেই থাকবেন। কি ভাবছেন উনি কাল সকালে গিয়ে জেনে নিতে হবে। নিজের চোখে এমন একটা ঘটনা দেখার পর কেউ যে আর জলকর রাখতে চাইবে, মনে হয় না। মাথার মধ্যে ঝিমঝিম শুরু হয় ভাইদার। তাহলে,—কি হবে তাহলে! হরিণচক ছেড়ে এবার আবার কোথায় ঠাঁই হবে ওর। বিশাল এই পৃথিবীতে যাযাবরের মতো ঘুরতে ঘুরতে এখানে এসে শিকড় ডুবিয়ে বসেছিল। শিকড় সমেত কেউ যেন উপড়ে ফেলে দিয়েছে ওকে! এবার?—নাহ্ কিছুই যেন স্পষ্ট করে আর ভাবতে পারে না ও।

আগুনে আলাঘরের প্রায় অর্ধেকটা পুড়ে গিয়েছিল। পোড়া বাঁশের খুটি, বেড়া কেমন যেন একটা কঙ্কালের মতো হয়ে আছে এখন। ভাইদার বিছানাপত্রও আধপোড়া। হিসাবপত্রের খাতাও আধপোড়া।

যতদূর সম্ভব কুড়িয়ে-কাচিয়ে সেগুলোকে বস্তাবন্দি করে রেখেছে ভাইদা।

রান্নাঘরের দিকটা আগুনের হাত থেকে রেহাই পেলেও সারদিন আজ রান্নাবান্নার কথা কারোরই মাথায় আসে নি।

কিশোরী একবার এক ফাঁকে রান্নাঘরে ঢুকে সব নেড়েচেড়ে দেখে এসেছে, চালের বস্তায় হাত দেয় নি ওরা। কিন্তু বালতি গামলাগুলো যে কোথায় গেছে হদিশ নেই।

চাঁদের আলোয় ঝলমল করে উঠেছিল চারদিক। চিকচিক করছে জল আর কাদা। আকাশ জুড়ে আজও অসংখ্য নক্ষত্র। নির্বিকার। যেন এমন ঘটনা এই পৃথিবীতে হামেশাই ঘটে, ঘটবেও, উত্তেজনা নেই।

হঠাৎ এক সময় একটু চমকে ওঠে ভাইদা, কে ?

কিশোরী এগিয়ে আসে, আমি। সারাদিন তো কিছুই মুখে দিলে না ভাইদা। চাল-ডাল তো সবই আছে, যদি বলো তো--

আমি কি বলব, তোরা খাবি তো করে নে।

ব্রজলালও এগিয়ে এসেছিল, সবার জন্যই ভাত বসিয়ে দে না। ওদিকে ওরাও তো সারাদিন না খেয়েই কাটাল। ভাগ্যিস তখন বাজারে গিয়ে আমি আর বিনোদ মুড়ি খেয়ে এসেছিলাম খানিকটা।

কিশোরী দাঁড়ায় না। রান্নাঘরের দিকে এগিয়ে যায়।

বিনোদ কোথায় ? জিজ্ঞেস করে ভাইদা।

টংয়ে বসে আছে। হয়তো ঘুমুচ্ছে।

হুম। আর বলাই বিষ্টু নন্দ....যা সব বীরপুরুষ এবার বোঝা গেল।

ব্রজ কথা বলে না। কথা বলার মতো মুখ নেই কারো।

টংয়ে উঠে চুপটি মেরে বসে ছিল বিনোদ। পাশেই গড়াচ্ছে টর্চটা। আজ আর টর্চ জ্বালিয়ে মাছ দেখার বাসনা নেই। কি হবে দেখে। এ ঘটনার পর জলকরই আর থাকবে কি না কে জানে! আবার হয়তো ঝিলখালিতেই ফিরে যেতে হবে। সেই পার্বতীর সঙ্গে আবার টেনে হিঁচড়ে দরজায় দরজায় ঘুরে ঘুরে দিন কাটানো।

তা না হয় ফিরেই যাবে ও। কিন্তু ওর তিন মাসের মাইনে সাড়ে চারশো টাকা তো কম নয়, ভাইদার কাছে কি করেই বা চায় এখন। এ যেন এক শাঁখের করাতের সামনে গলা পেতে রেখেছে ও।

নাহ্, উঠে বসে বিড়ি ধরায় বিনোদ। গোটা বিড়ি নয়, আধপোড়া একটা বিড়ি ট্যাঁকে গুঁজে রেখেছিল, সেটাই ধরায়। সাড়ে চার শো টাকায় বাচ্চাটাকে যদি পেত ও, দিয়ে দিতে রাজি ছিল। কিন্তু—

ভোলাই এসে খবর দিয়েছিল ওকে, এই বিনোদ শুনেছিস ?

কি ? খারাপ খবরই যেন শুনতে হবে ওকে, চমকে উঠেছিল।

বাচ্চাটা পালিয়েছে। উড়ে গেছে।

মানে ?

লঞ্চঘাটের মাগীগুলো ওকে নিয়ে গেছে।

মাথাটা কেমন ধু ধু ফাঁকা হয়ে গিয়েছিল বিনোদের।

হিমি নামে সেই যে মাগীটা, সেই নাকি ওকে মানুষ করবে বলে নিয়ে গেছে। আর সবচে মজার কথা কি জানিস ? শিবু নাকি ওই মাগীটার সঙ্গে ঘর করবে ঠিক করেছে।

শিবু সংসার করবে !

তাইতো বললে গো।

কে বললে ?

আরে ওই যে বাজারে একটা নুলো আছে না, চা বিক্রি করে।

বিনোদের বাক বন্ধ হয়ে যায়।

ভোলা বলে, শিবু যদি সংসার পাতে ভালই হয়, কি বলিস ?

বিনোদ কি বলবে ভেবে পায় না।

অন্তত ওর মাথাটা একটু ঠাণ্ডা হবে এবার। তাই না ?

হোক গে। বিনোদ ভেড়ির ওপর কিছুক্ষণ ঠাঁয় দাড়িয়ে থেকে অবসন্ন দেহে টলতে টলতে উঠে আসে টংয়ে। শুয়েই পড়ে।

এরই মধ্যে বার কয়েক টংয়ের মাথায় কাক বসে চেঁচিয়ে গেল। বার কয়েক টংয়ের নিচে কাদা জলে মাছ লাফাবার শব্দ পেল ও।

দূরে ঢালের দিকে কুকুর চেঁচাল কয়েকবার। কিছুই এসে গেল না ওর। কেমন ফাঁকা, কেমন অর্থহীন যেন সব কিছু।

কতক্ষণ যে ওইভাবে কাটল খেয়াল নেই। বিকেলের আলো মরতে মরতে তামাটে রংয়ের সন্ধ্যা নামল। ফিকে সন্ধ্যা গাঢ় হল। নিস্তব্ধতা গাঢ় হল। রাত হল। আচ্ছন্ন ঘুমের ভিতর তলিয়ে যেতে যেতে বিনোদ এক সময় চমকে উঠল, একটা ছায়ামূর্তি। হ্যাঁ টংয়ের নিচে এসে দাঁড়িয়েছে। পরনে শাড়ি, তবে কি—

খপ করে টর্চ বাগিয়ে ধরল বিনোদ। তবে কি হাসি! তবে কি—

বিশ্বাস হয় না, হাসিকেই ও দেখতে পাচ্ছে। বিশ্বাস হয় না চোরাই বাগদা নিয়ে যাওয়ার জন্য হাসি আবার এই নিস্তব্ধ রাতে শিবুর খোঁজে এখানেই আসতে পারে!

কে?

খিলখিল হাসি, আমি গো আমি। আমায় চিনতে পারছ না?

হ্যাঁ, অবিকল সেই মুখ, সেই চোখ, সেই নাক ঠোঁট ভুরু।

উত্তেজনায় টর্চ জ্বালায় বিনোদ। আর আশ্চর্য, টর্চের আলোয় ছায়ামূর্তিটা কেমন যেন চোখের নিমেষে মিলিয়ে যায়।

ব্রজলাল তখন টংয়ের নিচ থেকে চিৎকার শুরু করেছে, কি হল রে বিনোদ, খাবি না?

হ্যাঁ, ব্রজই। বিনোদ আচ্ছন্নের মতো তাকিয়ে থাকে। এতক্ষণ কি তবে ও স্বপ্ন দেখছিল!

আয়, নেমে আয়। সবাই খেয়ে নিচ্ছে, খাবি আয়।

বিনোদ টংয়ের সিঁড়িতে পা রাখে, হ্যাঁ, ক্ষিধেয় যেন পেট জ্বলছে। টলতে টলতে নেমে আসে ও।

—:*:—